রুনু
গুহ নিয়োগী
সাদা
আমি
কালো
আমি

রুণু গুহ নিয়োগী

সাদা আমি কালো আমি

(পঞ্চম খণ্ড)

এম. এল. দে এণ্ড কোং
১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কোলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশনার পক্ষে ক'টি কথা

লেখক, আমার বাবা, অকস্মাৎ, হ্যাঁ অকস্মাৎই ২০০১ সালের ২১ শে, জুন পরলোকগমন করেছেন। তাই এই রচনার পঞ্চম খন্ডের লেখা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। যদিও চতুর্থ খন্ডেই তিনি বলেছিলেন যে 'সাদা আমি কালো আমি' তিনি পঞ্চম খন্ড পর্যন্ত লিখে তারপর নতুন নামে নতুন গ্রন্থ লিখবেন। তাঁর সেই ইচ্ছাও স্বাভাবিক কারণেই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তিনি ইহলোক ত্যাগ করার পর আমি ও তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা দ্বিধায় পড়ে যাই যে, তাঁর অসম্পূণ লেখাই প্রকাশ করে দেব কি না? কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কর্মী প্রকাশক কালাচাঁদ দে ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যান। দীর্ঘ আলোচনায় তারপর ঠিক হয়, অসম্পূর্ণ লেখা ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা ক'টি লেখা নিয়ে একত্রে তা পঞ্চম খন্ড আকারে প্রকাশ করব। হয়তো তিনি সেই সব লেখা এই খন্ডে জায়গা দিতেন না, হয়তো দিতেন। তবে ক'টি ঘটনা যে তাঁর পঞ্চম খন্ডে স্থান পেত তা তাঁর লেখার [illegible] নোট থেকে পেয়েছি। যেমন দেবযানী বনিক হত্যা মামলা, চোদ্দ বছরের বালক অনুরাগ আগরওয়ালার অন্তর্ধান ও হত্যা মামলা, কড়েয়া থানার পাশে মিসেস চৌধুরী হত্যা মামলা, কয়েকটি ডাকাতির মামলা ইত্যাদি। তবে তিনি কি করতেন তা তিনিই জানতেন। অন্য কারোর তা জানা সম্ভব ছিল না। তাই পঞ্চম খন্ড প্রকাশে দেরি হয়ে গেল। সে জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। ইতিমধ্যে অসংখ্য পাঠক পাঠিকা নানা ভাবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চেয়েছেন কবে পঞ্চম খন্ড প্রকাশ হবে? এবার তাঁদের হাতে আমরা সেই খন্ড তুলে দিচ্ছি। অবশ্য কতটা তাঁদের আশা পূর্ণ হবে তাঁরাই জানেন, কারণ লেখক যেহেতু তাঁর ইচ্ছাটা প্রকাশ করার কাজ অসম্পূণ রেখেই চলে গেছেন। এমনকি লেখাগুলি নিজে পরে সম্পাদনা করার কাজও করতে পারেননি। আমরা সেই লেখা যেমন তিনি লিখেছিলেন সেই ভাবেই অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করলাম। পাঠক পাঠিকারা কিভাবে তা গ্রহণ করবেন তা তাঁরাই জানেন। এখানে আমাদের কিছু করণীয় নেই। আমরা প্রকৃতপক্ষে এখানে অক্ষম। তবে আমাদের আশা তাঁরা এর আগে প্রকাশিত চারটে খন্ড যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন সেইভাবেই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবেন। তবেই আমাদের আশা পূর্ণ হবে।

প্রজাতন্ত্র দিবস
২৬ শে জানুয়ারি,
[illegible]

ধন্যবাদান্তে
দেবাশিস গুহ নিয়োগী

পঞ্চম খণ্ড
সাদা আমি
কালো আমি

এ এক রহস্য। সুখের আধার। কোথায় গেলে পাবো তারে ! অনন্ত অতীত কাল থেকে মানুষ ছুটছে তারই পেছনে। তবু দেখা নেই তার। সৃষ্টির রহস্যের মধ্যেই যদি লুকিয়ে থাকে তার বীজ তবে তারই মধ্যে আছে মুক্তির পথ। কিন্তু দিশাহারা মানুষ শুধু এখানে ওখানে টুঁ মেরে মাথা নেড়ে চলে। তবু তার সন্ধান পায় না। অন্তত নিজের পছন্দ এবং মর্জিমাফিক পায় না। আর এখানেই যত সমস্যার মূল। মানুষ কোনও অংশীদার চায় না। সুখেরও অংশীদার চায় না, শান্তিরও অংশীদারও চায় না। ভাগ করে নিলে যে মানুষের জীবন অনেক অনায়াসে হয় সেটা অধিকাংশ মানুষ মেনে নিতে চায় না। আর এই পথই যে একমাত্র শান্তির পথ তা বুঝলেও মানতে কষ্ট হয়। মেনে নিতে কষ্ট হয়! নিজের শুধু নিজের জন্য সব কিছু—এটাই অধিকাংশ মানুষের কাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সুখের আধার রয়ে যায় অধরা। অন্যের, সমাজের সুখ শান্তির মধ্যেই যে লুকিয়ে আছে নিজেরও সুখ তা ক'জনে মানে, ক'জনে সেই পথ আগলে জীবনের পথ চলাকে মসৃণ করে, ক'জন?

তাই দিশাহীন মানুষ বুকের ভেতর 'সুখ চাই, সুখ' এই একমাত্র ধ্যানে ব্রত হয়ে সকাল সন্ধ্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর তার যে কত শত পথ আছে তা কে জানে।

আমাদের লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরের এক অল্পবয়সী অফিসারের সুখের পথ ছিল অদ্ভুত প্রায় অকল্পনীয়, সে আবার আমার অধীনেই অনেক দিন ছিল।

আপনি লালবাজারে আমাদের দফতরে কোনও কাজে এলেন। আপনি হয়তো আপনার সুন্দর লাইটার বা কোনও খুব ভাল কলম টেবিলের ওপর রাখলেন। যখন আপনি ফিরে যেতে উদ্যোগ নিলেন এবং টেবিল থেকে আপনার জিনিস তুলে নিতে গিয়ে দেখলেন, নেই। কখন যে আপনার সামান্য অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ওই অফিসারের পকেটে চালান হয়ে গেছে তা আপনি কেন, আমাদের দফতরের কোনও কর্মচারীই টের পায়নি। আপনি নিরাশ এবং আশ্চর্য হয়ে ফিরে যাবেন। কারণ আপনি তো বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে, খোদ লালবাজার গোয়েন্দা দফতর থেকে এত নিঁখুত এবং দ্রুত হাত সাফাই হয়ে আপনার দামি লাইটার বা কলম বা অন্য কোনও জিনিস যা অতি অবশ্যই সুন্দর তা আপনার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যেতে পারে। আপনি খোঁজ করলেও আমরা আপনাকে বলব না যে

সেটা কোথায় যেতে পারে। কারণ খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমরা চাইব না। যে আমাদের দফতরের সামান্যতমও বদনাম হোক। হ্যাঁ, আপনি চলে যাওয়ার পরে ওই অফিসারের ওপর আমি অনেক হম্বিতম্বি করব, মুখে যা আসে সেই ভাষাতেই ওর ওপর বর্ষণ করব, কিন্তু কোনও কাজ হবে না, কারণ ততক্ষণে সে আপনার জিনিসটা অন্য কাউকে দান করে দিয়েছে, হ্যাঁ, দান করে দিয়েছে। হয়তো আপনি ভাবছেন আমার গালিগালাজের পরে সে অফিসারটি তার দুষ্কর্ম বন্ধ করে দিয়েছে, না। আপনার ধারণা ভুল। সে তার হাত সাফাইয়ের কাজ বন্ধ করেনি। এই এক ধরণের ম্যানিয়া। ভাল জিনিস দেখলেই সেটা হস্তগত করার জন্য ওর ধমনীর রক্ত দ্রুত চলাচল শুরু করে। সে সেই কাজটা সমাধা না করে ওখান থেকে সরতে পারে না।

ওকে বহু চেষ্টা করেও যখন শোধরাতে পারলাম না, ঠিক করলাম, সব আগুন্তককে সাবধান করে দেব। যখনই কেউ দামি জিনিস নিয়ে টেবিলে রাখতে যায়, আমরা অন্য অফিসাররা একেবারে রা-রা করে উঠতাম, "রাখবেন না, রাখবেন না, পকেটে রাখুন।" আমাদের ওই রকম আচরণে প্রত্যেকেই আশ্চর্য হয়ে যেতেন। কিন্তু কেউ জানতে চাইতেন না কি কারণে আমরা তাকে তার জিনিস বার করতে ওই ভাবে রা-রা করে উঠে বারণ করছি।

ওই অফিসারের পকেটে সব সময়ই স্ক্রু ড্রাইভার জাতীয় যন্ত্রপাতি থাকত। লালবাজারে নীচে কারও গাড়ি এসে দাঁড়ালে সে ঠিক সময় সেই গাড়ির বনেট খুলে দেখে নিত, ওই গাড়ির কোন কোন যন্ত্রাংশ নতুন বা বিদেশীয়, সে ঠিক নিমেষের মধ্যে সেই জিনিষটা খুলে নিত এবং আমাদের কোনও এক গাড়িতে সেটা লাগিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়ির পুরানো জিনিসটা ওই গাড়িতে বসিয়ে দিত। গাড়ির মালিক টেরও পেত না। কারণ তখন গাড়ি চালাতে কোনও অসুবিধাই হতো না। পরবর্তীকালে যখন ধরা পড়ত তখন ভেবেই পেত না, ওর গাড়ির যন্ত্রাংশ কোন্ জায়গা থেকে বদলি হয়েছে। এইভাবে আমাদের গাড়ি সবসময়ই ফিটফাট থাকত। আমাদের কোনও নিষেধই ও শুনতো না। আমাদের আড়ালে কখন যে ও এই সব কাজ করত তা আমরা টেরও পেতাম না।

একবার আমরা রাষ্ট্রপতিকে পাহারা দিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য দমদম বিমানবন্দরে গেছি। বিমানবন্দরের ভেতরে রানওয়ের কাছেই অপেক্ষা করছে রাষ্ট্রপতির গাড়ি। ওই অফিসারও আমাদের সঙ্গে রয়েছে। ও একবার করে ওই চকচকে গাড়ির দিকে দেখছে, একবার আমার দিকে। ওর চোখ দু'টো জ্ল-জ্ল করছে। আমি জানি, ওর ধমণীতে ওর ম্যানিয়াগ্রস্ত রক্ত দ্রুত ওঠানামা করছে। ওই গাড়ির যন্ত্রাংশ খুলে নেওয়ার জন্য। রাষ্ট্রপতির নির্দিষ্ট বিমান তখনও নামেনি। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে। আমি ওই অফিসারের বাঁ হাতের কব্জির কাছে চাপ দিয়ে, ওর কানের কাছে মুখ

নিয়ে গিয়ে আস্তে বললাম, "শালা মরে যাবি, ওটা রাষ্ট্রপতির গাড়ি। ওটার ওপর সবার নজর রয়েছে।"

আমার কথায় ওর মুখটা কালো হয়ে গেল। বুঝে গেছে সে আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। একটা বোকা হাসি মুখে ছড়িয়ে দিয়ে শুধু বলে উঠল, "স্যার"।

এই ধরণের কাজ করতে করতে সে এত অভ্যস্থ ও ম্যানিয়াগ্রস্থ হয়ে গেল যে সে আমাদের অফিসের জিনিসও চুরি করতে শুরু করল।

যে সব আসামি আমাদের লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ গ্রেফতার করে নিয়ে আসে তাদের লকআপে পাঠানোর আগে তাদের সঙ্গে থাকা জিনিস-পত্তর, টাকা পয়সা, ঘড়ি, আংটি ইত্যাদি জমা নিতে হয়। এটাই নিয়ম। তারপর সেই সব জিনিস একটা সালুতে বেঁধে একটা আলমারির মধ্যে রেখে দেওয়া হতো। আদালতের নির্দেশ মতো সেই সব জিনিস আদালতে পেশ করতে হয়, অথবা মুক্তি পাওয়ার পর যার যার জিনিস তাকে তাকে ফেরৎ দিতে হয়।

সেই অফিসারও তার আসামির জিনিস ওই একই আলমারিতে একইভাবে রাখত। সেই রাখার সময় সে অন্য অফিসারের অধীনে যে সব আসামির জিনিস রাখা থাকতো, সে সব পুঁটুলি বাঁধা সালু খুলে টাকা-পয়সা, ঘড়ি, আংটি নিয়ে নিত। তারপর আদালতের নির্দেশ মতো, অথবা আসামি মুক্তি পেলে যখন সেই সালু খুলতো দেখতো তার ভেতর প্রায় কিছুই নেই। দুই একটা তাবিজ বা ওই জাতীয় কিছু অবশিষ্ট পড়ে আছে। তখন নিজের মান সম্মান বাঁচাতে নিজের পকেট থেকে টাকা-পয়সা দিয়ে বা ঘড়ি কিনে দিয়ে কোনও মতে পার পাওয়ার চেষ্টা করত।

একবার অন্য এক অফিসার ওই ম্যানিয়াগ্রস্থ অফিসারকে শাস্তি দিতে একইভাবে ওর অধীনের আসামির সব জিনিস শালু খুলে নিয়ে একটা চিরকুট লিখে রেখে দিল।

মাস দু'য়েক পর আদালত ওই ম্যানিয়াগ্রস্থ অফিসারকে নির্দেশ দিল ওর অধিনস্থ আসামির জিনিস আদালতে পেশ করতে। সে আলমারি খুলে দেখল তার বাঁধা আসামির পুঁটলিতে কিছু নেই, রয়েছে একটা চিরকুট। সে পাগলের মতো আমার কাছে ছুটে এল এবং ওই চিরকুটটা আমাকে দিয়ে বলল, "স্যার, দেখুন, কি করেছে। সব নিয়ে এই চিরকুটটা কে লিখে রেখে দিয়েছে।"

চিরকুটটা আমি হাতে নিলাম, আমি হাসবো না কাঁদবো। অকথ্য ভাষায় ওটা লেখা। সারাংশ হল "এখন কেমন লাগছে?" বুঝলাম প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই কেউ এটা করেছে। বললাম, "আমি কি করব? তোমার কর্মফল তুমি ভোগ কর। নিজের পকেট থেকে খরচ কর।"

"ওই অফিসারটি আমার কথা শুনে মাথা নীচু করে বলল, "অনেক টাকা। চারজন আসামির জিনিস একসঙ্গে বাঁধা ছিল। তিনটে ঘড়ি, দু'টো সোনার আংটি, একটা মুক্তো লাগানো।

একে সাহায্য করার কোনও মানে হয় না। বললাম, "অনেক মুক্তোই তোমার হস্তগত হয়েছে, তার থেকে একটা দিয়ে দাও। একটা কমে যাবে।" ও আমার মনোভাব বুঝে চলে গেল। বুঝল এ ব্যাপারে আমি ওর পক্ষ কোনও ভাবেই নেব না।

ও আমার সামনে থেকে অন্য দিকে চলে যেতে অন্য সব অফিসাররা প্রায় এক যোগে বলে উঠল, "এ ব্যাপারে ওকে স্যার একদম সাহায্য করবেন না। ওর শাস্তি হওয়া দরকার। আমাদের বদনাম করে দিচ্ছে।

"হুঁ।" শুধু এ টুকুই আমি ওদের আবেদনের উত্তরে জানালাম। কিন্তু ভাবতে লাগলাম, এর একটা বিহিত করতেই হবে। এভাবে চলতে পারে না। দু'দিন পর আমি অন্য একটা আলমারি ঠিক করে ওই ম্যানিয়াগ্রস্থ অফিসারকে বললাম, "শোনো, এবার থেকে এই আলমারিতে শুধু তুমি তোমার আসামির জিনিসপত্তর রাখবে।" অন্য অফিসারদের বলে দিলাম, তাদের আলমারির চাবি যেন ওকে ওরা কখনই না দেয়। ওকে অন্য একটা আলমারি যে দিয়েছি সেটাও ওরা দেখল।

শুধু লালবাজারের গণ্ডীর মধ্যেই ওর কর্মকাণ্ড আটকে রইল না। লালবাজারের বাইরে এখানে ওখানে সব জায়গাতেই ও চালাতে লাগল। ফলে এক সময় এমন দাঁড়াল, গোয়েন্দা দফতরের কাজের বাইরে ওর সঙ্গ সবাই এড়িয়ে চলতে লাগল। আর লক্ষ্য করলাম ওর এই স্বভাবের কথা লালবাজার ছাড়িয়ে আমাদের গণ্ডীর মধ্যে যে সব সাধারণ বন্ধুবান্ধব ছিল তাঁরাও ওকে চিনে গেছে এবং সাবধানে জিনিসপত্র ওর সামনে প্রকাশ করে।

আর এক দক্ষ কন্সটেবল, কোনও আসামির বাড়িতে তল্লাশি করতে করতে অপ্রয়োজনীয় কিছু না কিছু নিয়ে আসত। ওর বিশেষ ঝোঁক ছিল সাইকেলের ওপর। এর ফলে আমাদের দফতরের সামনে বেশ বড় সাইকেলের বাজার হয়ে গিয়ে ছিল। সাইকেল বা ওই জাতীয় কিছু না পেলে দুটো ডিম হলেও সে পকেটে পুরে নিয়ে আসত। এই ধরণের অফিসার ও কন্সটেবলদের ওপর আমাদের কাজের ফাঁকেও বিশেষ নজর রাখতে হতো, কারণ দুর্নামটা আর ব্যক্তিগত ওর নামে রটবে না, সেই কাদার ছিটে তো পুরো পুলিশবাহিনীর গায়ে লাগবে। অথচ অন্য ব্যাপারে এরা বেশ দক্ষ, ক্ষিপ্র, সজাগ এবং বুদ্ধিমান, এসব গুনের জন্য ওদের প্রয়োজনও ছিল।

অথচ এই রকম হওয়ার কথা ছিল না। ওই অফিসারটি একটা ভদ্র, সম্মানীয় পরিবারের সন্তান, অর্থাভাব খুব একটা তাদের কোনও দিন ছিল না। অথচ ওই তার স্বভাব। হয়তো ছোট বেলা থেকে এই অভ্যেসটা তার আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছিল। "কচু কাটতে কাটতেই ডাকাত হয়ে উঠেছে।" এইসব কাজ করেই সে সুখী হয়! শান্তি পায়!

শুধু এরাই বা কেন, সুখ ও শান্তি পেতে তথাকথিত উচ্চ মার্গীয় মানুষজনকে অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করতে দেখেছি।

এক সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ অঞ্চলে এক উচ্চবর্গীয় পার্টিতে দেখা হলো, মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কলকাতা পুলিশের কমিশনার সাহেবের। প্রথামাফিক কুশল বিনিময়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী হঠাৎ কমিশনার সাহেবকে বললেন, "মিঃ—,আপনি তো কোনও দিন আপনার বাড়িতে সন্ধ্যেবেলায় ডাকলেন না?"

মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর আবদার শুনে কমিশনার সাহেব তো একেবারে আবেগে আপ্লুত। তিনি ভাবতেই পারছেন না স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী তাঁর বাড়িতে নিজে যেচে আমন্ত্রণ চাইছেন। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি তাঁর আর কী-ই বা হতে পারে?

মখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর কথা শুনে কমিশনার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ ম্যাডাম, এটা তো আমার সৌভাগ্য!

যেদিন বলবেন, যখন বলবেন, আমি প্রস্তুত, "তারপর মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "স্যারের, সময় অনুযায়ী আমাকে বললেই হলো, আমি সব ঠিক করে নেব।"

মুখ্যমন্ত্রী এমনিতে তাঁর স্ত্রীর আকস্মিক প্রস্তাবে হকচকিয়ে একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, তার ওপর কমিশনার সাহেবের সরাসরি তাঁর সময় দেওয়ার প্রস্তাবে মনে মনে খানিকটা অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, সেটা মুখে প্রকাশ না করেই বললেন, "সে একদিন দেখা যাবে'খন।"

"দেখা যাওয়ার কী আছে? এখনই দেখ না কোন দিন সন্ধ্যেবেলায় তুমি ফাঁকা আছো।" মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর স্ত্রী বললেন।

মুখ্যমন্ত্রী একবার তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বোঝায় যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে তিনি একেবারে লাল হয়ে যাচ্ছেন। কমিশনার সাহেব ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছেন।

চতুর মুখ্যমন্ত্রী আর কথা না বাড়িয়ে কমিশনার সাহেবকেই তার সেক্রেটারির নাম করে বললেন, "ওর থেকে জেনে নিন।"

কমিশনার সাহেব দ্রুত বলে উঠলেন, "ঠিক আছে, আমিই জেনে নিচ্ছি।" তিনি দ্রুত সেক্রেটারির উদ্দেশ্যে ওই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, মনে মনে আনন্দ তাঁর ধরে না।

ওই পার্টিতে মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারি আমন্ত্রিত ছিলেন। দু'মিনিটের মধ্যে কমিশনার সাহেব তাঁকে পেয়ে গেলেন। বললেন, "স্যার জানতে চেয়েছেন, সামনে কোনদিন সন্ধ্যেবেলা তিনি খালি আছেন?"

সেক্রেটারির মুখ্যমন্ত্রীর নির্ঘণ্ট সব মুখস্থ। তিনি বললেন, "সামনের রোববার। সোমবার সন্ধ্যায় তিনি দিল্লি চলে যাবেন।

কমিশনার সাহেব ঘুরে ছুটলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, মুখ্যমন্ত্রী অন্য এক বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কমিশনার সাহেব যেতেই বললেন, "কি বলল?"

"সামনের রোববার।"

"ঠিক আছে, ওই দিনই যাব। আপনি ওকে বলে দিন, যেন লিখে রাখে, আমার ব্যক্তিগত কাজ আছে।"

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো কমিশনার সাহেব আবার সেক্রেটারির কাছে গেলেন, এবং মুখ্যমন্ত্রীর কথাটা তাকে জানিয়ে ফিরে এসে মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর খোঁজ করতে গেলেন।

ক'জন মহিলার ভিতরে তিনি তাকে পেয়ে গেলেন। কিছু বললেন না। ম্যাডাম নিজেই বেরিয়ে এলেন।

কমিশনার সাহেব প্রায় নিচু স্বরে বললেন, "আগামী রবিবার সন্ধ্যেবেলায় ঠিক হয়েছে। আমরা বাড়িতে প্রস্তুত থাকব।

স্যারকে নিয়ে আপনি চলে আসবেন। ওই দায়িত্বটা কিন্তু আপনার।"

"ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে কমিশনার সাহেব তো খুব খুশী। মেম-সাহেবকে ডেকে উচ্ছ্বাসে প্রায় হেঁড়ে গলায় বললেন, "আগামী রোববার সি এম স্বস্ত্রীক সন্ধ্যেবেলায় আসছেন। গুছিয়ে রান্নাবান্না করবে। খবর শুনে মেমসাহেব প্রথমে আশ্চর্য্য হয়ে যান। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে জানতে চাইলেন, "তাই? হঠাৎ!"

"সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, পরে শুনো।"

"বল না, বল না।"

কমিশনার সাহেব সোফায় বসে একটু হাসলেন তারপর সবিস্তারে মেমসাহেবকে সব জানালেন। তারপর সেদিন খাওয়ার টেবিল কিভাবে সাজাবেন তার পরিকল্পনা করতে শুরু করলেন।

রবিবার। নির্দিষ্ট দিন। কমিশনার সাহেব তটস্থ। তিনি জানেন মুখ্যমন্ত্রী বিনা প্রচারে, প্রায় লুকিয়েই তাঁর বাড়িতে আসবেন। সাধারণত এমনটা হয় না। সামাজিক কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণে সি পি র বাড়িতে সি এম আসেন না। এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রচুর আলোচনার সম্ভাবনা হওয়া একশ ভাগ ; সেই আলোচনা কোনো সি-এম-ই চাইবেন না। অন্যদিকে আই. পি. এস. মহলেও এই ঘটনা নিয়ে প্রচুর গুঞ্জন হবে সেটা কমিশনার সাহেব খুব ভালভাবেই জানেন। আই. পি. এস. মহল তাঁর প্রতি হিংসায় জ্বলবে সেটাও তিনি খুব ভালভাবে জানেন। সি এম তাঁর বাড়িতে নৈশভোজে এলে যে তিনি যে একটা ওভার বাউন্ডারি মারতে

যাচ্ছেন সেটাও ঠিক। তাই তাঁর মন আবার খুশীতে ভরপুর। বিশেষ কাজে লালবাজারও যেতে হয়েছিল। লালবাজার থেকে তিনি বাড়িতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোন করে ব্যবস্থাপনার সব খোঁজ খবরই নিয়েই ক্ষান্ত হননি। কাজ কোন মতে শেষ করেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছেন। তারপর থেকে শুধু তদারকি। কোন জিনিসটা কোথায় রাখবেন তা নিয়ে মেমসাহেবের সঙ্গে মতবিরোধও দু'চারবার ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, এবং প্রতিবারই হেরে তিনি 'যুদ্ধক্ষেত্র' ত্যাগ করে বাড়ির গার্ড ও কনসটেবলদের বিশেষ নির্দেশ ও সাবধান থাকার জন্য বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন। সব কাজ শেষ করে এখন শুধু অপেক্ষা। ঘড়িতে আটটা। আগমনের সময় আসন্ন। নির্দিষ্ট সময় বলেননি। কমিশনার সাহেব অনুমানেই ধরছেন যে আগমনের সময় আগত। তিনি এখন ভেতরে ভেতরে সামান্য উত্তেজিতই। এমনটা যে কোনদিন ঘটতে পারে তিনি কল্পনাও করেননি। তিনি কোনও একটা জায়গায় দু'দন্ড বসতে পারছেন না। বারবার এটা দেখছেন, ওটা দেখছেন। সব কিছু ঠিকঠাক, টানটান আছে কিনা অযথাই তদারকি করছেন। এই সব করতে গিয়ে মেমসাহেবের দু-চার বার মুখ ঝমটাও খেয়েছেন। "তুমি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতো"। এ কথা ইতিমধ্যে অন্তত পাঁচ ছ'বার মেমসাহেবের মুখ থেকে শুনে নিয়েছেন। তবু তিনি ভেতরের অস্থিরতা গোপন রাখতে পারছেন না। সি এম যে তাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করবেন তিনি তা বিলক্ষণ জানেন। কি কি বিষয় জানতে চাইতে পারেন তার সাম্ভাব্য প্রশ্নগুলি নিয়েও তিনি মনে মনে ঘাটাঘাটি করছেন আর তার উত্তর সাজাচ্ছেন। অতি সাম্প্রতিক কোন কোন ঘটনা নিয়ে সরকার উদ্বিগ্ন তাও তিনি ভাবছেন। কোন ঘটনার সমাধান এখনও হয়নি, সেই ঘটনার তদন্তের কতদূর অগ্রগতি হয়েছে তা নিয়েও মনে মনে ভাবছেন। সবদিক দিয়ে প্রস্তুত থাকতে চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রী যে তার সঙ্গে ফুটবল নিয়ে আলোচনা করবেন না তা তিনি বিলক্ষণ জানেন। কলকাতা পুলিশ সংক্রান্ত আলোচনাই যে তিনি করবেন সেই ব্যাপারে কমিশনার সাহেব নিশ্চিত। সেই জন্য তিনি গত দু'চারদিন লালবাজারে বসে সব ঘটনার সর্বশেষ পরিস্থিতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অফিসারদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন। যাতে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তাকে আমতা আমতা না করতে হয়, প্রমাণ হয়, তিনি দক্ষ কমিশনার। যোগ্যতা প্রশ্নাতীত, তা ছাড়াও নিজের কিছু সুপ্ত ইচ্ছেও আছে। সুযোগ পেলে মুখ্যমন্ত্রীকে সেগুলি বলবেন। একান্তভাবে বলার এমন সুযোগতো সচরাচর পাওয়া যায় না। সেটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন।

সাড়ে আটটা। মুখ্যমন্ত্রীর পাইলটকার কমিশনার সাহেবের বাংলোর সদর দিয়ে ঢুকল। কমিশনার সাহেব স্বস্ত্রীক নীচে নেমে বাংলোর গাড়ি বারান্দার সামনে দাঁড়ালেন। কমিশনার সাহেব ধুতি পাঞ্জাবী পরে আছেন, এখানে তিনি পুলিশ নয়, গৃহকর্তা। মেমসাহেব যে শাড়িটা পরেছেন তার কত দাম হবে আন্দাজ করা কঠিন।

গাড়ি থেকে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীই নামলেন। তারপর তাঁর স্ত্রী। বিগলিত হয়ে কমিশনার

সাহেব ও মেমসাহেব তাঁদের অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতর বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন।

"বাঃ, খুব সুন্দর।" ম্যাডাম বললেন।

মুখ্যমন্ত্রী একটা সোফায় বসলেন। সামান্য দূরে ম্যাডাম। স্বস্ত্রীক কমিশনার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন।

মুখ্যমন্ত্রীই বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন?"

কমিশনার সাহেব বললেন, "স্যার, প্রথমে একটু চা বা কফি।"

মুখ্যমন্ত্রী মাথা নাড়িয়ে বললেন, "না-না, চা-কফি কিছু নয়। একেবারে ডিনার, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। বসুন।"

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো কমিশনার সাহেবও বসলেন। ম্যাডামের সঙ্গে 'কথার কথা' শুরু করে দিয়েছেন মেমসাহেব। মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা পুলিশ সম্পর্কিত দুই একটা প্রশ্ন করছেন, কমিশনার সাহেব উত্তরও দিচ্ছেন। যে সব প্রশ্নের উত্তরপত্তর তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সেই সব প্রশ্নের ধারে কাছেও যাচ্ছেন না। তাঁর সৌজন্যবোধ দেখে কমিশনার সাহেবও অবাক হয়ে যাচ্ছেন। যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর তিনি সরাসরি করে তাঁর কাছ থেকেই জেনে নিতে পারেন, তিনি তা করছেন না। তিনি মুখ্যমন্ত্রী, সরকারের প্রধান। তিনি কেন মুখ্যসচিব, সরাষ্ট্র সচিবকে বাদ দিয়ে কমিশনার সাহেবকে আনঅফিসিয়ালি ওই সব প্রশ্ন করবেন? করা উচিত নয় বলেই করছেন না তা কমিশনার সাহেবও বুঝে গেলেন। তিনি এখানে অতিথি। গৃহকর্তাকে বিবৃত করতে আসেননি। পদে আছেন বলেই সেই পদের তর্জন গর্জন ছড়াতে হবে এমন অভদ্র তিনি নন, তা তাঁর প্রতিপদেই প্রতিফলিত।

ম্যাডাম উঠে বৈঠকখানায় চারদিকে রাখা প্রাচীন মূর্তি, বিদেশী মূর্তিগুলি দেখতে শুরু করেছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গ দিচ্ছেন মেমসাহেব।

প্রায় সব ক'টি দেখেই উনি প্রশংসা করছেন।

কোন মূর্তিটা কোন জায়গার, ম্যাডামকে জানাচ্ছেন মেমসাহেব। একটা কাঠের অপূর্ব কাজের কাছে সামনে এসে ম্যাডাম থমকে দাঁড়ালেন। মেমসাহেব সঠিকভাবে বলতে পারছেন না, ওই জিনিসটা কোন দেশে তৈরী। তিনি তখন কমিশনার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, "শুনছো, এই কাঠের ওপর কাজটা কোথা থেকে তুমি এনেছিলে একবার বলে যাবে?"

কমিশনার সাহেব মুখ্যমন্ত্রীকে তখন কোনও একটা কথা বলছিলেন, মেমসাহেবের কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন, "সরি স্যার, ম্যাডামের একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি এক্ষুনি আসছি।"

মুখ্যমন্ত্রীও মেমসাহেবের কথা শুনেছেন, তিনি চট্ করে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ

যান।" কমিশনার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন যেদিকে ম্যাডামরা দাঁড়িয়ে আছেন সেদিকে।

"এটা কোথাকার যেন, আমি ভুলে গেছি।" মেমসাহেব কাঠের ওপর কাজ করা জিনিসটা দেখিয়ে কমিশনার সাহেবকে প্রশ্ন করলেন।"

"তাইওয়ানের, কাজটা সুন্দর না? আমার এক বন্ধু পাঠিয়েছিল।"

"অপূর্ব। এমন জিনিস আমি আগে দেখিনি।" ম্যাডাম কমিশনার সাহেবকে বললেন।

"ভাল লেগেছে? তা হলে ওটা আপনিই নিয়ে যায়, আমি প্যাক করে দিচ্ছি।" কমিশনার সাহেব ম্যাডামকে খুশী করতে বললেন।"

"না-না, সে কি?" প্রতিবাদটা খুব জোরালো শুনালো না।

"আরে ওটা আপনার কাছে থাকলেও যা, আমার এখানে থাকলেও তাই। বরং ওটা মাঝে মধ্যে দেখলে আমার কথাটা আপনার মনে পড়বে।" কমিশনার সাহেব একগাল হেসে বললেন। তারপর দ্রুত একটা কাজের লোককে ডেকে বললেন, "এটা ভাল করে প্যাক কর। ম্যাডামের গাড়িতে তুলে দে।"

ম্যাডাম এগিয়ে গেলেন, একটা বিদেশী মূর্তির সামনে দাঁড়ালেন। "এটা কোথাকার?"

কমিশনার সাহেব বললেন, "এটা আমিই এনেছি কানাডা থেকে। আমি যেখানেই যাই, স্মৃতি হিসাবে কিছু না কিছু নিয়ে আসি। এটা আমার হবিও বলতে পারেন।"

"খুব ভাল হবে, আর জিনিসটাও সুন্দর। দারুণ মিষ্টি।" ম্যাডামের চোখে উচ্ছ্বাস।

যে লোকটি কাঠের কাজটা প্যাক করছিল তাঁর দিকে তাকিয়ে কমিশনার সাহেব বললেন, "ওটা হয়ে গেলে এটাও প্যাক করে দিস। দেখিস আবার ভাঙ্গিস না।"

এইভাবে চারটে মূর্তির প্যাক করার নির্দেশ পেল কাজের লোকটি। তাইওয়ানের কাঠের কাজটা ছাড়া, একটা কানাডা, একটা নিউজিল্যাণ্ড ও অন্য একটা বাঁকুড়ার প্রাচীন একটা ট্যারাকোটার অপূর্ব বিষ্ণুমূর্তি।

মুখ্যমন্ত্রী দূর থেকে বসে সব খেয়াল রাখছিলেন। তিনি এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। কমিশনার সাহেবকে ডাকলেন।

বললেন, "হচ্ছেটা কি? ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।"

কমিশনার সাহেব কি বলবেন? বললেন, "স্যার, ম্যাডামের পছন্দ হয়েছে, তাই ওগুলি আমি আবার আনিয়ে নেব। আর আমার এখানে থাকলেও যা—।"

মুখ্যমন্ত্রী যা বোঝার বুঝে গিয়েছেন। ন'টা বেজে গেছে, বললেন, "ডিনার লাগাতেবলুন।"

কমিশনার সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ডিনার হলের দিকে ছুটলেন। ডিনার টেবিল প্রস্তুতই ছিল। মিনিট পাঁচেক পর ফিরে এলেন। মুখ্যমন্ত্রী ও ম্যাডামকে আপ্যায়ণ করে ডিনার টেবিলে নিয়ে গেলেন।

বিশাল আয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "এ কি করছেন, এত আয়োজন! এত সব খাবে কে?"

মেমসাহেব হে হে করে উত্তর দিলেন, "না-না বেশি কিছু নয়! সামান্যই। সব কিছু কিন্তু অল্প হলেও নিতে হবে।"

"অল্প করে নিলেও এ বয়সে সামলাতে পারব না। ডাক্তারের মানা।" মুখ্যমন্ত্রী অ্যাপ্রনটা কোলে বসাতে বসাতে বললেন।

মুখ্যমন্ত্রী টেবিলের এক প্রান্তে বসেছেন। তাঁর বাঁ দিকে ম্যাডাম, ডান দিকে কমিশনার সাহেব। ম্যাডাম মেমসাহেবকে বললেন, " আপনি বসবেন না।" তারপর নিজের বাঁ দিকের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, "এখানে আমার পাশে বসুন।"

মেমসাহেব বললেন, "না, আজকে আমি নিজের হাতে পরিবেশন করব।" কমিশনার সাহেব শুকনো মুখে তাকালেন। কেন কে জানে। মেমসাহেব তাঁর সাহায্যকারীদের হাত থেকে চিকেন অ্যাসপ্যারাগাসের সুপের বাটি নিয়ে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী তারপর ম্যাডাম ও কমিশনার সাহেবের সামনে রাখলেন।

ধূমায়িত সুপের ওপর গোলমরিচের গুড়ো, যে যার নিজের পছন্দ মতো এটা ওটা ছড়িয়ে একটু একটু করে খেতে শুরু করলেন। সামান্য চুক চুক আওয়াজ ছাড়া এই মুহূর্তে আর কোনও শব্দ নেই।

মুখ্যমন্ত্রীই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলেন। "ভাল, খুব ভাল।" মুখ্যমন্ত্রীর চোখে তৃপ্তির দৃষ্টি।

মেমসাহেব বললেন, "আমার ছোট বোন বানিয়েছে।" মেমসাহেবের পাশেই একজন বিবাহিতা তরুণী দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি একটু লজ্জা পেলেন। মুখে এক ঝলক হাসি।

"তাই না কি?" এ তো ফাইভস্টার হোটেলকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন।" মুখ্যমন্ত্রীর খোলা প্রশংসা। "তা এতক্ষণ তো ওকে দেখলাম না।"

মেমসাহেবই উত্তর দিলেন, "ওই-ই কিচেন সামলাচ্ছিল, রান্না-বান্নাটা ওর ভীষণ শখ, যেদিন শুনল, আপনারা আজ আসবেন, সেদিনই ও আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল, কিচেনের দায়িত্বটা যেন ওকে দিই। আজ সকাল থেকে তাই ও কিচেনেই পড়েছিল।" ফিস কাটলেট প্লেটে দিতে দিতে এক নিঃশ্বাসে বললেন।

"রান্নার শখ তো খুব ভাল, তাহলে প্রত্যেকেই ভাল ভাল জিনিস খেতে পারি।" মুখ্যমন্ত্রী গাম্ভীর্য্য ছেড়ে সামান্য হেসে বললেন।

কমিশনার সাহেব এতক্ষণ চুপচাপই অন্যদের কথা শুনছিলেন। তারপর নিজের শালীর প্রশংসায় যোগ দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, রান্নাটা ও করে দুর্দান্ত, তাই যখনই আমাকে ওর বাড়ি যেতে বলে, আমি সটান চলে যাই, জানি গেলেই ভাল ভাল খাবার খেতে পাব।"

এত আলোচনা যাকে নিয়ে তিনি দিদির সামান্য আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

শুনছিলেন, এবার জামাইবাবুর ফোড়নে উত্তর না দিয়ে বোধ হয় পারলেন না, বললেন, "তাই প্রায় তিন মাস আমার বাড়িতে পা দেন নি, আমি কিন্তু এর মধ্যে হাজার বার বলেছি।" একটু অভিমানও ঝরে পড়ল।

"যাব রে বাবা যাব, অবসরের পর রোজ যাব। তখন আবার দরজা বন্ধ করে দিও না।" কমিশনারের টিপ্পনী। প্রত্যেকের হাসি। তারপর চুপ। কাটলেট কাটা চলছে।

একটার পর একটা আইটেম প্লেটে চলে আসছে। মুখ্যমন্ত্রী খাচ্ছেন। মাঝে মধ্যে বলছেন, "খুব ভাল, খুব ভাল।" ম্যাডামও তারিফ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটা আইটেমই খুবই অল্প নিচ্ছেন। ম্যাডাম ইতিমধ্যে দু-চারবার মেমসাহেবকে বলেছেন, ওকে কিন্তু বেশী দেবেন না।"

এক ঘন্টা ধরে চলল খাওয়ার পর্ব। কমিশনার সাহেব প্রায় নিশ্চুপই রইলেন। ওর মনের ভেতর বোধ হয় কিছুটা তোলপাড় তাইওয়ানের এনগ্রেভিং করা কাঠের কাজটা আর নিউজিল্যাণ্ডের অসাধারণ শৈলীর ভাস্কর্যটার জন্য। বাঁকুড়ার প্রাচীন ট্যারাকোটার মূর্তিটাও ওর খুবই প্রিয় ছিল। কিন্তু তাইওয়ান ও নিউজিল্যাণ্ডের জিনিস দু'টোর জন্যই ওর ভেতরে দুঃখের ধাক্কাটা বেশী। কি করবে? সি এমের স্ত্রী বলে কথা, তাকে তো খুশী করতেই হবে।

মিনিট পনের পর সি এম সস্ত্রীক বেরিয়ে গেলেন, কমিশনার সাহেব সোফায় বসে পড়লেন। মেমসাহেব এগিয়ে এসে বললেন, "কি হলো, জিনিসগুলি দিয়ে দুঃখ হচ্ছে?"

"দুঃখ তো একটু হচ্ছে অস্বীকার করি কি করে? তুমি তো জানো, ওগুলি আমার খুব প্রিয় ছিল।" তারপর নিজের দুঃখ ঢাকতে বলে উঠলেন, "যাকগে যাগ, আবার হবে।"

"হবে, তবে ওই একই জিনিস তো আর হবে না।"

"তা হবে না, নতুন অন্য কিছু হবে, ম্যাডামকে তো খুশী করা গেল।"

"তা গেল, তোমার কাজ হলেই হলো, চিন্তা কর না। আমরা খেতে যাচ্ছি। তুমি বসে থেকে আর কি করবে।" মেমসাহেব চলে গেলেন।'

কমিশনার সাহেবও উঠলেন, কি কি বার্তা কোথা থেকে এসেছে দেখলেন। কয়েকটা ফোন করলেন। প্রয়োজন মতো নির্দেশ দিলেন। তারপর এগারটা নাগাদ শোওয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মুখ্যমন্ত্রী গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে ম্যাডামকে কোনও কথা বললেন না। কিন্তু বাড়ি ফিরে গজগজ করতে লাগলেন। স্ত্রীর এ ধরণের কাজ যে তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না, সেটা বোঝাতে লাগলেন।

শুধু সেই রাতেই নয়। পরদিন সকালেও বিরক্তি প্রকাশ করলেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ম্যাডামের যে এতেই সুখ! এতেই শান্তি! তিনি মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়ে গেলে

জিনিসগুলি সাজিয়ে রাখলেন। মুখে তাঁর তৃপ্তির, সুখের হাসি।

এরপর প্রায় পাঁচমাস অতিক্রান্ত। এখানে ওখানে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দেখা হয়েছে, বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে। কমিশনার সাহেবের অনেক সমস্যা মুখ্যমন্ত্রী সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে, সেগুলি সামলেছেন। হঠাৎ একদিন বিকেল বেলায় অন্য এক পার্টিতে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে স্বস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা।

দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাডাম কমিশনার সাহেবকে বললেন, "আরে, আপনি তো আর আপনার বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন না।"

কি বলবেন কমিশনার সাহেব? ম্যাডাম তাঁর বুকে যে দগদগে ঘা দিয়ে গিয়েছেন তা এখনও শুকোয়নি। সেটা আড়াল করে মুখে উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে বললেন, "এটা আর বড় কি, যে দিন বলবেন, সেদিনই আপনারা সুস্বাগত! আপনাদের ব্যস্ততার জন্যই আমি কিছু বলিনি, বলুন কবে আসবেন?"

"কেন আগামী রোববার, সন্ধ্যেয়!" মুখ্যমন্ত্রীকে প্রায় তোয়াক্কা না করেই ম্যাডাম ঘোষণা করলেন।

"কি বলছ, আমার সেদিন কি প্রোগ্রাম আছে না আছে না জেনেই তুমি বলে দিচ্ছ।" বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী স্ত্রীকে সামলাবার চেষ্টা করলেন। তাঁর মুখেও তাঁর মনোভাবের প্রকাশ।

কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ। ম্যাডাম বললেন, "ওনার শালীর রান্নাটা দারুণ, বেশিদিন অপেক্ষা করা যাবে না।" তারপর মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার যদি অন্য কাজ থাকে সেটা ক্যানসেল কর, নয়তো, সেদিন তুমি কাজ শেষ করে, একটু পরেই আসবে।"

কমিশনার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওই সামনের রোববার সন্ধ্যেতেই ফাইনাল।"

মুখ্যমন্ত্রীই স্ত্রীর অদ্ভুত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন। ম্যাডাম কমিশনার সাহেবকে বললেন, "ও আমি ওকে নিয়ে আসব, আপনি ব্যবস্থা করুন।"

"ঠিক আছে, ম্যাডাম। আমি ওই ব্যবস্থাই করছি।" স্ত্রীর ব্যবহারে যে মুখ্যমন্ত্রী বিরক্ত অসম্ভব বুদ্ধিমান কমিশনার সাহেবের বুঝতে সামান্যতমও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তিনি কি করবেন? ম্যাডামকেও খুশী রাখতে হবে, মুখ্যমন্ত্রীকেও। তবে একটা ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত, প্রথমবার ওদের অযাচিত, অপ্রত্যাশিত উদ্যোগে যে ভাবে তিনি খুশী ও আনন্দিত হয়েছিলেন, এবার তেমন কোনও অনুভূতি হচ্ছে না, বরং খানিকটা আতঙ্কিত। তিনি পার্টি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন তারপর সোজা লালবাজারে তাঁর চেম্বারে।

চেম্বারে বসেই তিনি প্রথমে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেলেন। তারপর সোজা

বাড়িতে মেমসাহেবকে ফোন করলেন। চোখে মুখে খানিকটা উদ্বিগ্নতা। ফোনে স্ত্রীকে বললেন, "শোনো, সামনের রোববার সন্ধ্যেবেলায় সি এম আর ম্যাডাম আমাদের বাড়িতে খাবে।"

"ও, ঠিক আছে, তা ওদের সঙ্গে তোমার দেখা হলো কোথায়?"

"একটা অনুষ্ঠানে। সি. এমের সঙ্গে তো হয়ই, কিন্তু ম্যাডামের সঙ্গে—।" কমিশনার সাহেবের গলায় আতঙ্ক!

"এবারও কি নিজের থেকেই আসবে বলল?"

"হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ, শোনো, ড্রয়িং রুমে, ডাইনিংয়ে যেখানে যা সব অ্যান্টিক, পেন্টিং যা যা আছে সব এখনই নামাও, ওগুলি আমাদের পেছনের ঘরের গুদামটায় ঢুকিয়ে তালা দিয়ে রাখো।"

"এখনই দরকার কি, আজ তো সবে বুধবার। মাঝে বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার তিনদিন সময় আছে। তার মধ্যে নয় করা যাবে।"

"না-না, আমি কোনও চান্স নিতে চাই না। তোমার যা ভুলো মন, এখনই করে ফেলো না। রোববার ওগুলি সব যথাস্থানে থেকে যাবে, আবার আমাকে দিতে হবে। তুমি বোঝ না। তুমি তো কিছু করবে না রহিমদের বলো, ওরাই সব গুছিয়ে তুলে রাখবে। আমি বাড়ি ফিরে যেন কিছু না দেখতে পাই।"

কমিশনার সাহেব টেলিফোনে স্ত্রীর সামান্য হাসির আওয়াজ শুনতে পেলেন, তারপর গলার আওয়াজ, "আচ্ছা বাবা আচ্ছা, তাই হবে, বাড়ি ফিরে কিছু দেখতে পাবে না, এত উতলা হওয়ার কিছু নেই, তোমার সখের সব জিনিস আমি উধাও করে দিচ্ছি। ও-কে ?"

"হ্যাঁ-তাই দাও।" কমিশনার রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। যথা দিনে যথা সময়ে মুখ্যমন্ত্রী স্বস্ত্রীক এলেন। একই ভাবে অভ্যর্থনা। কমিশনার সাহেবের শালীও আজ এগিয়ে এসেছেন, তাঁর স্বামীও। পরিচয় হলো। ড্রয়িং রুমের সোফায় সবাই গা এলিয়ে দিয়েছেন। কমিশনার সাহেব মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যের খবর নিলেন।

ম্যাডামের চোখ ঘরের এদিক ওদিক ঘুরছিল। হঠাৎ কমিশনার সাহেবকে বললেন, "আরে মি—, সেবার আপনাদের ড্রয়িংরুমে সুন্দর সুন্দর পেন্টিং দেখেছিলাম, আর অ্যান্টিকও অনেকগুলি ছিল, আজ একটাও দেখছি না।"

কমিশনার সাহেব এই প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্ট করেই রেখেছিলেন, বললেন "একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি, ও এখনই ওটা সাজাতে শুরু করেছে, ওখানেই সব নিয়ে গেছে।"

"ও তা কোথায় ফ্ল্যাট নিলেন?" ম্যাডাম জানতে চাইলেন।

"মিন্টো পার্কের কাছে।"

"খুব ভাল।"

মুখ্যমন্ত্রী যা বোঝার বুঝে গেছেন, মুখে চোখে তার অভিব্যক্তি, তিনি এই ব্যবস্থায় খুশী। বলে উঠলেন, "আজ আর দেরি করব না, তাড়াতাড়ি ফিরব।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার। কমিশনার সাহেব বললেন, তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডিনার টেবিল রেডি কর।"

দশ মিনিটের মধ্যে ডিনার টেবিল প্রস্তুত। যথারীতি কমিশনার সাহেব মুখ্যমন্ত্রী ও ম্যাডামকে নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলেন।

পরিবেশন শুরু হলো। মিনিট চল্লিশের মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ। ডাইনিং হল থেকে সবাই বেরিয়ে এলেন। মুখ্যমন্ত্রীর চোখ এড়ায়নি যে ঘরে ঘরে সব জিনিস আগের মতো থাকলেও মূর্তি জাতীয় একটাও জিনিস নেই, কটা ফুলদানি ছাড়া। কেন নেই তা ওর মতো অভিজ্ঞনেতা মুহূর্তেই বুঝেছেন।

বিদায়কালে ম্যাডাম কমিশনার সাহেব ও মেমসাহেবকে বললেন, "আপনাদের নতুন ফ্ল্যাট একদিন দেখতে যাব। বলবেন।

কমিশনার সাহেব বললেন, "নিশ্চয়ই, ওখানে যাই, নিশ্চয়ই বলব।"

মুখ্যমন্ত্রী বাড়ির দিকে রওনা দিতেই মেমসাহেব কমিশনার সাহেবকে বললেন, "তুমি কি আবার ওকে ওই ফ্ল্যাটে ডাকবে না কি?

"খেপেঁছো? ওখানে যখন যাব, তার আগেই তো রিটার্য়ার করে যাব। তখন ঝামেলা নেই। "কমিশনারের সহাস্য উত্তর, নিশ্চিন্ত মুখ।

"তা অবশ্য"। মেমসাহবেও স্বস্তিতে।

বাড়ি ফিরে মুখ্যমন্ত্রী ম্যাডামকে বললেন, "তোমার আর কবে শিক্ষা দীক্ষা হবে, জানি না।"

ম্যাডাম ঘরে ঢুকে গেলেন। স্বামীর কথার মমার্থ কতটা বুঝেছেন বোঝা গেল না। তিনি নিজের ঘোরেই নিজের সুখ নিজের শান্তি খোঁজেন। স্বামীর কতটা সম্মান রইল নিজেরইবা কতটা সম্মান বাড়লো সেটা চিন্তা করার সময় নেই। তোমার সুখের আড়ালে কত অসুখ, তোমার শান্তির ওপারে কত অশান্তি তা বোঝার অবস্থায় থাকলে কেউ আর নিজের বেড়াজালের অন্তরালে ঘোরাফেরা করত না। অন্তহীন সুখের কি কোনও জাহাজ আছে, যে জাহাজে চড়ে জীবনটা অন্তত দিনভাবে চালিয়ে নেওয়া যায়, আমাদের ছায়াপথে কে দেবে এই প্রশ্নের উত্তর? তাৎক্ষনিক সুখের জন্যই তো মানুষ কত না ঘটনা ঘটায়! সুখের নেশায় ভাবে এটা না পেলে বোধ হয় জীবনটা বৃথা, ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর সেই নেশার তাগিদে ঘটে যায় কত না ঘটনা, দুর্ঘটনা!

পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রতি মুহূর্তেই ঘটে যায় আকাঙ্খার বলি। চাহিদার বলি।

উনিশশো আটষট্টি সালের জানুয়ারী মাস। আজ আঠারো তারিখ। শীতের আড়মোড়ো ভেঙে কলকাতা জেগেছে ঘণ্টা খানেক আগে। কুয়াশারা ধীরে ধীরে একবেলার জন্য বিদায় নিয়েছে। কাজের সময় জেগে উঠেছে। এখন কুয়াশারা আর কাজের ক্ষেত্রে বাধার কারণ হবে না। বাস, ট্রাম, গাড়িতে কর্ম্মমুখী মানুষের ভিড় বাড়ছে।

সকাল ন'টা। পার্ক স্ট্রিট থানার টেলিফোন বেজে উঠল। ওপারে এক মহিলার গলা। নিজের পরিচয় জানালেন, "আমি অল বেঙ্গল উইম্যান ইউনিয়ন হোমে সেক্রেটারি কমলা মুখার্জী বলছি, শুনুন, আমাদের এখানে আমাদেরই হোমের একটা মেয়ে খুন হয়েছে, আপনারা দয়া করে এক্ষুণি চলে আসুন।"

"ঠিকানাটা একবার বলুন "এইট্টি নাইন এলিয়ট রোড।"

"আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি, আপনারা সবাই থাকুন।"

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্ক স্ট্রিট থানার অফিসার ইনচার্জ, সাব ইন্সেপেক্টর গজেন্দ্র নাথ ঘোষ ও কনেস্টবল রাম আশিষ দুবে থানার গাড়ি নিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ছুটল।

লোয়ার সার্কুলার রোডের পশ্চিমদিকে এলিয়ট রোডের উত্তরে অল বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়ন হোমের চওড়া গেটের সামনে যখন পার্ক স্ট্রিট থানার গাড়ি পৌছল তখন ঘড়িতে সকাল দশটা পাঁচ। পৌছতে সামান্য দেরি হয়ে গেছে।

গেট দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে পর পর দু'টো টিনের শেড, সম্ভবত দারোয়ানরা থাকে। বাঁ দিকে ক্যানটিন। ক্যানটিনের পরেই রান্নাঘর। উত্তর দিক বরাবর সোজা চলে গেছে রাস্তা।

অফিসাররা গেটের ভিতর গাড়ি ঢুকিয়ে টিনের শেডের সামনে সামনে প্রশস্ত খালি জায়গায় রেখে সামান্য এগিয়ে গেলেন। বাঁ দিকে উইমেন হোমের অফিস। এখানেই অফিসারদের সঙ্গে দেখা হলো সুপারিনণ্টেডেণ্ট শ্রীমতী কমলা মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহকারী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর। ওদের সঙ্গেই আছেন হোমের আরও অনেক আবাসিক কর্মচারী। তাঁদের চোখে মুখে আতঙ্ক, ভয়, অনিশ্চয়তা। সামনা সামনি পুলিশ অফিসার দেখে দ্বিধাগ্রস্তও। কি হবে, কি হবে একটা আশঙ্কা যেন শীতের সকালের ঠাণ্ডার মতো ওদের চোখে মুখে ঘিরে ধরেছে।

কমলাদেবীই এগিয়ে এসে বললেন, "আমিই ফোন করেছিলাম, চলুন, যেখানে ডেড বডিটা পড়ে আছে—।

ওসি বললেন, "হ্যাঁ, আগে ওখানে চলুন, তারপর—।"

দল বেঁধে সবাই উত্তর দিকে হাঁটতে লাগলেন। মহিলা হোমের অফিস ঘর পেরিয়েই শিশুদের হোমের অফিসঘর। উল্টো দিকে শুরু হয়েছে তিনতলা একটা বাড়ি। ওইটা মহিলা আবাসিকদের থাকার জন্য। দক্ষিণ থেকে সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। বাঁদিকে শিশুদের হোম ছাড়ালেই পেছনে তাঁদের হোমের অফিস ঘর তারপর একটা প্রাথমিক স্কুল। মহিলা আবাসিকদের তিনতলা বাড়ির সংলগ্ন একটা একতলা বিরাট ডাইনিং হল। তারই পূর্ব দিকে মহিলাদের জন্য সারি সারি আলাদা বাথরুম ও পায়খানা। তারপর প্রাচীর, প্রাচীরের উত্তর-পূর্বদিকে দিয়ে চলে গেছে বেডর্ফোড রোড।

কমলাদেবী ও রেণু দেবী থানার অফিসারদের ওই নিচের বাথরুমের সামনেই নিয়ে গেলেন।

"এখানেই, ওই যে।"

কমলাদেবীর বলার অপেক্ষা রাখে না। অফিসাররা দেখল, একটা বাথরুমের রাস্তার ওপরেই একটা অল্পবয়সী মেয়ের নিথর শরীর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। শরীরের অর্ধেক বাইরে বাকি আর্ধেক খোলা বাথরুমের ভেতরে। পা দু'টো আড়াআড়ি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, মাথাটা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। দু'টো হাতই মাথার উপর দিকে, মনে হচ্ছে মুঠি দিয়ে কিছু আঁকড়ে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা শেষ পর্যন্ত করেছিল। ঠোঁট দু'টো সামান্য ফাঁক, সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে শুকনো রক্তের দাগ।

গলায় ও থুতনিতেও শুকনো রক্ত। তাতে ক'টা মাছি বসছে, আবার উড়ছে আবার বসছে।

ঢুকরে উঠা কান্নার একটা ক্ষীণ আওয়াজ উঠল। হয়তো যে কেঁদে উঠেছিল সে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সরে পড়েছে। কিন্তু কান্না বোধ হয় খুব ছোঁয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে যায়। তেমনিভাবেই ছড়াতে ছড়াতেই ভিড় পাতলা হয়ে গেল।

কমলা দেবী ও রেণুদেবীর নড়ার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। তাঁদের ওখানে থাকতেই হবে, পুলিশ অফিসারদের সাহায্য করার জন্য।

"নৃসংশ, নৃসংশ"। রেণুদেবীর তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া শোনা গেল।

"হুঁ, অসহ্য, কে, কে এমন করল।" কমলাদেবী মুখে আঁচল চেপে কোনও মতে বললেন।

ফটোগ্রাফার বিভিন্ন দিক থেকে ফটাফট ফটো তুলে চলেছেন। লালবাজার থেকে শিক্ষিত কুকুর এসেছে। তারা মৃত দেহ শুকে সোজা বেডফোর্ড দিকের প্রাচীরের

দিকে ছুটে গিয়ে থমকে গিয়ে ঘেউ ঘেউ চিৎকার জুড়ে দিল, প্রাচীরে আঁচড়াতে লাগল, অর্থাৎ সে প্রাচীর টপকাতে চাইছে। প্রাচীরটা প্রায় আটফুট উঁচু, সে পারবে কেন?

আততায়ী প্রাচীর টপকেই পালিয়েছে। বোঝা গেল। কতদূর। কোথায়? সেটাই জানার দরকার। দ্রুত থানার গাড়ি এনে স্নিপার কুকুরটাকে নির্দিষ্ট জায়গায় বেডফোর্ড রোডে নিয়ে আসা হলো। ও নতুন করে প্রাচীরের দেওয়ালটা শুকে হঠাৎ স্প্রিং টানার মতো ইলিয়ট রোডের দিকে ছুটতে শুরু করল। ওর সঙ্গে ডগ স্কোয়ার্ডের আফিসাররাতো ছুটছেই, সঙ্গে সাব-ইন্সেপেক্টর গজেন্দ্র নাথ ঘোষ ও কৌতুহলী লোকজন। ওর ছোটা দেখে মনে হচ্ছে সে এক্ষুণি আততায়ীকে ধরে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলবে। কিন্তু মিনিট তিনেক ছুটেই খেই হারিয়ে ফেলল। একবার বাঁদিকে, একবার ডানদিকে ছুটতে শুরু করল। এক সময় দিশাহারা হয়ে চোখ দু'টো বড় বড় করে হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে গেল। নিজের অক্ষমতা ঢাকতেই বা হতাশ হয়ে ক'বার ঘেউ ঘেউ করে গরর গরর করে গলার থেকে আওয়াজ বের করতে লাগল।

ওর ছোটার থেকে একটা জিনিস আন্দাজ করা যেতেই পারে। আততায়ী একজন নয়। কমপক্ষে দু'জন বা ততোধিক। তারা একই জায়গা দিয়ে প্রাচীর টপকালেও কিছুদূর একসঙ্গে এসে দু'দিকে আলাদা হয়ে গেছে। স্নিপার ডগ পর্ব শেষ হলে এবার মৃতদেহ পোস্টমর্টমে পাঠানো ও জিজ্ঞাসাবাদের আসল পর্ব শুরু হলো।

মৃত তরুণীর নাম শিখারানী সেনগুপ্ত। কমলাদেবীর থেকে সেটা ওসি জেনে নিয়েছেন। উনিশ কুড়ি বছর বয়স। এর বাবা মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত বহুদিন হলো স্বর্গীয়। বেহালাবাসী মুকুল গোস্বামী ওর জামাইবাবুই স্থানীয় অভিভাবক।

ওসির নির্দেশে কনস্টেবল রাম আশিষ দুবে শিখার প্রাণহীন দেহটা উল্টে দিল।

দেখা গেল কপালে রক্তের দাগ। নাকের ডানদিকে ও থুতনিতে ঘরের দেওয়ালে ঘষার দাগ ও রক্তের জমাট। ঠোঁট জুড়ে কালশিরা, জোরে আঘাতের স্পষ্ট ছাপ। বাঁ কাঁধের সামনে এবং বাঁ হাতের তর্জনীতে কাটাছেঁড়ার দাগ। দু'পায়ের নিচে হাঁটুতে, ডান হাতে ও বাঁহাতের কনুয়ের কাছে শুকনো কাদা!

মৃত্যুর আগে শ্যামলা, শক্ত চেহারা, সাধারণ উচ্চতা, গোলগোল মুখের অধিকারিণী যুবতী মেয়েটা বাঁচার তাগিদ নিয়ে আততায়ীর হাত থেকে পালাতে চেষ্টা করেছিল, সেই লড়াইয়ের দাগ তার শরীরের এখান সেখান থেকে উঁকি মারতেই ধরা দিচ্ছে।

শিখার পরণের নীল ধরণের শাড়িটা এলোমেলো। কালো ব্লাউজটা মনে হচ্ছে নতুনই। সাদা সায়াটা বেরিয়ে আছে। শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, লজ্জা, নারীত্বের ওপারে

এখন সে। ক'টা চোখ, কোন চোখ তাকে দেখছে, কেন দেখছে তার সে ধারও ধারে না। মৃত্যুটা এমনই অদ্ভুত। এই সব আছে, এই কিছু নেই!

আততায়ীরা কিভাবে এসেছিল সেটা দেখতে গিয়েই অফিসাররা দেখল মহিলা হোমের মূল বাড়ির উত্তরপূর্ব কোনা দিয়ে ফুট তিনেক চওড়া, দশ ফুট মতো সোজা উত্তর দিকেই চলে গেছে বাথরুমের দিকে। সে দিকেই বাথরুমের বাইরে মুখ বেরিয়ে একটা বেসিন, রাস্তার পুব দিকে দু'টো পায়খানা, একটা বাথরুম, পশ্চিমে শুধু দু'টো বাথরুম।

বাথরুমগুলি ভীষণ ছোট ছোট, একপাল্লার কাঠের দরজা। ছাদ থেকে সোজা নেমে আসেনি, ওপরটা খোলা। যে কেউ টপকে ভেতরে ঢুকতে পারে। যেহেতু এটা শুধু মহিলাদেরই আবাসন এবং মহিলা ছাড়া এখানে কেউ ঢুকতে পারে না তাই আব্রুতায় কিছুটা শীথিলতা। আবাসিকরাও এটাই স্বাভাবিক হিসাবে মেনে নিয়েছে।

ঊনিশশো বত্রিশ সালে এই অল বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়ন গড়ে ওঠার ভিত্তি ছিল যাতে নারী ও শিশুদের শোষণ, ব্যবসায়িক ভাবে ব্যবহার এবং চরিত্র নষ্ট করার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে। এই ইউনিয়ন ধর্ম-বর্ণ, রাজনীতির উর্দ্ধে। একই উদ্দেশ্যে মহিলাদের সংগঠিত করা, তাঁদের নির্দিষ্ট কাজে যুক্ত করা, এবং সমভাবাপন্ন সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই ধরণের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

পরবর্তীকালের মূল উদ্দেশ্য অনেকটা এইরকম ঃ

(১) জনমত সংগঠিত করা, এবং যে সব সামাজিক প্রশ্নে দ্বিমত, দ্বিধা আছে সেগুলি কাটিয়ে ভবিষ্যতের জাতি গঠন।

(২) ঊনিশশো ছাপ্পান্ন সালের নির্যাতিতা, পতিতা আইন অনুযায়ী সেইসব নির্যাতিতা ও পতিতাদের সাহায্য করা, শিক্ষিত করা, এবং সরকারী বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্য নিয়ে তাঁদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) যে সব মহিলাকে পতিতাবৃত্তি থেকে উদ্ধার করা হবে, যে সব মহিলার থাকার জন্য কোনও বাসস্থান নেই, যে সব শিশু অনাথ তাঁদের জন্য আবাসনের সুযোগ।

এই প্রতিষ্ঠানটি জেনেভার আন্তর্জাতিক অ্যাবলিউনিস্ট ফেডারেশনের দ্বারা স্বীকৃত। কলকাতাতেও এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় শীর্ষপদে যারা আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সম্মাণীয়া, শিক্ষিতা, সমাজে প্রতিষ্ঠিতা, এমন কি লোকসভার মাননীয়া সদস্যও আছেন। প্রচুর কমিটি ও সাব কমিটির মাধ্যমে ওই সব সম্মাণীয়া, মহিলারা এই সংগঠনের বিভিন্ন কাজ, শিক্ষা, হস্তশিল্পের বিভিন্ন বিভাগগুলি পরিচালনা করেন। এমন কী এখানকার হস্তশিল্প, চারুকলা ইত্যাদি নির্মিত জিনিসগুলি গ্র্যাণ্ড হোটেল ও গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের বিক্রয় কেন্দ্র থেকেও বিক্রির সুযোগ দেওয়া হয়। তাছাড়া

এখানে বানানো ওই ধরণের জিনিস ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়াতেও রপ্তানি করা হয়।

কমলাদেবীর কাছ্‌ থেকে জানা গেল, বর্তমানে সেখানে শিশু ও মহিলা আবাসিক মিলে সাড়ে তিনশ জন আছে।

পার্কস্ট্রিট থানার অফিসাররা কমলাদেবীকে বলল, "ম্যাডাম, ওর জায়গাটা, অর্থাৎ যেখানে থাকত সেটা একবার আমরা দেখব।"

"নিশ্চয়ই, চলুন" রাম আশিযকে নিচে রেখে অফিসাররা শিখার সিটটা দেখতে কমলাদেবীদের সঙ্গে সিঁড়ির দিকে চলল।

মহিলাদের আবাসনটা তিনতলা। দোতলায় সবাই থাকে। প্রতি তলাতে মহিলাদের জন্য উত্তরদিকে আলাদা বাথরুম ইত্যাদি আছে। শিখা ওই আবাসনের ব্লক সি-দুইয়ের ডরমিটরিতে থাকত।

মিনিট দুইয়ের মধ্যে ওরা শিখার খাটের সামনে হাজির। এখন ফাঁকা, বিছানার চাদরটা টানটান। গতরাতে এখানে যে কেউ শোয়নি তা দেখলেই বোঝা যায়। পাশাপাশি অন্য আবাসিকদের শয্যাগুলিও এখন ফাঁকা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তঠস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে, অনিশ্চয়তায়। ওদের প্রত্যেকের জীবনটাই তো অনিশ্চয়তায় ভরা, অনিশ্চয়ের নদীর ঢেউয়ের তালে তালে জীবনের তরী ওদের এখানে এনে তুলেছে। একটা ছাদ। একটা নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়। আর সেই নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়ে এ কোন মৃত্যুর হঠাৎ ছোবল! তাই স্বাভাবিক ভয় ওদের চোখে, মুখে, চলনে, শরীরে। তবে কি এটাও নিরাপদ নয়? এই আশ্রয়ও কি পরিত্যাগ করে অন্যত্র, অনির্দিষ্ট কোনও অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে হবে? আবার? রাত্রি শেষে সামান্য যে সূর্যালোক ওরা দেখতে পেয়েছিল তা কি আবার মেঘের অন্তরালে হারিয়ে যাবে? ওরা বুকে কান্না চেপে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সে কি শুধু শিখার অপমৃত্যুর জন্য? নাকি নিজেদের কোনও এক অজানা ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তা ওরা নিজেরাও জানে না! তবে ওদের মুখের অভিব্যক্তি প্রায় একই রকম। মনে হচ্ছে, কোনও এক শিল্পী একই রঙে একটানে ওদের মুখগুলি একই ক্যানভাসে এঁকে রেখেছেন!

শিখার খাটটা ফাঁকা, ও আর কোনও দিন এখাটে শোবে না। ও এখন নিচের বাথরুমের মেঝেয় শুয়ে আছে। আর একটু পর ওর দেহটা চলে যাবে পার্ক স্ট্রিট থানা হয়ে মর্গে। তারপর মর্গ থেকে কোনও এক শ্মশানে। তারপর সব শেষ! এই খাটে অন্য এক শিখা আসবে, শোবে, ঘুমাবে, স্বপ্ন দেখবে। কত হরেক রকম স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন। তাতে থাকবে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। তাতে যেমন থাকবে মৃত্যু, তেমন ফুল, দুঃখ, আর সুখ, হাসি আর বেদনা, জীবন আর জীবন।

"এই খাটটাতে, এখানেই শিখা থাকতো?" ওসির গমগমে গলা।

"হ্যাঁ", রেনুদেবীর উত্তর।

"ও কি পড়ত?"

"শ্রী অরবিন্দ বালিকা বিদ্যালয়ে, ক্লাস এইটে, সকালের বিভাগে।" এবারও রেণুদেবীই জানালেন।

"তাছাড়া আর কিছু?"

"হ্যাঁ, আমাদের এখানে শেলাইও শিখতো। ও খুব শক্তপোক্ত, কর্মঠ মেয়ে ছিল। চট করে ধরে নিতে পারতো। কেন যে—।" রেনুদেবী ভাঙ্গা গলায় বললেন। সম্মতি সূচক একবার ঘাড় নাড়লেন কমলাদেবী।

সহকারী কর্মধ্যক্ষা রেনুদেবী প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, "আমি হোমেই থাকি।' সন্ধ্যেয় আমাদের এখানে প্রার্থনা হয়, তারপর মেয়েরা নিচের খাওয়ার ঘরে গিয়ে খেয়ে দেয়ে ওপরে যে যার জায়গায় চলে যায়। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় শিখা প্রার্থনায় আসেনি। দু'এক সময় এমন হয়, কেউ কেউ অনুপস্থিত থাকে। শরীর খারাপের জন্য বা কেউ ঠিক সে সময় বাথরুম বা—।"

ওসি, "বুঝেছি, আপনি বলে যান।" রেনু দেবী," ও সেদিন রাতে যে খেতেও যায় নি, সেটা আমাকে কেউ বলেনি। আজ সকালে ছ'টা দশ পনেরো নাগাদ আমি তখন আমার বাথরুমে স্নানে ঢুকেছি তখন আমাদেরই আবাসিক গৌরী পাল, শিখার সঙ্গেই এক স্কুলে পড়ে, ও এসে আমাকে বলল, 'দিদি, শিখাকে কোথাও পাচ্ছি না, অনেক খুঁজেছি, আমরা স্কুলে যেতে পারছি না।' আমি বললাম, আরও ভাল করে খুঁজে দেখ, কোথায় আর যাবে, বাড়ির মধ্যেই কোথাও আছে। আচ্ছা .বলে ওরা চলে গেল। খানিকবাদে ওরা আবার ফিরে এলো।" ওসি, "তারপর।"

"আমি তখনও বাথরুমে, বাসন্তী—।"

"বাসন্তী কে?" গজেন প্রশ্ন রাখল।

"বাসন্তী, বাসন্তী চ্যাটার্জী, ও—ও আমাদের আবাসিক, একই স্কুলে পড়ে। ও বলল, 'আমরা অনেক খুঁজেছি, কোথাও পাচ্ছি না, তবে নিচের একটা বাথরুমের দরজা বন্ধ আছে, ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না।' আমি তখন বাধ্য হয়েই ওদের বললাম, তোরা ওকে ছাড়াই স্কুলে চলে যা। আমি দেখছি। ওরা চলে গেল।"

ওসি, "তারপর, কখন জানলেন শিখার অবস্থান।"

"ওরা চলে যাওয়ার পর আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে প্রতিদিনের মতো সামান্য পূজো আর্চ্চা করছি। এমন সময় মিনতি মানে সেও আমাদের এখানকার মেয়ে এসে জানাল, 'দিদি, শিখাকে পাওয়া গেছে।' হাঁফ ছেড়ে জানতে চাইলাম, 'কোথায়'। মিনতি বলল, 'নিচের একটা পায়খানায়, মুখ থুবড়ে পরে আছে, রক্ত বের হচ্ছে। সে কি রে! বলে আমি ওকে নিয়ে নিচে ছুটলাম।"

ওসি, "তারপর নিচে গিয়ে দেখলেন, শিখা মরে পড়ে আছে।"

"না, তখনও আমরা বুঝিনি, বিশ্বাসও হয়নি, একটা জলজ্যান্ত মেয়ে কোনও অসুখ বিসুখ ছাড়া মরে পড়ে থাকবে, সেটা কি করে বিশ্বাস করি বলুন?" রেনুদেবীর গলাটা ভারী হয়ে এলো।

গজেন বলল, "স্বাভাবিক, তারপর?"

"তারপর আর কি, আমি আর মিনতি ওকে ধরে পায়খানার বাইরে খানিকটা বের করে আনলাম। তখনই আমার মনে কু ডেকে উঠল। শরীরটা পাথরের মতো শক্ত, ঠান্ডা। মিনতি ওকে ডাকতে শুরু করেছে, কিন্তু সাড়া দেবে কে? আমি তখন বাধ্য হয়েই মিনতিকে বললাম, এখানে রাখ। আমি দিদিকে ফোন করে আসি। তখন তাড়াতাড়ি গিয়ে দিদিকে ঘটনার কথা বলে চলে আসতে বললাম। তারপর তো—।"

"আমরা এসেছি", ওসি বললেন।

"হ্যাঁ। দিদি এসেই সব দেখে থানায় ফোন করেছিলেন। আমাদের তো আর কিছু করার ছিল না।" রেনুদেবী জানালেন।

"কোনও ডাক্তার ডাকেন নি?" ওসির প্রশ্ন।

"না। বরফের মতো ঠান্ডা শরীর দেখে আপনাদের কথাই প্রথম মনে পড়ল।" রেনুদেবী মাথা নিচু করে উত্তর দিলেন। গলায় আদ্রতা। "বুঝেছিলেন, ডাক্তার ডেকে লাভ নেই। ডাক্তারও আমাদেরই খবর দিতে বলবে, ঠিক তাই তো?"

রেনুদেবী ও কমলাদেবী দু'জনেই মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

আবাসিকরা দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। ওসি কমলা দেবীকে অনুরোধ করলেন, "আমি এখানকার আবাসিকদের ক'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করব, এটা আমাদের ডিউটি। কিছু মনে করবেন না। তদন্তের স্বার্থে।"

কমলাদেবী বললেন, "নিশ্চয়ই। আপনার কাজ আপনি করবেন। আমাদের এখানে বাধা দেওয়ার, কিছু নেই। তবে সবাই খুবই বুঝতে পারছেন, ভেঙ্গে পড়েছে, এমন তো কোনও দিন এখানে কিছু হয়নি, তাই—।" কমলাদেবীর মুখে কাতর আবেদনের ছায়া।

শিখার খাটের বাঁ দিকের খাটটা দেখিয়ে ওসি রেণুদেবীর কাছে জানতে চাইলেন, "এটা কার খাট?"

"বাসন্তী চ্যাটার্জীর।"

"এখানে আছে?"

"হ্যাঁ।" রেণুদেবী বললেন, তারপর আবাসিক মহিলাদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন, "এই বাসন্তী এখানে আয়।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা ফর্সা, রোগা, লম্বা ধরনের বছর বাইশ-তেইশ বছরের

মেয়ে ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠিত ভাবে অফিসারদের সামনে এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

গজেন ওকে বলল, "দেখ, কোনও ভয় নেই। আমরা যা জানতে চাইব সব সত্যি কথা বলবে।"

বাসন্তী মাথা নেড়ে জানাল যে সে সত্যি কথাই বলবে। ওর চোখ দিয়ে টপটপ করে ক' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

ওসিই বলল, "জানি, বন্ধুর মৃত্যুতে খুব দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু কি ভাবে মৃত্যু হলো, সেটা জানার জন্যই তোমার সাহস করে সত্যি কথা বলা দরকার। এখন বল, তুমি এখানে কতদিন ধরে আছো?"

"এক বছর হলো।" খুবই নিচু স্বরে বাসন্তী জানালো।

"এখানে কি কর? কিছু শিখছো টিখছো।"

"হ্যাঁ। সেলাই শিখছি। সেলাইয়ের ডিপ্লোমা। শিখাও আমার সঙ্গে শিখতো।" এবার বাসন্তী কেঁদেই ফেলল।

"কাঁদলে চলবে না। আমাদের হাতে সময় কম। এখন বল, শিখাকে তুমি শেষ কখন দেখেছো?"

বাসন্তী কোনও মতে কান্না থামাল। ভেজা গলাতেই ডরমেটরির পূব দিকের একটা বড় জানালা দেখিয়ে বলল, "গত রাতে রাত সাড়ে আটটার সময় আমি যখন নিচে খেতে যাচ্ছি তখন ওকে আমি ওই জানালার সামনে রেণুবালার সঙ্গে গল্প করতে দেখেছি, তারপর আমি ফিরে এসে আর ওকে দেখিনি। আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আজ সকালে যখন ঘুম থেকে উঠি তখন দেখি সবাই শিখাকে খুঁজছে। তখনই জানতে পারলাম, শিখাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আমিও তখন সবার সঙ্গে শিখাকে খুঁজতে শুরু করি।" আবার কেঁদে ফেলল বাসন্তী। আঁচল দিয়ে মুখটা প্রায় ঢেকেই ফেলল।

কমলাদেবী ও রেণুদেবী দু'জনে মিলে বাসন্তীকে কান্না থামাতে বললেন, "এই, বাসন্তী, এখন আর কাঁদিস না। ওনাদের কথার উত্তর দে, পরে যত ইচ্ছে কাঁদিস।"

বাসন্তী মাথা নেড়ে ওদের জানানোর চেষ্টা করল যে, ওদের আদেশ মানার চেষ্টা করছে। মিনিট খানেক পর আঁচলটা মুখ থেকে সরালো। তারপর নিচু স্বরেই অফিসারদের বলল, "বলুন।"

ওসি বলল, "তারপর?"

বাসন্তী বলল, "তারপর আর কি, আমিই প্রথম ওকে নিচে ওখানে দেখি। তারপর ছুটে এসে রেনুদিকে জানাই।"

"হুঁ। আচ্ছা বল তো, ওর কি কোনও ছেলে বন্ধু ছিল?"

বাসন্তী মাথা নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ।"

"কে সে? কী নাম? কোথায় থাকে? জান?"

"ওর নাম স্যার নরেন, এখন কোথায় থাকে জানি না।" বাসন্তীকে বলল "তার মানে আগে কোথায় থাকত, তা জান, সেটাই বল।"

কমলাদেবী বলে উঠলেন, "নরেন আমাদেরই এখানে আগে কাজ করত, ওর আচরণের জন্য ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর ও এখন কি করে আমরা কিছুই জানি না।"

"কি এমন আচরণ করেছিল যে ওকে তাড়িয়ে দিতে হলো?"

"ও-ই শিখার সঙ্গেই হেসে হেসে কথা বলত, চিঠি দিতে দেখেছি, মোট কথা আচরণটা আমাদের একদমই ভাল লাগেনি, তাই সাবধান হয়ে যাই। অস্থায়ী ফোর্থ ক্লাস স্টাফ ছিল, ছাঁটাই করতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। আমাদের এখানে এটাই ধারা।" বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই কমলাদেবী জানালেন।

"হুঁ।" ওসি এবার বাসন্তীর দিকে তাকালেন, প্রশ্ন রাখলেন, "আচ্ছা বাসন্তী, এখন শিখা যে শাড়িটাড়ি পরে আছে, গতকাল ওকে যখন তুমি শেষবার দেখেছো, ও কি ওই ড্রেসই পরে ছিল?"

"হ্যাঁ, ওই শাড়ি আর ব্লাউজটাই পরেছিল।" বাসন্তীর গলাটা এখন অনেক পরিষ্কার।

শিখার খাটের একদিকে থাকে বাসন্তী। অন্যপাশে কে থাকে? জানতে চাইলেন ওসি। বাসন্তীই জানালো, "স্যার শোভা থাকে।"

"এখানে এখন আছে?"

"হ্যাঁ, আছে"। বাসন্তীই শোভাকে ডাকলো। "শোভা তোকে স্যার ডাকছে।" বাসন্তীর ডাকে ওদেরই বয়সী একটা শ্যামলা মেয়ে আড়ষ্ঠ ভেঙ্গে অফিসারদের সামনে এগিয়ে এলো। ও যে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, এবং সে ব্যাপারে প্রস্তুত ছিল। তা ওর চলনে বোঝাই যাচ্ছে। "বলুন।" মাথা নিচু করেই শোভা বলে ফেলল।

তোমার নাম কি, এখানে কতদিন আছো?'

"শোভা বণিক। এখানে আমিও বাসন্তীর মতো একবছর হলো আছি।" গজেন যেমন অন্যদের বয়ান লিপিবদ্ধ করছিল, তেমনই ওর বক্তব্য লিখতে শুরু করল।

"শিখাকে তুমি কখন শেষ দেখেছো?"

"রাতের খাবার খেতে যাওয়ার আগে ওকে রেনুবালার সঙ্গে গল্প করতে দেখেছি। ওটাই শেষ, তারপর দেখলাম, রেনুবালা আমাদের সঙ্গে খেলো, শিখা কিন্তু আসে নি, খায়ওনি। ভাবলাম, ওর বোধ হয় পেট টেট খারাপ, তাই আসেনি। এমন আমাদের এখানে হয়। কারও পেট—।"

"বুঝেছি। ও কি কারও সঙ্গে প্রেম করত? এ বিষয়ে কতটুকু জানো?"

"নরেনের সঙ্গে, তবে ইদানীং আমি এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু শুনিনি।" শোভা বলল।

"আর কি জানো?"

"আর কিছুই জানি না। আমি ওকে নরেনের সঙ্গে কথা বলতে একদিন বারণ করেছিলাম। তাই ওই ব্যাপারে ও আমাকে কিছুই বলতো না। তবে ক'দিন ধরে দেখছিলাম, ও মাঝেমধ্যেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। আগে যেমন ঝটপট কাজ নিয়ে, লেখাপড়া নিয়ে মন দিত, হঠাৎ দেখলাম, মনটা ঠিক নেই। তাই পরশু রাতে ওকে শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওর কিছু হয়েছে কিনা? ও বলেছিল, না, কিছুই হয়নি। আমি আর কিছু বলিনি। ভাবলাম, ও কিছু একটা লুকচ্ছে। তবে তার শেষ যে এভাবে হবে ভাবিনি।" একদমে এত কথা বলে এবার শোভা ভেঙ্গে পড়ল। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

"ঠিক আছে, তুমি যাও, পরে দরকার হলে তখন জিজ্ঞাসা করব।"

ওসি রেনুদেবীকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা রেনুদেবী, আপনাকে প্রথম কে খবরটা দিল?"

"বাসন্তী, আর মিনতি ব্যানার্জী। মিনতি মানে আমাদের এখানকার ক্যান্টিনের একটা স্টাফ।" মিনতিও দঙ্গলে উপস্থিত। রেনুদেবীই ওকে ডেকে অফিসারদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। অন্যদের থেকে বয়সটা সামান্য বেশি।

"তুমি তো এখানকার ক্যান্টিন স্টাফ?"

"হ্যাঁ। দু'বছর হলো আমি ক্যান্টিনয়ে আছি। গতরাতের ডিনারে শিখাকে খেতে দেখিনি। আজ সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ নিচের বাথরুমের সামনে মেয়েদের ভিড় দেখে আমি তাড়াতাড়ি কি হয়েছে দেখতে গিয়ে তো চোখ একেবারে ছানাবড়া, তখনও কিছু বুঝিনি। কিছু না ভেবেই আমি আর বাসন্তী ছুটে এসে ছোটদিকে জানাই।"

"তারপর? বলে যাও।" গজেন লিখতে লিখতে বলল।

"ছোটদি আসার পর আমরা শিখাকে ওই পায়খানা থেকে কিছুটা বের করতেই ছোটদি বলল, 'দাঁড়া আমি দেখছি।' উনি শিখার নাড়ী টিপে দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন, 'তোরা সবাই উপরে চলে যা, এখন নামিস না। আমি যা করার করছি।' তখন থেকেই আমি উপরে বসে আছি।" মিনতি ধরা গলায় বলল, হোমের সাম্মানিক সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী অনিমা বসাক উপস্থিত। তিনি ওসিকে অনুরোধ করলেন, "আজ এদের মনের যা অবস্থা, দয়া করে ওদের আর বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। পরে এসে যা তদন্ত করার করবেন, আমাদের কিছু বলার থাকবে না।"

ওসি ও গজেন রাজি হলো, তারা লালবাজারে খবর পাঠিয়ে মৃতদেহ সরানোর গাড়ি এনে শিখার দেহ কলকাতা পুলিশের মর্গে পাঠিয়ে দিল। পার্ক স্ট্রিট থানায় ফেরার পথে আগের দিনের ডিউটির দারোয়ান জোখান দুবেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য থানায় নিয়ে এল।

গজেনরা জোখানকে থানায় এনে প্রথমে একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে রাখল। এটা একটা কৌশল, যাতে সামান্য হলেও আতঙ্কিত হয়ে যায় এবং সত্য কথাটা গড়গড়িয়ে বলে ফেলে। অবশ্য যারা অভ্যস্থ অপরাধী, বহুবার বিভিন্ন কারণে গ্রেফতার হয় কিংবা ধুরন্ধর ষড়যন্ত্রকারী, পেশাদার খুনি ও ডাকাত, চোরাচালানকারী, চিটিংবাজ, কেপমারি এইসব অপরাধীদের ক্ষেত্রে এই ধরণের হাল্কা চালে কোনও কাজই হয় না। তাঁদের ওপর সামান্যতম প্রভাবই পড়ে না। তারা ঈশ্বরের কাছেও সত্যি কথা বলে না তো পুলিশের কাছে বলবে!

আধ ঘণ্টা পর গজেন ওকে থানার ভেতর নিয়ে গেল এবং সরাসরি বলল, "দেখো জোখান সব কথা পরিষ্কার করে বলবে নয়তো তোমাকে আমি চালান করে দেব, খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে দেব।"

গজেনের হুমকি শুনে জোখান প্রায় কেঁদে ফেলে। সে গজেনের পা ধরে বলতে থাকে, "না-না হুজুর' আমি সৎ ব্রাহ্মণ, আমি এ কাজ করি নাই। খুকিদের আমি নিজের মেয়ের মতো দেখি, আপনি জেনে নিতে পারবেন। আমি এ কাজ কেন করব হুজুর।"

"ঠিক আছে, সেটা আমি পরে দেখছি, যা জানার এখন বল।" গজেন গম্ভীর গলায় বলে জোখানের জবানবন্দি লেখার জন্য প্রস্তুত হলো। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কালরাতে ক'টার সময় তোমার ডিউটি শুরু হয়েছিল?"

"সামকো সাত বাজে সে শুভা সাত বাজে। দিন মে ডিউটি ছিল পরশুরাম পান্ডের।

"তার মানে যা হওয়ার সবটাই তোমার ডিউটির মধ্যেই ঘটেছে। রাতে কোনও সময় চিৎকার চেঁচামেচির কোনও আওয়াজ শোনোনি?" গজেন জিজ্ঞেস করল।

"না হুজুর, আমি কিছুই শুনিনি। দিদিদের হোম থেকে গেটে কোনও আওয়াজই শোনা যায় না।"

"কখন জানলে শিখারানী মরে গেছে? তুমি ওকে চিনতে তো?"

"জরুর চিনতাম। হোমের সবাইকে হামাদের চিনে রাখতে হয়। নয়তো কে কখন ঢুকে যাবে, বেরিয়ে যাবে। এটাই তো হামাদের ডিউটি হুজুর। হামরা তো অফিস তক যেতে পারি। তার বেশি নয়। গেটে সব সময় নজর রাখতে হয়। আজ শুবা ছ বাজে দিদিরা ইস্কুল যাওয়ার জন্য গেট পাস নিয়ে এল। দেখলাম একজন

কম। হামাদের বলে দেওয়া আছে যতজনের গেট পাশ থাকবে ততজনকেই বাইরে যেতে দিতে, একভি কম-জাদা চলবে না। হামি হোই কথা বলতে ওরা আবার ভেতরে চলে গেল। খুঁজে আনতে গেল।"

"তুমি তখনও কিছু জানো না। নাকি জেনেও বলনি?"

"না হুজুর, হামি কি করে জানবো? হোমে যাওয়ার তো হামাদের পারমিশানই নেই!" জোখানের গলায় বেশ বিস্ময়!

"ওরা আবার ফিরে এল?"

"হ্যাঁ, মিনিট দশ পনেরো পর। সঙ্গে ঊষা দিদিমনি!"

"ঊষা দিদিমনি কে?"

"টিচার আছে হুজুর। আগে হোমেই ছিল। তারপর লেখাপড়া শিখে কাজ শিখে টিচার হয়ে গেল। শোভাদি আর উনি হোমের ইনচার্জ ভি আছে, ওখানেই থাকে।"

"তারপর বলে যাও।" গজেন লিখতে লিখতে বলল "ওই ঊষা দিদিমনিই বললেন ওদের ছেড়ে দিতে। হামি ছেড়ে দিলাম। ওরা ইস্কুলে চলে গেল। ঊষা দিদিমনি ভি আন্দার চলে গেল।"

গজেন জোখানের কথাগুলি লিখে ওর দিকে তাকাল।

"এর প্রায় আধঘণ্টা পরে শুনলাম ওই দিদিটাকে পাওয়া গেছে নিচের বাথরুমে। ও মরে গেছে। ইয়ে শুনকর হামি বিলকুল বেবাক বনে গেছি। এতনা আচ্ছা লড়কি থা কি করে মরলো হুজুর? ছোটা ওমর, হামারা বহুত দুখ হুয়া।" জোখানের গলাটা বসে গেল।

"কি করে মরল সেটাইতো তোমার কাছে জানতে চাইছি জোখান।" "কুছ জানলে তো হুজুর হামি বলেই দিতাম। হুজুর ও কি খুদখুশি করল না কেউ ওকে মারল? জোখান জানতে চাইল।

"পোস্টমর্টম রিপোর্ট ছাড়া বলতে পারবো না।" গজেন ওকে এর চেয়ে কিছু বললনা। তারপর বলল, "তুমি এখন যেতে পার জোখান, তবে আমাকে না জানিয়ে হোম ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না। এখন ছুটি নেবে না। দরকার হলেই তোমাকে যেন পাই।" শেষের কথাগুলির মধ্যে স্পষ্ট নির্দেশ।

জোখান উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে ঘাড় কাৎ করে জানাল, "জো হুজুর, নমস্তে হুজুর, হামি হোমেই থাকবো। জোখান চলে গেল।

খবর পেয়ে শিখার জামাইবাবু মুকুল গোস্বামী পার্ক স্ট্রিট থানায় এসেছেন, কিন্তু তিনি মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনও আলোই দেখাতে পারলেন না। শিখার মৃতদেহ কিভাবে পাওয়া যাবে সেই সব খোঁজ নিয়ে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে কনস্টেবল রাম আশিষ দুবেকে কলকাতা পুলিশ মর্গে শিখাকে

চিহ্নতকরণ ও ওর দেহ ওর আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে গজেন আবার হোমে গিয়ে অধ্যক্ষা কমলা মুখোপাধ্যায়, শিক্ষিকা উষা ঘোষ, আবাসিকা চিনু চক্রবর্তী, প্রভা মুখোপাধ্যায়, মায়া চক্রবর্তী, জয়ন্তী দাস, অমলা বসু, সাবিত্রী ঘোষ, মায়া দাস, মীরা চক্রবর্তী, বাসবী ঘড়াই, শিবাণী দাস, ভবানী ঘোষ, বীণাপাণি পাল, শিবানী মজুমদার ও উর্মিলা ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। কিন্তু ওরা এতই ভীত, ত্রস্ত আতঙ্কিত হয়ে আছে যে নতুন করে কোনও আলোকপাত করতে পারল না। শুধু অধ্যক্ষা জানালেন নরেনকে তিনি সাতষট্টি সালের পাঁচই আগস্ট বরখাস্ত করেছিলেন। কারণ তিনি সেইদিন দেখেছিলেন শিখা নরেনকে এক কাপ চা দিচ্ছে আর নরেন একটা চিঠি শিখাকে দিচ্ছে। শিখার বন্ধু আবাসিকা রেনুবালা সরকার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের সামনে হাসছে। তিনি এই ঘটনার পর শিখা ও রেনুবালাকে ধমক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু নরেনকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন।

হোমে শিখার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল রেনুবালা। ওর থেকে শিখা সম্পর্কে নতুন কোনও আলোকপাত পাওয়া যায় কিনা তা দেখার জন্য গজেন অধ্যক্ষাকে অনুরোধ করলেন, 'রেনুবালা কোথায়? ও কি গতকালের মতো আজও স্কুল থেকে ফেরেনি? ফিরলে ওকে একবার ডাকুন।"

অধ্যক্ষা মুখোপাধ্যায় জানালেন, "না, ও আজ স্কুলেই যেতে পারেনি খুব জ্বরে কাবু হয়ে বিছানাতেই শুয়ে আছে। এখানে আসার মতো অবস্থাতে নেই। আঘাতটা ওর মনেই সবচেয়ে বেশি লেগেছে।"

গজেন বুঝল রেনুবালাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাওয়া যাবে না। ও তখন হোমের হস্তশিল্প শিক্ষার সম্পাদিকা কল্পনা দে কে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে পার্ক স্ট্রিট থানায় ফিরে এল। ওর অধীনেই নরেন পুস্তি কাজ করত।

গজেন আধ্যক্ষাকে বলল, "নরেনকে চাকরিতে কি মুখের কথায় নিয়েছিলেন, নাকি ওর থেকে কোনও দরখাস্ত নিয়েছিলেন।"

"অবশ্যই দরখাস্ত নিয়েছিলাম, মুখের কথায় এখানে কিছু হয় না।"

"ওই দরখাস্তটা আমি একবার দেখবো।" গজেন দৃঢ়ভাবে বলল।

কমলাদেবীর ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল। গজেন কমলাদেবীকে নরেনের চাকরির দরখাস্ত দেখাতে অনুরোধ জানানোর পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং মিনিট খানেকের মধ্যে একটা ফাইল বার করে তার ভেতরের একটা ইংরাজি টাইপ করা কাগজ গজেনের সামনে মেলে ধরলেন।

"এই যে, এটাই ওর দরখাস্তটা।" অধ্যক্ষা কমলা দেবী বললেন,

গজেন যে উদ্দেশ্যে দরখাস্তটা দেখতে চেয়েছিল সেটা দরখাস্তের মাঝখানে আলাদা করে লেখা আছে দেখল। নরেনের ঠিকানাটা, সেটা লেখা আছে।' স্থানীয়

ঠিকানা ঃ প্রযত্নে হলধর প্রুস্তি, দেনা ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ব্রাবন রোড, কলকাতা।" গজেন বুঝল ব্রাবন রোডের দেনা ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চে কোনও এক হলধর প্রুস্তি, সম্ভবত ওর কোনও এক আত্মীয় ওর স্থানীয় অভিভাবক বা ওই ধরনের কিছু। গজেন ওই ঠিকানাটা লিখে পার্কস্ট্রিট থানায় ফিরে এল। বিশেষ কাজের কাজ কিছুই হলো না।

পরদিন দুপুর বারটার সময় গজেন আবার ইলিয়ট রোডের অল বেঙ্গল উইমেনস্ ইউনিয়নের হোমে এল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এবার সে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল হোমের পিয়ন নিত্যানন্দ দাস ও নারায়ণ দাসকে, ওরা দু'জনেই হোমের কোয়ার্টারে থাকে। জিজ্ঞাসা করে গজেন কিছুই পেল না। পরশুরাম পান্ডে, হোমের স্থায়ী দারোয়ান, ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হোমে প্রবেশ, সাক্ষাৎ করার নিয়ম ছাড়া শিখার মৃত্যু সম্পর্কিত কোনও তথ্যই জানতে পারল না। ফুলকুমারী মন্ডল, ধানুদেবী, দু'জনেই হোমের সুইপার, কর্মচারী মুকুল গুহ, ভীম নায়েক, ভূপেন্দ্র কুমার রায়, শিক্ষিকা নিলীমা ঘোষ, যমুনা মুখোপাধ্যায়, রমলা চৌধুরী, বীণা দাসদের জিজ্ঞাসা করে একই ফল। শূন্য।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা গজেন শিখার পোস্টমর্টমের রিপোর্ট হাতে পেল। ডাঃ সি. সি মল্লিক পোস্টমর্টম করেছেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে পরিষ্কার ভাবে লিখে দিয়েছেন শিখারানী সেনগুপ্তের মৃত্যুর কারণ জোর করে শ্বাসরোধ এবং মাথায় আঘাত। শরীরে কোনও বিশেষ ক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর কারণ হত্যা।

পার্কস্ট্রিট থানার অফিসারদের সন্দেহই সত্যিতে পরিণত হলো। শিখার মৃতদেহ দেখে ওরা সন্দেহ করেছিল শিখার মৃত্যুর কারণ হত্যাই, আত্মহত্যা নয়।

রিপোর্ট পাওয়ার পর কাজের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেল। গজেন একুশ তারিখ সকাল দশটায় আবার হাজির হলো হোমে। বিশেষ বন্ধু রেনুবালা ও চিনুকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই হবে। ওরাই হত্যার কারণ সম্বন্ধে আলো দেখালেও দেখাতে পারে।

রেনুবালার জ্বর কমে গেছে। ওকে গজেন জিজ্ঞাসাবাদ করল। কিন্তু রেনুবালা শারীরিক ও মানসিক ভাবে গজেনের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো প্রস্তুত নয়। বারবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে লাগল। তারপর চিনু এবং অন্যান্য দু-একজনের সঙ্গেও কথা বলল।

গজেন ফিরে এল। বাইশ তারিখ আমাদের লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরের মার্ডার সেকশনের অফিসার ইন-চার্জ শম্ভু দাস সরকারের মাধ্যমে আমাকে ডি. সি. ডি. ডি. নিরুপম সোম ডেকে পাঠিয়ে পার্কস্ট্রিট থানায় গিয়ে শিখারাণীকে খুনের তদন্তের অগ্রগতি জেনে গজেনকে সাহায্য করতে নির্দেশ দিলেন। আমি সেদিনই দুপুরে পার্কস্ট্রিট থানায় এসে গজেনের সঙ্গে দেখা করে শিখার খুনের ব্যাপারে গজেনের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম।

আলোচনা করে একটাই নাম পাওয়া গেল। নরেন, নরেন প্রুস্তি। কিন্তু সে কেন তাঁর প্রেমিকাকে খুন করতে যাবে? শিখার সবচেয়ে কাছের বন্ধু রেনুবালার বয়ান অনুযায়ী শিখাও নরেনকে ভালোবাসতো। তাঁরা ঘর বাঁধতেও চেয়েছিল। চাকরি চলে যাওয়ারও পরে যোগাযোগ ছিল। যোগাযোগটা হালকাভাবে ছিলনা। মনে হলো, গভীরভাবেই ছিল। কতটা গভীর ছিল তা জানার জন্য এক্ষুনি আমার রেনুবালার সঙ্গে কথা বলার দরকার। গজেনকে বললাম, "আমাকে এখনই একবার ওই হোমে নিয়ে যেতে পারবেন?"

গজেন বলল, "নিশ্চয়ই, কেন পারবে না? পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নিচ্ছি।"

গাড়ি আমি সঙ্গেই এনেছিলাম। সত্যিই গজেন, আমি আর কনস্টেবল রাম আশিষ আমার গাড়িতে হোমের দিকে রওনা দিলাম।

হোমে পৌঁছে নিয়ম মতো অধ্যক্ষা কমলাদেবীর সঙ্গে দেখা করলাম। গজেনই অধ্যক্ষাকে আমার পরিচয় দিতেই জানাল, "ইনি লালবাজারের হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের সাব-ইন্সেপেকটর রুণু গুহ নিয়োগী ; শিখার হত্যার ব্যাপারে তদন্তের জন্য আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন।

অধ্যক্ষা কমলাদেবী একবার আমার দিকে তাকিয়ে চেয়ার দেখিয়ে বললেন, "বসুন, বলুন আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?"

আমি সরাসরি বললাম, "শিখা যেখানটায় থাকতো সেখানে আমি একবার যেতে চাই। আর যেখানে ওর মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছিল সেই বাথরুমটা, তার আশেপাশের.........।"

অধ্যক্ষা কমলাদেবী বললেন, "বুঝেছি ,তারপর নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলুন, আমিই আপনাকে সেই জায়গাগুলি ঘুরে দেখাচ্ছি, "তিনি আমাকে প্রথমেই যে ডরমিটরিতে শিখা থাকত সেখানে নিয়ে গেলেন। উপস্থিত আবাসিকাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা একপাশে সরে দাঁড়াও, এনারা চলে গেলে আবার যে যার কাজ করবে, "ওরা দ্রুত কমলাদেবীর নির্দেশ পালন করলেন।

অধ্যক্ষা আমাকে শিখার বিছানাটা দেখিয়ে বললেন, "এটাই শিখার সিট ছিল, এখনও কাউকে অ্যালর্ট করা হয়নি।"

গজেন এর আগেও এখানে এসেছিল। ওর ওই জায়গাটা চেনা। গজেনই আমাকে ওই ডরমেটরির পূর্ব দিকের একটা বড় জানালা দেখিয়ে বলল, "ওই জানালার সামনেই শিখাকে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে শেষ কথা বলতে দেখা গেছে। অন্যেরা তখন রাতের খাবার খেতে নিচে নেমে গেছে।"

আমি জানালাটা দেখলাম, লম্বা লম্বা লোহার শিকের একটা জানালা, আর কোন

তার বৈশিষ্ট্য নেই। আমি শিখার বিছানার দিকে এগিয়ে গেলাম। বিছানার পাশে একটা ছোট টেবিল, টেবিলের তলার দিকে তাক করা, জিনিস পত্তর রাখার জন্য, অনেকটা হাসপাতালের রোগীর বিছানার পাশে যেমন একটা র‍্যাক করা টেবিল থাকে সেই ঢঙেই এই আসবাবটা। টেবিলটার তাক গুলিতে শিখার বই খাতা এখন বেশ গুছানো অবস্থায়। মনে হচ্ছে, এই বোধ হয় শিখা স্কুল থেকে ফিরে ওই গুলিকে টেনে নিয়ে সামনে মেলে ধরে পড়তে বসবে।

আমি একটা বই টেনে নিলাম। মলাটের উপর সামান্য ধুলো। এ ক'দিন ওর বইপত্র কেউ ভয়ে হোক বা অন্য কোন কারনেই হোক সে গুলি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেনি, ওই ধুলোর আস্তরনেই তার প্রমাণ। বই গুলি ঘাঁটতে ঘাঁটতে কতকগুলি চিঠি পেলাম, পোষ্ট কার্ড আর খামে ভরা। জলপাইগুড়ি, ফালা কাটা, দুর্গাপুর থেকে ওর কোন এক বাদল দা, ডলিদি, মাসি ইত্যাদির পাঠানো।

খুনের তদন্তে এসেছি। চিঠি গুলি সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করলাম। আমি উত্তর বঙ্গের লোক। জলপাইগুড়ি, ফালাকাটার নাম দেখেই অধ্যক্ষা কমলা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "শিখা কি জলপাইগুড়ির মেয়ে?"

তিনি বললেন,"ওখানকার আবাসনেই ও থাকতো, ওখান থেকেই ওকে এখানে পাঠানো হয়েছিল, ওর এখানকার অভিভাবকরা আরও ভালভাবে বলতে পারবেন,"

উত্তরবঙ্গ নিয়ে যে আমার একটা বিশেষ টান আছে তা কমলাদেবী জানবেন কি করে?

ওর জবাবের উত্তরে শুধু বললাম,"ও", তদন্তের কাজে এসে ছটপট করতে নেই, যুক্তি, বুদ্ধি, চোখ, মস্তিকের সমস্ত কোষকে অসম্ভব ঠান্ডা রাখতে হয়। সেই ঠান্ডা বুদ্ধি দিয়ে অন্ধকারে আলো ফেলে ফেলে লক্ষ্যে পৌছতে হয়। নিজেরাই বাচাল হলে অপরাধীদের বহু ক্ষেত্রে সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই কথা বিচার করে, মেপে বলতে হয়। জলপাইগুড়ি, ফালাকাটার প্রসঙ্গ ওখানেই থামিয়ে দিলাম। প্রয়োজনে ঢাকনা তুলে দেখতে হবে। হ্যাঁ, শুধু প্রয়োজনেই। তদন্তের প্রয়োজনে।

শিখার বইপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র সবই উল্টে পাল্টে দেখতে শুরু করলাম। যোগসূত্র খুঁজতে চাইছি। কারণ-খুঁজতে চাইছি। গজেন আর রাম আশিষ ও আমরা সঙ্গে সঙ্গে খোঁজার কাজে নেমে পড়েছে। এ এক অনন্ত ধৈর্য্যের পরীক্ষা। না, ওই চিঠির গুচ্ছগুলি ছাড়া বিশেষ কিছুই পেলাম না।

শিখার বিছানাটা ঘেঁটে দেখলাম। সন্দেহজনক কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মেয়েলী ক'টা জিনিস বিছানার তলায় লুকনো। ব্যাস, অন্য কিছু নেই। স্বাভাবিক।

আমিই কমলাদেবীকে জিজ্ঞেস করলাম, "শিখার বন্ধু রেণুবালা কোথায়, ওকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করব।"

কমলাদেবী শিখারই বয়সী একটা শ্যামলা মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, "ওই তো রেণুবালা, ওর শরীরটা খুবই খারাপ। বেশি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। যাতে—।"

"সেটা আমরা জানি। তবু ওর জবানবন্দিটা আমাদের কাছে জরুরি, বুঝতেই পারছেন। ওই-ই শিখার সবচেয়ে ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল, এমন কী ওর সঙ্গেই শিখাকে শেষ দেখা গেছে। তাই ওর বয়ানটা আমাদের কাছে মূল্যবান।"

রেণুবালাকে কমলাদেবী নিজেই ডাকলেন। দোহারা চেহারার মেয়েটা রোগে শোকে প্রায় ক্ষীণজীবী হয়ে গেছে। চুলে ক'দিন তেল পড়েনি। রুক্ষ, মুখটা শুকিয়ে আছে। শুধু ওর চোখ দু'টো বেশ টসটসে। ক'দিন ধরে যে ওই চোখ দুটো দিয়ে যে ভরা বর্ষার শ্রাবণধারা বয়েছে তা না দেখলেও, বোঝা যাচ্ছে।

ধীর পায়ে রেণুবালা এগিয়ে আসার চেষ্টা করতেই আমি বললাম, "তোমায় আসতে হবে না, আমরাই যাচ্ছি।" আমরা ওর খাটের কাছে এগিয়ে গেলাম। ও ওর খাটে বসে পড়ল।

রেণুবালা কিছু বলার আগেই আমি কমলাদেবীকে অনুরোধ করলাম, "অন্যদের এখন একটু নিচে যেতে বলুন। আমরা চলে গেলে যেন আসে।"

কমলাদেবী উৎসুক আবাসিকাদের আমার অনুরোধ মতই নির্দেশ দিলেন। ডরমেটরি ফাঁকা হয়ে গেল। আমরা ক'জন পুলিশ ছাড়া অধ্যক্ষা ও রেণুবালা।

আমি রেণুবালাকে বললাম, "তোমার কোনও ভয় নেই। নির্ভয়ে তুমি যা জানো আমাদের বল। কোনও কিছু গোপন করবে না।"

গজেন ওর কেস ডায়েরির পাতা খুলে নিল। রেণুবালার বয়ান ওখানে লিপিবদ্ধ করতে হবে। রেণুবালা মাথা উঁচু করে একবার আমার দিকে একবার অধ্যক্ষার দিকে তাকাল। উদাস দু'টো চোখ, হয়তো শিখার চেহারা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে কিংবা ওর মৃতদেহ বা হারিয়ে যাওয়া কোনও মুহূর্ত।

কমলাদেবী অভয়ের ভঙ্গিতে রেণুবালাকে বললেন, "বল না, কোনও ভয় নেই। তোর সাহায্যের দরকার।"

আমিও বললাম, "না-না, ভয়ের কি আছে। তুমি যা জান বল।"

রেণুবালা বলতে শুরু করল, "আমি এখানে আসার আগেই শিখা এখানে এসেছে। পাশাপাশি থাকতে থাকতেই আমাদের দু'জনের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। আমরা একই সঙ্গে স্কুলে যেতাম, স্কুল থেকে ফিরতাম, সেলাই শিখতাম, সবই একসঙ্গে করতাম। ও ওর সব কথা আমাকে বলত, আমিও বলতাম্ "রেণুবালা একটু থামলো। অসুস্থ শরীর। সামান্য দম নিল।"

বললাম, "তাড়াহুড়োর কিছু নেই, তুমি আস্তে আস্তেই বল, ভেবে ভেবে।" গজেন রেণুবালার বয়ান কেস-ডায়েরিতে লিখতে শুরু করেছে। কমলাদেবী ওদের ক্যান্টিন থেকে আমাদের জন্য চা আনিয়েছেন। আমরা রেণুবালার বয়ানের জন্য অপেক্ষা করতে করতে চায়ের কাপে চুমুক দিতে শুরু করলাম।

রেণুবালা বলতে লাগল, "বিশ্বাস করুন, আমি ভাবতেও পারছি না, শিখার এ রকম হবে। নরেনের সঙ্গে যে ওর ভালবাসা ছিল তা তো জানতাম, আমিই ওদের খবর সবচেয়ে বেশি জানতাম, শিখা সবই আমাকে বলতো।"

গজেন লিখতে লিখতে বলে উঠল, "প্রথম কবে ওদের একসঙ্গে কোথায় দেখেছো?"

"কমলাদির অফিসের সমানে ওদের প্রথম কথা বলতে দেখেছি। দেখেই আমার মনে হয়েছিল শিখা এটা ঠিক করছে না। পরে আমি ওকে বারণও করেছিলাম, কিন্তু ও বলল, ওরা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসে।" রেণুবালা শেষের দিকের কথাগুলি আসতে বলল। বোধ হয় লজ্জায়।

আমিই বললাম, "এটা জানার পর তুমি আর ওকে বাধা দেওনি?"

"চেষ্টা করেছিলাম, তাতে ও আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছিল। তারপর একদিন ওকে দেখলাম, আমাদের ছাদে একটা চিঠি পড়তে। আমি ওর পড়া দেখেই বুঝেছিলাম, ওটা নিশ্চয়ই নরেনের চিঠি। কারণ অন্য চিঠি হলে ও নিশ্চয়ই লুকিয়ে ছাদে উঠে পড়তো না। অন্য চিঠি হলে আমাকেও দেখাতো, পড়তে দিত। আমরা একই সঙ্গে জলপাইগুড়িতে ছিলাম। ওর সব চেনা লোক আমার চেনা, আমার লোকও ওর চেনা, তাই লুকানোর কিছু নেই।" রেণুবালা হাঁপাচ্ছে। চুপ করে গেল।

বললাম, "একটু দম নিয়ে নাও।" গজেন লিখে চলেছে। অধ্যক্ষা কমলাদেবীও বসে আছেন। ওর সামনে এত কথা বলতে রেণুবালার যে অস্বস্থি হচ্ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু হোমের নিয়ম অনুযায়ী পুরুষেরা এখানে একা বা দল বেঁধে ঢুকতে পারবে না। হোমের প্রশাসনিক কাউকে সঙ্গে নিয়েই বিশেষ কারণে ঢুকবে। বিশেষ কারণেই আমরা এসেছি। সঙ্গে তাই স্বয়ং অধ্যক্ষা। রেণুবালাকে আমরা অধ্যক্ষার অফিসে ডেকেও জেরা করতে পারতাম। কিন্তু ও অসুস্থ। তাছাড়া আমরা শিখার জিনিসপত্র তল্লাশি করতেও এখানে এসেছি। এক যাত্রায় তাই দু'টো কাজই সেরে নিচ্ছি। মনে মনে ঠিক করলাম, রেণুবালা এখন ওর যা ইচ্ছা বলে যাক। এর পরে ওকে অধ্যক্ষা অফিসে ডেকেই জেরা করব। অধ্যক্ষার আড়ালে, তখন ও আরও খোলাখুলি আমাদের শিখার প্রেম সংক্রান্ত কথাগুলি বলবে। প্রেম সম্পর্কিত ব্যাপারটাই শিখার মৃত্যুর কারণ বলে এখানকার প্রত্যেকের সন্দেহ। কিন্তু আমরা পুলিশ, আমরা সন্দেহের তির একদিকেই নিবদ্ধ করে রাখতে পারিনা। যতক্ষণ না সন্দেহটা

নিশ্চিতভাবে কোনও তীরে এসে গেঁথে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সবদিকের দরজা জানালা খোলা রেখে চলতে আমাদের হবেই।

রেণুবালাকে সময় দিয়ে দম নিতে দিলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, "ওই চিঠিটা যে নরেনের তা কি করে জানলে?"

"শিখা আমার কাছে ধরা পড়তেই ও নিজের থেকে স্বীকার করে নিয়েছিল।" রেণুবালা জানাল।

"পড়েছিলে?" জানতে চাইলাম," হ্যাঁ।" রেণুবালা বলল।

গজেন হঠাৎ জানতে চাইল, "কি লেখা ছিল চিঠিতে?"

"কি আর ওই সব, যা থাকে।"

"কবে নাগাদ এটা ঘটে ছিল? মনে আছে তোমার?" আমি এবার রেণুবালার কাছে জানতে চাইলাম।

"দিন টিন তো ঠিক মনে নেই। তবে বর্ষাকালে। আষাঢ় মাসের শেষ দিকে। সে দিন সকালে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। ছাদটাও ভিজে ছিল। আমরা স্কুল থেকে ফিরে এসে আসার কিছুক্ষণ পরই শিখা ছাদে উঠে গিয়েছিল। মনে হয়, আমাদের ফেরার পথেই নরেন ওকে চিঠিটা দিয়েছিল। আমরা ওটা কেউ দেখতে পাইনি। "রেণুবালা ওর প্রতিক্রিয়া জানাল। গজেন রেণুবালার বয়ান লিখে চলেছে।

"তুমি শিখাকে কিছু বলনি?"

"বলেছিলাম। কিন্তু ও এ ব্যাপারে বড় একগুঁয়ে হয়ে পড়েছিল। তারপর শিখার অনুরোধেই আমি ওকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলাম, আর আমাকেই সেটা নরেনের হাতে দিতে হয়েছিল। ও আমাদের স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল।" রেণুবালা জানাল।

"নরেনের ওই চিঠিগুলি শিখা কোথায় রাখতো, তুমি জানো?" জানতে চাইলাম।

"চিঠিগুলি শিখা ছিঁড়ে পায়খানার প্যানে ফেলে জল ঢেলে দিত। শিখাই আমাকে বলেছিল। ও গুলি ও রাখতো না। কেউ পেলে ও আর এখানে থাকতে পারতো না। তাই—।"

"বুঝেছি, তারপর?"

"তারই মাসখানের পর শিখার একটা চিঠি আমাদের সিঁড়ির সামনে নরেনকে দিতে গিয়ে আমিই কমলাদির হাতে ধরা পড়ে গেলাম। কমলাদি আমাকে আর শিখাকে খুব বকেছিলেন। "রেণুবালা মাথা নামিয়ে বলল। একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে গেল।

অধ্যক্ষা কমলাদেবী বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, সেটা আগষ্ট মাস। তার পরদিন আমরা নরেনকে বরখাস্ত করেছিলাম। ওদের দু'জনকে সাবধান করে ছেঁড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও যে শেষ রক্ষা হল না।"

"নরেনকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকে শিখা মনমরা হয়ে গিয়েছিল। কোনও কাজেই আর মন দিয়ে করতে পারতো না। "রেণুবালা বলল।

"তারপর?" গজেন লেখা শেষ করে জানতে চাইল।

"ওই ঘটনার তিনচার দিন পর শিখা আমাকে বলল, নরেন ওকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। এটা শুনে আমি ওকে বলেছিলাম, 'খবরদার, এটা করবি না। নিজের পায়ে কুড়ুল মারবি না। চাল চুলো হীন একটা লোকের সঙ্গে কোথায় ভেসে যাবি। এখানে নিশ্চিন্তে আছিস, পড়াশুনা শেষ কর, হাতের কাজ শেখ। তারপর যা করার করবি। এত তাড়া কীসের? ও আমার কথা শুনে চুপ করে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, ও আমার কথা মেনে নিয়েছে।" রেণুবালা আবার দম নেওয়ার জন্য থেমে গেল। চোখ দু'টো চিকচিক করছে। গাল বেয়ে ক'ফোঁটা জল গড়িয়ে নীচের দিকে নামলো। মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল। আমরাও ওকে তাড়া দিলাম না। ওকে ওর মনের ব্যাথা নামাতে দিলাম।

এইভাবে মিনিট পাঁচেক চলে যাওয়ার পর গজেনই হঠাৎ অধৈর্য্য হয়ে বলে উঠল, "তারপর?"

আচঁল দিয়ে চোখ মুছে রেণুবালা মুখটা তুলে বলল, "মাস দু'য়েক আগে একদিন শিখাকে ছাদে দেখলাম কার সঙ্গে আমাদের পুবদিকের দেওয়ালের ওপাশের রাস্তায় দাঁড়ানো লোকের সঙ্গে কথা বলছে। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি লোকটা হচ্ছে নরেন। ওকে দেখে আমার খুবই রাগ হয়েছিল। আমি শিখাকে বলেছিলাম, তুই এখনও ওর সঙ্গে কথা বলছিস?" নরেন আমাকে দেখেও কথা থামায়নি। শিখাকে বলল, 'এমনি যেতে যদি না চাস, জোর করে নিয়ে যাব, দেখি কে আটকায়, জানুয়ারী তের তারিখে রেডি থাকিস।' ওর চোখ মুখ দিয়ে রাগ ঝরে পড়ছিল। আমি শিখাকে ছাদ থেকে নামিয়ে এনে বলেছিলাম, 'তুই ওকে পাত্তা দিস কেন?' দরকার হলে তুই কমলাদিকে সব জানা। তুই কিছুতেই ওই লোকটার সঙ্গে পালাতে পারবি না। কেন তুই ওকে বললি পনেরো তারিখে স্কুলের সামনে দেখা করতে? শিখা কেঁদে ফেলল, বলল, 'আমিও যে ওকে ভালবাসি, তোর কথা বুঝতে পারছি, কিন্তু মনে হচ্ছে ওকে ছাড়া আমিও চলতে পারব না। কি যে করি, তুই আর আমায় না বলিস না। তুই আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, তুই আমাকে সাহায্য কর। কথা দে, সাহায্য করবি। ওর কথা শুনে আমারও কেমন হয়ে গেল, বললাম, মন যখন ঠিকই করে ফেলেছিস, ঠিক আছে তোর যা ইচ্ছা তাই কর। আমি আর না করব না। কি করতে হবে বল। শিখা বলল, 'পরে বলব।' রেণুবালা চুপ করে গেল। হয়তো স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে ওর দুঃখ বেড়েই যাচ্ছে।

গজেন লিখছে। অধ্যক্ষা কমলা দেবী একমনে কিছু ভেবে যাচ্ছেন। হয়তো

ভাবছেন, তার অজান্তে মেয়েরা এই ধরণের প্রেম, অবৈধ সম্পর্ক আরও কি কেউ গড়েছে। নজর বাড়াতে হবে। তার এবং প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম রুখতেই হবে। এই রকম পরিণতি সে আর হতে দেবে না। আরও শক্ত হতে হবে। প্রসাশনে কোথায় কোথায় গলদ আছে সেটা খুঁজেও বার করার চেষ্টা করতে হবে। হয়তো তিনি এসব ভাবছেন অথবা ভাবছেন না। আমরা ভাবছি, শিখার খুনের রহস্য ভেদ করতে গিয়ে। কারণ আমাদেরও দেখতে হবে, হোমে কোথায় কোন ছিদ্র রাস্তা দিয়ে চোরা জল ঢুকে হোমের পরিবেশ নষ্ট করছে এবং শিখার মতো নিরীহ মেয়েকে তার কারণ হিসাবে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হচ্ছে। সেই রাস্তা বন্ধ না করতে পারলে আরও শিখার মৃত্যুর তদন্ত করতে হয়তো আমাদের এখানে আসতে হতে পারে। যেটা আমাদের কাম্য হতে পারে না। তাছাড়া, সমাজের অবহেলিত, নিগৃহীত মহিলারাই এখানে থাকে। তাদের নিরাপত্তা দেওয়াটাও সমাজেরই কাজ। সমাজের সেই কাজের সঙ্গে আমাদেরই সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। স্থানীয় থানাকে সব সময়ই এ ব্যাপারে গোপনে নজরদারি রাখতে হবে। এখানকার আবাসিক ও কর্মীদের ভেতর থেকে সোর্স তৈরী করতে হবে। যারা পুলিশকে খবরাখবর দিয়ে সাহায্য করবে। প্রশাসন কি সব সময় সব দিকে নজর দিতে পরে? পারে না। তাই যাদের নিরাপত্তার দরকার তাদেরও সজাগ থাকতে হয়। তারাও পারে প্রয়োজনীয় পুলিশি সাহায্য নিতে, প্রসাশনের অজান্তেও। ঘটনা ঘটার আগেই সেটা নেওয়া প্রয়োজন, ঘটনা ঘটে গেলে তো আর কারও কিছু করার থাকে না। শিখারা আর বেঁচে ফেরে না। তাই শিখারা যাতে না অকালে ঝরে যায় তারই ব্যবস্থা করা আগে দরকার।

রেণুবালা আবার বলতে শুরু করল, "পনেরো তারিখে আমি আমাদের ক্যান্টিনে নরেন ও মোক্তারের সঙ্গে দেখা করলাম।"

"মোক্তার কে?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"এ পাড়াতেই থাকে। নরেনের বন্ধু।" রেণুবালা বলল। "হুঁ, কোথায় থাকে তা জানো?" প্রশ্ন রাখলাম আমি।

"না, তবে আশেপাশেই থাকে। ওই-ই সেদিন ক্যান্টিনে আমাকে বলল, শিখাকে ডেকে দিতে। আমি ভেতরে এসে শিখাকে বললাম যে নরেনরা ক্যান্টিনে ওকে ডাকছে, কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, শিখা ক্যান্টিনে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করল না। ওরা কতক্ষণ ক্যান্টিনে ছিল জানি না।"

রেণুবালা একটু থামল। গনেজকে সময় দিল ওর বয়ানটা লিখে নেওয়ার। আমি ভাবছি, নরেন ছাড়াও মোক্তার বলে এখানে দ্বিতীয় আর একটা পুরুষও ঢুকে পড়েছে। সে স্থানীয় ছেলে, নরেন ওর সাহায্য নিয়েছিল। কিন্তু কীসের বিনিময়ে ও নরেনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেকি শুধু বন্ধুর প্রেম সার্থক পরিণতি

লাভ করুক, তার জন্যই? দেখতে হবে। আগে রেণুবালার বয়ানটা শেষ হোক।

"সতেরো তারিখ সন্ধ্যেবেলা শিখা আমাকে বলল, নরেনের সঙ্গে ওর স্কুল যাওয়ার পথে দেখা হয়েছে। নরেন ওকে বলেছে, রাতের খাওয়ার বেল বাজার সময় শিখা যেন নীচের বাথরুমের সামনে থাকে। নরেন আমাদের তাঁতঘরের ওপাশ থেকে হাততালি দিয়ে জানাবে যে ও এসেছে। তারপর ওরা পালাবে। শিখা আমাকে অনুরোধ করল, আমি যেন ওর সঙ্গে থাকি। কিন্তু আমার ভীষণ ভয় করতে লাগল। সন্ধ্যেবেলা যখন আমাদের রাতের খাবারের বেল বাজল, সবাই নীচে নেমে গেল। শিখা আমাকে 'ওই জানালার' ধারে নিয়ে গল্প করতে লাগল।" রেণুবালা ওদের ডরমেটরির পুবদিকের জানালাটা হাত দিয়ে ইশারা করে দেখাল।

গজেনকে আমরা লেখার সময় দিলাম। অধ্যক্ষা কমলাদেবীর মুখ গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়ে উঠেছে। শিখার কর্মকান্ডে পরোক্ষভাবে রেণুবালাও জড়িত তা পরিষ্কার। সেও অধ্যক্ষার কাছে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

গজেন লেখা শেষ করে রেণুবালাকে বলল, "হ্যাঁ, তারপর বল।"

"শিখা সেদিন নরেনের দেওয়া শাড়ি ও ব্লাউজটা পরেছিল। বেল বাজার পর আমরা দু'জন ছাড়া বাকি সবাই নেমে গিয়েছিল।

আমাদের এখানকার ইনচার্জ ঊষাদি আমাদের বললেন, 'কিরে তোরা খেতে যাবি না?' শিখা বলল, 'আমি যাব না দিদি, আমার একদম খিদে নেই।' ঊষাদি চলে যেতেই আমরা হাততালির আওয়াজ শুনলাম। তার মানে নরেন এসেছে। আমরা দুজনও নীচে নেমে এলাম। আর তখনই দেখলাম নরেন ও মোক্তার উত্তর দিকের বারান্দা দিয়ে বাথরুমের দিকে আসছে। শিখা আমার হাত দুটো চেপে ধরল। আমি ওকে কিছু আর বললাম না। সোজা খাওয়ার ঘরের দিকে চলে গেলাম। খেয়ে দেয়ে আমি ওপরে এসে যথারীতি দেখি শিখা ফেরেনি। তার মানে ও নরেনের সঙ্গে পালিয়েছে। কিন্তু পরদিন সকালে বাথরুমে ওকে মরা দেখে—।" রেণুবালা এবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।"

অধ্যক্ষা কমলাদেবী আমাদের বললেন, "আজ থাক, ওকে আজ ছেড়ে দিন। প্রয়োজন হলে আবার নয় প্রশ্ন করবেন। এমনিতেই আজই ও একটু সুস্থ হলো।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে ম্যাডাম, দরকার হলে আপনাকে আমরা জানাব।" দরকার যে হবে তা আমি জানি। বয়ানের ফাঁকগুলি দেখে সেগুলি বিস্তারিতভাবে জানতে হবে। তাছাড়া অধ্যক্ষার সামনে ও জড়সড় হয়ে ভয়ে ভয়ে কথা যে বলছে তা আমার নজর এড়িয়ে যায়নি। তাই খোলস ছাড়া বয়ান নিতে গেলে ওকে একা জেরা করে করে ঘটনার পরম্পরা বার করতে হবে। গজেনের লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা দু'জন উঠে পড়লাম।

গজেনই আমাকে বলল, চিনু বসু নামে আর এক আবাসিকাকে কিছু প্রশ্ন করা দরকার। কারণ শিখার সঙ্গে রেণুবালা ছাড়া চিনুও ঘনিষ্ঠ ছিল। গজেনের কথামতো কমলাদেবী চিনুকে আমাদের কাছে ডেকে নিয়ে এল অন্য একটা আবাসন থেকে। চিনুও রেণুবালাদেরই বয়সী। একটু বেঁটে, দোহারা, ফর্সা, মুখটা গোলগাল, চোখদুটোয় চিন্তার ছাপ।

গজেন চিনুর বয়ান লিখতে শুরু করল। আমি পাশে বসে আছি বয়ানের মধ্যে গন্ধ খুঁজে চলেছি। নরেন ও মোক্তার ছাড়া অন্য কোনও গন্ধও আছে কি?

চিনু জানাল, শিখার সঙ্গে তার পরিচয় জলপাইগুড়ির হোম থেকে। ওরা দু'জনে একই সঙ্গে সেখানে ছিল। আবার প্রায় একই সঙ্গে কলকাতার হোমে এসেছে। নরেনের সঙ্গে শিখার যে একটা প্রেমপর্ব চলছিল সেটা সেও জানত এবং রেণুবালা যে এই ব্যাপারে ওদের সাহায্য করছে তাও সে জানত।

"আমরা দু'জনে প্রতিদিনই দেখা করতাম, গল্প করতাম। যদিও আমরা এক জায়গায় থাকি না। মানে আলাদা বিল্ডিংয়ে থাকি। যে দিন ও মারা যায় সেদিন বিকেল বেলা ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ও আমাকে বলেছিল সেদিন ডিনারের সময় নরেন ওকে নিতে আসবে। ওর কথা শুনে আমি ভয় পেয়েছিলাম। ওকে বহুদিন ধরে চিনি, সবাই খুবই ভদ্র, আর ও কিনা নরেনের মতো একটা বাজে লোকের সঙ্গে বিয়ে করার জন্য পালাবে। ওর কেন যে, এই রকম ভিমরতি হলো সত্যি বলছি আমি বুঝিনি।" চিনু একটানা বলে থামলো।

"তারপর?" গজেন লিখতে লিখতে জানতে চাইল।

"শিখা আমাকে ওর সঙ্গে থাকতে বলেছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গেই ওর প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলাম।"

"ওকে তো তুমি খুবই ভালবাসতে?" আমি চিনুকে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, ও আমার প্রিয় বন্ধু ছিল। এতদিন একসঙ্গে আছি, দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসতাম।" চিনু পরিষ্কার গলায় বলল।

"ভালই যদি বাসতে, তবে ও যে একটা অন্যায়, এবং তোমার মতে একটা অপছন্দের, গর্হিত এবং জীবন ধ্বংসকারী কাজ করতে যাচ্ছে তাতে বাধা দেওনি কেন? কেন তুমি কমলাদেবী বা অন্য কাউকে নরেনের আগমনের কথা জানিয়ে দিলে না। তাতে নরেনও ধরা পড়ত, শিখাও বাঁচত। "জিজ্ঞাসা করলাম।"

আমার প্রশ্নের সামনে চিনু একটু থতমত খেয়ে গেল। মাথা নীচু করে নিল। মিনিট খানেক চুপ করে রইল।

"কি হলো বল। না কি তুমিও চেয়েছিলে শিখা এ ভাবেই মরুক।" আমি সরাসরি একটা তির ছুঁড়ে দিলাম।

"না—না" চিনু বলে উঠল, ওর চোখেও জল, "এখন দেখছি বললেই ঠিক কাজ করতাম। আসলে ওকে আমি এত ভালবাসতাম যে, ও যদি নরেনের সঙ্গে গিয়ে শান্তি পায়, পাক না, আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল। তার জন্যই আমি চুপ করে ছিলাম। অন্যায় করেছিলাম। ছিঃ আর ও যে এত বোকা ছিল আমি ওর বন্ধু হয়েও বুঝতে পারিনি। নরেনকে যে ও বুঝতেই পারেনি তা আমি বুঝিনি।"

চিনু থেমে যাওয়ার পর আরও দুই একজন কর্মচারীদের সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করে হোম থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

গজেন একটা কাজ করে রেখেছিল। নরেনের কলকাতার ঠিকানাটা সে আগেই নিয়ে রেখেছিল। ব্রাবোন রোড়ে দেনা ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চে কোনও এক হলধর প্রুস্তির কাছে ও থাকে। গজেন ও আমি গাড়ি নিয়ে সে দিকেই রওনা দিলাম, যদিও আমরা জানি নরেনকে ওখানে আমরা কিছুতেই পাব না। তবু একবার ঘাই মেরে দেখতে হবে, সূত্র বার করতে হবে। নরেন যে পালিয়েছে তা আমরা জানি, কিন্তু কোথায়? সেটাই জানার দরকার। শিখার মৃত্যুর কারণ যে নরেন তা হোমের প্রত্যেক সাক্ষীরই মত। সেই মতকে তো গুরুত্ব দিতেই হবে।

দুপুর আড়াইটা নাগাদ আমি আর গজেন ব্রাবোন রোড়ের দেনা ব্যাঙ্কে হলধর প্রুস্তিকে এসে ধরলাম। আমরা পুলিশের লোক শুনে ও প্রথমেই অত্যন্ত ভয় পেয়ে কাঠ হয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে বলতে শুরু করল, "বাবু আমি কি করেছি?"

আমিই বললাম, "এখনও কোনও দোষ করনি, কিন্তু সত্যি কথা না বললে দোষ করবে, তখন কিন্তু আমরা তোমাকে ছাড়বো না।"

"কি কথা বাবু, আমাকে বলেন, আমি সত্যিই কইব।" হলধর বলল।

"নরেন কোথায়?" ধমকে জানতে চাইলাম।

"সে তো বাবু গত সালের ডিসেম্বরের শীতের সময় একবার এসেছিল, দু'তিন দিন ছিল, তারপর আর আসেনি। মেয়েদের হোমের চাকরিটা যাওয়ার পর ও চাকরির খোঁজ করছিল। কেন বাবু ও কি করেছে?" হলধর কাঁপতে কাঁপতে জানতে চাইল।

"সে শুনে তোমার কাজ নেই, সে অনেক কথা, আগে বল ওকে কোথায় পেতে পারি? এখানে তোমার কাছে কখন আসবে? "উল্টো প্রশ্ন করলাম।

"এখানে আর আসবে কি না তা তো আমি জানি না, আর এখন ওকে কোথায় পাবেন তা কি করে বলি বলুন, তবে কলকাতায় ও কোথায় যেতে পারে তার দু' একটা অনুসন্ধান দিতে পারি। আপনারা যাচাই করে দেখেন সেখানে ও আছে কিনা?" হলধর বলল।

"নরেন তোমার কে হয়?"

"ও আমার খুড়তুতো ভাই। আড়াই বছর ধরে এখানে থেকে অনেকগুলি জায়গায় চাকরি করল, কোনওটায় মন বসাতে পারে নাই। শেযে হোমের চাকরিটাও কি কারণে গেল, তারপর আমার এখানে থাকতে থাকতে অনেক চেষ্টা করে যখন কোনও জায়গায় চাকরি পেল না, ও দেশে চলে গেল।"

"তা তোমাদের দেশের ঠিকানাটা বল।"

হলধর উড়িষ্যার জাজপুরের একটা ঠিকানা আমাদের দিল। আমরা লিখে নিলাম। তারপর বললাম, "বল, এখানে ও আর কোথায় থাকতে পারে? এখানে ছাড়া আর কোথায় যেতে পারে সেটাও বলবি।" শক্ত গলায় বললাম।

হলধর জানাল, পাঁচ নম্বর মিশন রো তে দুর্যধন দাস, ওল্ড পোর্ষ্ট অফিস স্ট্রিটে জনার্ধন দাস, দু'নম্বর হ্যারিংটন স্ট্রিটে অনন্ত চরণ দাসের কাছে আমরা খোঁজ করতে পারি। এরা সবাই নরেনের আত্মীয়, কলকাতায় থাকার সময় নরেন প্রায়ই এদের সঙ্গে দেখা করতে যেত। তাছাড়া হলধর জানাল, মেদিনীপুরের পার্বতীপুর গ্রামে এক আইসক্রিম কারখানায় নরেনের বাবা চাকরি করে, নরেন সেখানেও যেতে পারে।

হলধরকে আমরা ছেড়ে দিয়ে ওর দেওয়া কলকাতার ঠিকানাগুলিতে ঢুঁ মারতে শুরু করলাম। না নরেনের কোনও পাত্তাই পেলাম না। প্রত্যেকের কাছে প্রায় একই জবাব। গতবছরের ডিসেম্বরের পর ওকে ওরা কেউ দেখেনি। নরেন কোথায় গেছে তাও সঠিকভাবে কেউ বলতে পারল না। ওর মামা দুর্যধন দাস শুধু বলল, ডিসেম্বরে ওর থেকে নরেন কিছু টাকা ধার নিয়ে গিয়েছিল। ব্যাস, আমরা ফিরে এলাম।

লালবাজারে ফিরে এসে আমি দেবীবাবুকে বিস্তারিত সব জানালাম। তখনও আমাদের গোয়েন্দা দফতরের হাতে শিখা সেনগুপ্তের হত্যার তদন্তের ভার নেওয়া হয়নি। আমরা পার্কস্ট্রিট থানার অফিসারদের তদন্তে শুধু সাহায্য করছি। দেবীবাবু ডি সি নিরুপম সোম সাহেবকে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করলেন। এবং তাঁরই নির্দেশে আমাদের মার্ডার সেকশনের সাবইন্সপেক্টর প্রদ্যুৎ কুমার দাস পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে প্রয়োজনীয় কাজগপত্র নিয়ে নরেনের খোঁজে নরেনের বাবার কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে মেদিনীপুরের দিকে যাত্রা করলেন।

প্রদ্যুৎদা মেদিনীপুরের পার্বতীপুর গ্রামে শান্তি আইসক্রিম কারখানায় নরেনের বাবা সনাতনকে খুঁজে পেলেও নরেনকে না পেয়ে ফিরে এল। তিনি কটক জেলার বাড়ির ঠিকানাটা শুধু নিয়ে এলেন।

কাজ কিছুই হল না। অবশেযে সাতাশে জানুয়ারী শিখার মৃত্যুর তদন্তের ভার

পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে আমাদের গোয়েন্দা দফতরের দায়িত্বে নিয়ে আমার হাতে ভার তুলে দিলেন সোমসাহেব।

আমি নিয়ম অনুযায়ী গজেনের থেকে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কিত কেস ডায়েরি নিয়ে নিলাম, তারপর নতুন করে তদন্ত শুরু করলাম। প্রথমেই আমি হোমে গিয়ে পুরো হোমটা ঘুরে দেখলাম। আমার সঙ্গে কমলাদেবী নিজেই কিছুক্ষণ সঙ্গ দিয়ে বিশেষ কাজে ওর অফিসে চলে গেলেন। আমাকে সহযোগিতা করার জন্য সহ-অধ্যক্ষা রেণু চক্রবর্তীকে বললেন। তিনি আমার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে গজেনকে যা যা তিনি বলেছিলেন তারই পুণঃরাবৃত্তি করে গেলেন। হোমের চারপাশটা দেখার পর আমি ওকে বললাম, "আমি আবাসিকা রেণুবালা সরকারের সঙ্গে আর একবার কথা বলতে চাই, দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন।"

আমি অধ্যক্ষার অফিসে রেণুবালার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম, রেণুবালাকে ক্যান্টিন থেকে ডেকে নিয়ে এলেন রেণুদেবীই। আমি সরাসরি রেণুদেবীকেই বললাম, "আমি আলাদা এর সঙ্গে একটু কথা বলব।"

তিনি কমলাদেবীর কাছে গিয়ে কিছু বললেন, কমলাদেবীই আমাকে আর রেণুবালাকে একটা ঘর দেখিয়ে বলেন, "এই ঘরেই আপনি বসতে পারেন।" রেণুবালাকে নিয়ে আমি ওই ঘরে ঢুকে গেলাম, ক'টা চেয়ার টেবিল, একটা পুরনো টাইপ রাইটার, একটা ফাইল রাখার কাঠের র‍্যাক, একটা পুরনো কাঠেরই 'আলমারি, আলমারির মাথাতেও কিছু অপ্রয়োজনীয় ফাইল। আমি রেণুবালাকে নিয়ে ওই ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে ওকেও একটা চেয়ারে বসতে বললাম।

রেনুবালাকে আজ একটু তরতাজা দেখলাম। ঝড় ঝাপটা দুঃখ অনেকটাই সামলে নিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। মায়া আবেগকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলে তো মানুষ পাগল হয়ে যাবে। সেগুলি নিয়ন্ত্রণে এনে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসাটায় স্বাভাবিক জীবন ধারার মধ্যেই পাড়ে। রেনুবালা আবার কাজের মধ্যে ফিরে এসেছে। কমলাদেবীর কাছ থেকে শুনেছি সে আবার স্কুলে যেতে শুরু করেছে। সেলাই শিখতে যাচ্ছে, ক্যান্টিনেও কাজ করছে, অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা গল্পগুজব করছে। অর্থাৎ এখন আমি ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলে আর আগের মতো আবেগে ভেসে আসল জায়গা থেকে সরে যাবে না। তাছাড়া কমলাদেবীর সামনে যে সব কথা বলতে সেদিন ইতস্তত করেছিল, আজ আমি ওকে অন্যত্র বসিয়ে তাকে খোলাখুলি কথা বলার স্টেজ সাজিয়ে দিয়েছি। রেনুবালার কাছ থেকে শিখার গোপন কথা গুলি জানতে পারবো। নরেন শিখাকে কেন হত্যা করতে গেল বা নরেন যে প্রকৃতই হত্যাকারী সেটাও ওরা সন্দেহ করছে সে বিষয়েও ওর ধারনাগুলি সম্পর্কে মতামত জানতে পারবো।

রেনুবালাকে আমি সোজাসুজি বললাম "দেখো, আমি সেদিনও বলেছি, আজও বলছি তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি নির্ভয়ে সব কথা বলতে পার, আর আজ কমলাদেবীও তোমার সামনে নেই, কথা গোপন করার বা লজ্জা পাওয়ারও নেই। তোমার কথার মধ্যেই শিখার হত্যার আসামীদের শাস্তি নির্ভর করছে। তু মি নিশ্চয়ই চাও শিখার হত্যাকারীদের শাস্তি হোক।"

রেনুবালা আমার অভয়বানী শুনে পরিষ্কার ভাবে বলল, "হ্যাঁ চাই, নরেনরাই ওকে খুন করেছে। আমি নিশ্চিত।"

"তুমি নিশ্চিত, সেটা ভাল কথা, কিন্তু প্রমাণ করতে গেলে কোর্টে আমাদের সেই সব প্রমাণ দাখিল করতে হয়। তাই তু মি এ সম্পর্কে যা জানো পরিষ্কার করে বল, কোনও কথা আড়াল করে রাখবে না। তাহলে নরেনের সুবিধা হবে, আমাদের নয় বুঝেছ?"

রেনুবালা মাথা নেড়ে জানাল যে সে আমার কথা বুঝেছে। তারপর কোনও রকম ভূমিকা ছাড়াই বলল, "শিখার সঙ্গে নরেনের মাখামাখির কথাটা আমি প্রথম জানতে পারি গতবছর জুলাই মাসের প্রথম দিকে। একদিন বিকেলে আমি এমনিই আমাদের বিল্ডিংয়ে ছাদে গিয়েছিলাম। দেখলাম, শিখা একটা চিঠি পড়ছে, ও সেখানে একাই ছিল। আমাকে দেখেই শিখা চিঠিটা ওর ব্লাউজের ভেতর লুকিয়ে ফেলল। আমি ওকে বললাম কার চিঠি আমাকে দেখা, নয়তো আমি কমলাদিকে সব বলে দেব, তখন শিখা ভয় পেয়ে বুক থেকে চিঠিটা বার করে আমাকে দেখায়। চিঠিটা নরেনের। চিঠিতে ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেছে ও শিখাকে বিয়ে করতে চায়। এভাবেই চলতে থাকে, আমিও শিখার চিঠি নরেনকে পাচার করেছি। জুলাই মাসের শেষ দিকে নরেন আমার মাধ্যমে শিখাকে একটা কালো রঙের ব্লাউজ ও একটা ব্রেসিয়ার উপহার দিয়েছিল। আমি ক্যান্টিনে কাজ করতাম সেই সুযোগটা নরেন নিয়েছিল।"

"ব্লাউজ আর ব্রেসিয়ার?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"হ্যাঁ" রেনুবালা দৃঢ়ভাবে জানাল।

প্রেমের কোন পর্বে প্রেমিকাকে প্রেমিক অন্তর্বাস উপহার দেয় আমার জানা নেই। আমিও খুচখাচ প্রেম করেছি। বন্ধুবান্ধবদের অনেকের প্রেমপর্বে সাহায্যও করেছি। এখনও করি, কিন্তু এমন অদ্ভুত উপহার দেওয়ার কথা আগে কখনও শুনিনি। তাই একটু অবাকই হয়েছিলাম। তবে নরেনকে তারিফও করতে হয়। ও প্রেমিকাকে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসই উপহার দিয়েছিল। আর এমন দুটো জিনিস তা প্রেমিকার বুকে একেবারে সাপটে থাকবে। নরেনকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারবে না। নরেনের আগে, পৃথিবীর কোনও প্রেমিক প্রেমিকাকে এমন উপহার

পাঠিয়েছিল কি'না তা প্রেমসংক্রান্ত গবেষকরাই বলতে পারবেন। আমি নই। আমি সামান্য এক পুলিশ অফিসার। প্রেমের গভীর থেকে গভীরতর খাদের কতটুকুইবা খবর রাখি। এটাও রাখাতাম না। যদি না প্রেমিকাই খুন হয়ে যেত। আর আশ্চর্য প্রেমিকার দেওয়া ওই দু'টো অর্ন্তবাস গায়ে জড়িয়েই।

"ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার পরদিনই নরেন ক্যান্টিনে এসেছিল এবং শিখাকে ওর সঙ্গে চিরদিনের জন্য চলে যেতে বলেছিল। শিখা তখন ওর সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেছিল। নরেন তখন ওর হাত ধরে টেনে রাস্তায় বার করতে চেয়েছিল। ঠিক সেই সময় আমাদের ক্যান্টিনবয় ধীরেন ওখানে এসে যায়। তখন নরেন শিখার হাত ছেড়ে ক্যাণ্টিন থেকে চলে যায়।" রেনুবালা বলল।

"তখন ক্যান্টিনে অন্য আর কেউ ছিল না? মানে তোমরা কেউ?" আমি রেনুবালার কাছে জানতে চাইলাম।

"না সবাই ভেতরের দিকে ছিলাম। সামনে শুধু শিখাই ছিল। মাঝে মধ্যে এমন হয়ে থাকে।" রেনুবালা জানাল।

" বল এরপর নরেণ আবার কবে কবে এসেছিল। মানে তুমি জানো?" "নিশ্চয়ই এসেছিল, যা আমাকে শিখা জানায়নি, আসলে আমি ওকে প্রায়ই এ ব্যাপারে বারণ করতাম বলে সব কথা ও আমাকে জানাতোও না।"

আমি কোন মন্তব্য করার আগেই রেনুবালা আবার বলতে শুরু করল, "মাস দু'য়েক আগে একদিন দুপুরবেলা এই দু'টো আড়াইটা হবে, আমি ছাদে উঠেছি, শাড়ি আনতে, দেখি শিখা নরেনের সঙ্গে কথা বলছে। নরেন পূর্বদিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে শিখা দেখতে পায়নি। ওদের কথা বলা দেখেই আমি ছাদের জলের ট্যাঙ্কের পিছনে লুকিয়ে পড়েছিলাম। শুনতে পেলাম, নরেন শিখাকে জিজ্ঞেস করছে, গোবিন্দের হাত দিয়ে সে একটা চিঠি শিখাকে পাঠিয়েছিল। সেটা শিখা পেয়েছে কি না। শিখা ওকে বলল 'না, পাইনি'। শিখার কথা শুনে নরেন ওকে বলল 'এখন কেন চিঠি পাবে অন্য লোক নিশ্চয় জুটেছে, আমি বাড়ি যাচ্ছি কয়েকদিন পর ফিরে আসবো তখন তোমাকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে নইলে জোর করে নিয়ে যাবো। দেখি কে আটকায়।' এইভাবে শিখাকে শাসিয়ে নরেন হন হন করে চলে যায়। নরেন চলে যেতে আমি জলের ট্যাঙ্কের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলে শিখা আমাকে দেখে কেঁদে ফেলে। তারপর বলে, দেখ ও আমাকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে চায়, আমি ওকে বলেছি, 'বিয়ে করতে হলে আমার দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে গিয়ে যেন ও কথা বলে সব ব্যবস্থা করে, ওরা বললেই আমি ওকে বিয়ে করব, নয়তো নয়। এতে ও খুব রেগে গিয়েছিল। আমি কি করব বল।'

রেনুবালা সামান্য সময় নিল, আমি বললাম "তারপর নরেন আবার কবে এসেছিল?"

"সেটা তেরই জানুয়ারি, তারিখটা এখনও আমার মনে আছে, শনিবার আমি দুপুরে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েছিলাম। শিখাই আমাকে ঠেলে ঠেলে জাগিয়ে বলল আমার সঙ্গে একটু ছাদে যাবি? আমার একা যেতে ভাল লাগছে না।' আমি বাধ্য হয়েই ওর সঙ্গে গেলাম। নরেন ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। শিখাকে দেখেই বলে উঠল এক্ষুনি বেরিয়ে এস, আমি সব ঠিক করে রেখেছি।' শিখা বলল, 'না, তুমি স্কুলের সামনে দাঁড়াবে তখন কথা বলব।' শিখার উত্তর শুনে নরেন আবার রেগে গিয়ে বলে উঠল,' তোমার আর বের হতে হবে না। আমার যা করার আমি করব। আমাকে ধোকা দেওয়া, ল্যাং মারা বের করব।' হাত পা নেড়ে নরেন চিৎকার চেঁচামেঁচি করতে লাগল। 'আমি শিখাকে নিয়ে নীচে নেমে এলাম।"

রেনুবালা একটু থামল, আমিও কিছু বলছি না। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে আছি।

"মাঝখানে একদিন গেল, শিখা মুখ শুকনো করে সেদিন সব কাজ করল। আমিও ওকে কিছু বলিনি। তার পরদিন সন্ধ্যেবেলা আমি ক্যান্টিনে কাজ করতে করতে চা খাচ্ছিলাম। দেখি নরেন একটা গাট্টাগোট্টা ছেলেকে নিয়ে ক্যান্টিনে ঢুকলো। ওই ছেলেটাকে আমি নরেনের সঙ্গে আগেও দেখেছি। গুণ্ডা মতো। নরেন ক্যান্টিনে ঢুকেই ওই ছেলেটাকে বলল," এই মটকা চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবি? মটকা বলল 'না, স্রেফ চা খাবো' নরেন তখন দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিল তারপর আমার দিকে ফিরে মটকাকে বলল, মটকা, এই হলো শিখার বন্ধু, রেনু।' মটকা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই তুমি গিয়ে শিখাকে একবার খবর দাও যে নরেন আর আমি এসেছি, ও যেন এক্ষুনি আমাদের সঙ্গে এখানে এসে দেখা করে।' আমি খানিকটা ভয় পেয়েই ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে এসে শিখাকে খবরটা দিই। শিখা আমার কথা শুনে ক্যান্টিনের দিকে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু যেতে পারেনি, কারণ কমলাদি মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। কমলাদিকে দেখে শিখা ফিরে এসেছিল। তারপর ওরা কতক্ষণ ক্যান্টিনে ছিল, কি করেছিল জানি না। আমরা আর যাইনি।

"এটাতো পনেরো তারিখের ঘটনা, তাই তো?" আমি সঠিকভাবে জানতে চাইলাম, রেনুবালা সামান্য চিন্তা করেই উত্তর দিল। "হ্যাঁ। তারপরের ঘটনাতো সবটাই জানেন, আগের দিন আমি বলেছিলাম, তারপর সতেরো তারিখ রাতে যা ঘটেছিল, সবই বলেছি।

রেনুবালাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ওর বয়ান থেকে মোটামুটি অনুমান করলে এটা বোঝা যায় নরেনরাই সেই রাতে শিখাকে খুন করেছিল। ওর সঙ্গে মোক্তার

বা মটকা নামের স্থানীয় ছেলেটা ছিল। রেনুবালা তার সাক্ষ্যে সেটাই বারবার বলছে। এই রহস্য উদঘাটন করতে গেলে প্রথমেই গ্রেফতার করতে হবে।

এখন আমি ক্যান্টিন বয় গোবিন্দকে চাই। আমি কমলাদেবীকে সেই অনুরোধ করলে তিনি ক্যান্টিন থেকে গোবিন্দকে ডেকে পাঠালেন। গোবিন্দ হোমের কোয়ার্টারেই থাকে। উনিশ কুড়ি বছরের গোবিন্দ ভীরু ভীরু চোখ মুখ নিয়ে আমার সামনে এসে বসল। সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে আটটা পর্যন্ত গোবিন্দ ক্যান্টিনে থাকে। ও সবাইকেই চেনে, সব খবরও ওর কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

"গোবিন্দ তোর কোনও ভয় নেই। আমি কি জন্য এখানে এসেছি তা তো জানিস, সেই সব সম্পর্কে যা যা জানিস আমাকে বল। একটাও কথা লুকাবি না।"

"লুকবো কেন স্যার, শিখাদিকে আমরাও ভাল বাসতাম। নরেনটা যে এমন কাণ্ড করবে তা তো আমরা কেউ বুঝিনি।" মেদিনীপুর জেলার এগরার ছেলে গোবিন্দ, পুরো 'স-স' টান দিয়ে আমাকে উত্তর দিল। আমি কিছু বলার আগেই ও বলতে লাগল 'শিখাদি মারা যাওয়ার দিন কয়েক আগে নরেন আমাকে বলল বাংলায় একটা চিঠি লিখে দিতে। আমি লিখে দিইনি।"

"কেন ওকী বাংলা লিখতে জানে না?"

"পড়তে পারে, লিখতেও পারে কিন্তু লেখাটা খুব খারাপ।" গোবিন্দ বলল।

"আমি লিখিনি বলে আমার উপর খুব চোটপাট নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। পরে আমি আমার আত্মীয় ধীরেনও এখানে কাজ করে। ওর কাছ থেকে শুনেছি শিখাদিকে নরেন চায়। কিছুদিন আগে নরেন আর মটকা ক্যান্টিনে এসে আমাকে একটা চিঠি দিয়ে বলল ওটা শিখাদিকে দিয়ে দিতে। আমি প্রথমে নিইনি। তারপর মোটকা আমাকে ধমক দিতে আমি রাজি হয়ে যাই। চিঠিটা নিয়েছিলাম কিন্তু ওটা আমি শিখাদিকে দিতে পারিনি। ছিড়ে ফেলেছিলাম, ধীরেনও জানে। তারপর শিখাদি আমাকে ওই চিঠি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। আমি বলে দিয়েছিলাম ওই রকম কোনও চিঠি আমাকে নরেন দেয়নি। তারপর দিন দুই আগে নরেন আর মটকা আবার ক্যান্টিনে এসেছিল। আমার সঙ্গে আর কথা বলেনি। রেনুবালাদির সঙ্গে কথা বলেছিল, ওকে বলেছিল শিখাদিকে ডেকে দিতে। রেনুবালাদি ভেতরে চলে যায়। আর সেদিন ফেরেনি, শিখাদিও ওদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। ওরা চলে যাওয়ার আগে আমাকে নরেন বলে গিয়েছিল, আমি যেন শিখাদিকে বলে দিই ওরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেছে। চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আমাদের ক্যান্টিনের উল্টো দিকে রামদার চায়ের দোকানে নরেন, মটকা, বান্দের, বেচু ও গোরাকে আড্ডা দিতে দেখেছি।"

"তুইতো এখানকার, এ পাড়ার অনেককে চিনিস, ওরা তোদের ক্যাণ্টিনে চা-টা খেতে আসে। মটকারা কোথায় থাকে, কী করে, জানিস?"

"ওরা তো সব মাস্তান, কী করে জানি না, তবে মটকা বেডফোর্ড লেনে থাকে, এটুকু জানি, বাড়িটা চিনি না, ওখানে সবাই ওকে চেনে।"

"হুঁ, ঠিক আছে, তুই যা, আমি আবার পরে আসব। তোর কোনও ভয় নেই।" গোবিন্দকে ছেড়ে দিয়ে আমিও উঠে পড়লাম। কমলাদেবীর থেকে বিদায় নিয়ে লালবাজেরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

নরেন, মটকা, গোরাদের ধরতে হবে। তারই পরিকল্পনা করা চাই। নরেনের খোঁজে উড়িষ্যা যেতে হবে।

উনত্রিশে জানুয়ারী আমাদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক হলো আমি কলকাতাতেই থাকবো, আমাদের দফতরের সাব ইন্সেপেক্টর বিধূভূষণ দত্ত কটকের উদ্দেশ্যে পরদিনই যাত্রা করবেন।

কটকের বীরজানহাপুরের সুন্দরপুর গ্রামে নরেনের আদি বাড়ি। বিধূবাবু সেখানেই প্রথম যাবেন। তারপর অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। আমি কলকাতায় মটকা, গোরাদের ধরার চেষ্টা করব। আমি বেডফোর্ড লেন, রিপন লেনে আমার সোর্সদের মটকাদের খবর নিতে বলে দিলাম।

তিরিশ তারিখ সন্ধ্যেবেলা বিধূবাবু রওনা দিলেন। ওর সঙ্গে গেল কনস্টেবল নিজামুদ্দিন খান। বিধূবাবু একত্রিশ তারিখ ভোরবেলা জাজপুর কেওনঝড় রোড স্টেশনে পৌঁছে প্রথমেই গেলেন জাজপুর পুলিশ স্টেশনে। সেখানে গিয়ে শুনলেন জাজপুর রোড অঞ্চলটা কোরাই থানার অন্তর্গত। বিধূবাবু ও কনস্টবল নিজামুদ্দিন খান সকাল আটটার মধ্যেই পৌঁছে গেলেন কোরাই থানাতে। থানাতে গিয়ে শুনলেন ও. সি. মিঃ কে. সি. মহান্তি জাজপুর রোডের আউট পোষ্টে গিয়েছেন, ওর সঙ্গে দেখা করতে হলে ওখানেই যেতে হবে। বিধুবাবুরা একটা রিক্সায় চড়ে আউট পোস্টের দিকে রওনা দিলেন।

ন'টা নাগাদ আউট পোস্টে পৌঁছে ও সি মিঃ মহান্তিকে বিধুবাবু পেয়ে গেলেন। বিধূবাবু মিঃ মহান্তিকে সঙ্গের কাগজপত্র দেখিয়ে তাঁর সেখানে আসার উদ্দেশ্য জানাতে মহান্তিবাবু বিধূবাবুদের নিয়ে নরেনকে খুঁজতে জাজপুর রোডের অনেকগুলি জায়গায় গোপনে খবর নিতে গেলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম রেলওয়ের ডাওলিং ভবনে মিঃ এন সি বারিকের কাছে ওরা খোঁজ পেলেন নরেন সম্ভবত জাজপুরের ফেরোক্রোম প্রজেক্টে শ্রমিকের কাজ করছে।

মিঃ মহান্তি ওর গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন ফেরোক্রোম প্রজেক্টের দিকে। সাড়ে এগারোটা

নাগাদ ওরা প্রজেক্ট অফিসে পৌঁছে গেলেন। ওখানে ওভারসিয়ার মিঃ প্রথম নাথ মন্ডল বর্ধমানের জামালপুরের লোক, বাঙালী। বিধুবাবুদের আগমনের হেতু এক মিনিটেই বুঝে গেলেন। তিনি ওর অধীনে কর্মরত কুলি সরকার গজেন্দ্র নায়েককে ডাকলেন এবং তিনিই গজেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেন নরেন নামে কোনও শ্রমিক ওর অধীনে কাজ করছে কিনা। গজেন্দ্র নায়েক ইতিবাচক উত্তর দিতে নরেনকে ওরা ডেকে নিয়ে এলেন। বিধুবাবু নরেন প্রুস্তিকে গ্রেফতার করলেন। কিন্তু শুধু মুখে মুখে গ্রেফতার করে তো একজন লোককে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে নিয়ে আসা যায় না। তারজন্য চাই আদালতের প্রয়োজনীয় নির্দেশ। বিধুবাবু প্রমথবাবু ও গজেন্দ্রের থেকে এবং শ্রমিকদের মাহিনার ও হাজিরার কাগজ থেকে দেখলেন, নরেন দশই জানুয়ারি থেকে বিশে জানুয়ারি পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত ছিল। আর শিখা খুন হয় সতেরোই জানুয়ারি রাতে। অর্থাৎ নরেন আঠারো তারিখ কিংবা উনিশ তারিখ কলকাতা ত্যাগ করে কুড়ি তারিখ ছুটি কাটিয়ে একুশ তারিখ ফেরোক্রোম প্রজেক্টের কাজে পুনরায় যোগ দিয়েছে।

কিন্তু উচ্চপদস্থ কোনও অফিসার তখন উপস্থিত না থাকায় বিধুবাবু ওই মাস্টার রোল এবং পে রোল আটক করতে পারলেন না। বাধ্য হয়েই ওরা নরেনকে নিয়ে জাজপুর রোডের পুলিশের আউটপোস্টে ফিরে আসলেন। নরেনকে আউটপোস্টের গরাদেই পুরে দিলেন।

পরদিন সকালে বিধুবাবু আবার ফেরোক্রোম প্রজেক্টে গিয়ে ওখানকার জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে মাস্টার রোল নিয়ে জাজপুরের এস ডি ও আদালতে নরেনকে নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং আদালতের নির্দেশ পেয়ে গেলেন যে ওরা শিখার হত্যার আসামি নরেন প্রুস্তিকে নিয়ে কলকাতায় যেতে পারবেন।

নরেনকে গ্রেফতার করেই বিধুবাবু আমাদের ডি সি ডি.ডি.কে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলেন। তারপর এক তারিখ রাতেই তিনি জাজপুর কেওনঝড় রোড স্টেশন থেকে নরেনকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চেপে বসলেন। দু-তারিখ সকালে বিধুবাবু ও নিজামুদ্দিন নরেনকে লালবাজারে হাজির করলেন।

বের্ডফোড লেন ও রিপণ লেনে আমার সোর্সেরা আমাকে খবর এনে দিয়েছিল যে, মটকা রিপন লেনে একটা চোলাই মদের ঠেক চালায়। ত্রিশ, একত্রিশ বয়সী মটকার আসল নাম আনোয়ার হোসেন, থাকে এক নম্বর বের্ডফোর্ড লেনে, ওখানে ওর ছেলে আকবর ও স্ত্রীও থাকে। ওরা আরও জানাল গোরার আসল নাম আব্দুল আজিজ, ওর ঠিকানাও বের্ডফোর্ড লেন, তবে এক নম্বর নয়, বারো নম্বর, আর বান্দা ও বেচু রিপণ লেনের ফুটপাথে থাকে। ওরা গৃহহারা। কি করে কেউ জানে না।

আজিজ মটকার সহকারী। মদের ঠেকেই সারাদিন কাটায়। ঘটনার পরদিন থেকে কাউকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে না।

নজরদারি বাড়িয়ে দিলাম। কোথায় যাবে? মদের ঠেক বন্ধ। টাকার যোগান কে দেবে। টাকায় টান পড়লেই ফিরে আসবে। রিপণ লেন ছাড়াও ওয়েলেসলি স্ট্রিটেও আর একটা চোলাই মদের ঠেক আছে মটকার। সেটাও বন্ধ। নজরদাররা খবর আনল। ওয়েলেসলি স্ট্রিটের এক যৌনকর্মীর সঙ্গে মটকার প্রচন্ড অন্তরঙ্গ আছে। সেখানেও আসছে না। তবে কোথায় যেতে পারে? সেই খবরটা কি ওই যৌনকর্মীটা জানে, বলতে পারবে?

মটকা, গোরারা অতি নীচু স্তরের সমাজবিরোধী। পাকা, ধূর্ত, ক্ষুর ধার বুদ্ধিসম্পন্ন, বহু যোগাযোগ সম্পর্কিত সমাজ বিরোধী নয়। এরা খুন করার মতো বড় অপরাধ হঠাৎ করে ফেলে। বহু চিন্তা, বহু দিন ধরে ষড়যন্ত্র করে এরা কাউকে হত্যা করার মতো পরিকল্পনা করতেই পারে না। এত ধৈর্য্য এদের নেই। তাই এদের ধরতে গেলে সামান্য ধৈর্য্য ধরলে আপনিই জালে এসে ধরা পড়ে। দু-চারদিন কিংবা খুব জোর দশ পনেরো দিন অন্য কোনও চোলাই মদের ঠেকে বা ওই মদের বড় কারবারী বা মহাজনের আস্তানায় এদের লুকানোর জায়গা হতে পারে। তার বেশি নয়। তারপর বাধ্য হয়েই এরা নিজের ঝাঁকে ফিরে আসে। খবর না নিয়ে ঘাই মারলেই এরা সাবধান হয়ে যায়। এদের অন্দরমহলের খবর রাখাটাই আসল কৌশল; এবং এদের অন্দরমহলে অনায়াসেই ঢোকা যায়। চোলাই মদের কারবারি, চোলাই মদের সঙ্গে যাদের দৈনন্দিন সম্পর্ক তাদের দু'চারজনকে সোর্স হিসাবে লাগিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যায়। ওই সব ঠেকে মদ খাওয়ার পর বড় বড় কথাবার্তা হয়। কেউ হাতে বাঘ মারে কেউ বা এক থাপ্পড়েই সিংহ মারে। এই বাঘ সিংহ মারার সময়ই অনেক খবর খসে পড়ে, যেটা টুক করে তুলে নেয় পাকা সোর্সেরা। ওটাই আমাদের অনেক কাজ দেয়।

পার্কস্ট্রিট থানা থেকে আমরা শিখা হত্যার মামলা হাতে নেওয়ার তিনদিনের মধ্যে আমরা ওই মামলার এক নম্বর আসামি নরেনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি। ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই অনেক জানতে পারব। তারপর এগিয়ে যাব।

বিধুবাবু দু'তারিখ সকাল ন'টার মধ্যে-ই নরেনকে লালবাজারে হাজির করে বাড়ি চলে গেলেন। আমি তখনও অফিসে যাইনি। আমি অফিসে যাওয়ার আগেই ইলিয়ট রোডের হোমে চলে গিয়ে বাকি কয়েকজনের জবানবন্দী নিয়ে নিলাম। অফিসে ফিরতে ফিরতে বিধুবাবু ও অন্য অফিসার নরেনকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করিয়ে নিয়ে এসেছেন।

আমি লালবাজারে ফিরে নরেনকে দেখলাম। বিধুবাবুই বললেন, "ও স্বীকার

করেছে।” অতি সাধারণ দেখতে, কালো দোহারা চেহারার নরেন ইতিমধ্যেই অনেকটা ধসে গিয়েছে। ওকে আরও ধসাতে হবে।

আমি তাই গলা চড়িয়ে বললাম, “শালা স্বীকার করলেই হবে? একটা উনিশ কুড়ি বছরের মেয়েকে খুন করে পালানো হয়েছিল? তোকে আমিই খুন করে দেবো।” কথা বলতে বলতে নরেনের চুলের মুঠি ধরে নাড়িয়ে দিলাম।

নরেন ভয়ে কুঁকড়ে যেতেই বলে উঠলাম, “এই শালা বল, কেন মেরেছিলি? একটা কথা উল্টোপাল্টা বললে আমি তোর পেট গেলে দেবো।” আমি বিধূবাবুকে বললাম, “আপনি ওর স্টেটমেন্টটা লিখে নিন, একটাও ভুল বললে আমাকে বলবেন।”

বিধূবাবু নরেনের বয়ান লিখতে বসে গেলেন। এটা আমাদের একটা চাল, নরমে-গরমে। বিধূবাবু নরম প্রকৃতির ভাল মানুষ, কিন্তু বুদ্ধিমান। কোথায় কোথায় সময়মত ছ্যাঁকা দিতে হবে খুব ভালভাবেই জানেন। আমার চেয়ে বয়সেও বেশি। অভিজ্ঞতাও বেশি। আমি পাশের ঘরে দীপকদের সঙ্গে আড্ডা দিতে চলে গেলাম। আমি জানি ঠিক কোন সময়ে এসে আবার নরেনকে চমকে দিতে হবে। নরেন প্রথমে ওর বাবা-মা-পরিবার রোজগারের কথা চাকরির কথা ইত্যাদি বলবে। বয়ান ওইভাবেই শুরু হবে। খুনের ঘটনা আসতে আসতে আধ ঘণ্টা পার হয়ে যাবে।

মিনিট কুড়ি পরেই আমি বিধূবাবু যেখানে বসেছিলেন সেই ঘরে, ফিরে গেলাম। ততক্ষণে নরেন তার পরিচিত, কোথায় কোথায় চাকরি করেছে, কিভাবে সে ওই হোমে ষাট টাকা মাস মাহিনায় চাকরি পেল, তার পুরো বিবরণ দেওয়া হয়ে গেছে।

ওইখানে পিয়নের চাকরি পাওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই ওর সঙ্গে শিখার আলাপ ও ক্রমে ঘনিষ্ঠতা ও প্রেম। নরেনের এই পর্বের বয়ানের দৃশ্যে আমি ওদের মাঝখানে গিয়ে বসলাম। আমাকে দেখেই নরেন সামান্য কুঁচকে গেল। আমি বলে উঠলাম, “থামলি কেন, বলে যা। শালা তোর প্রেম পর্বের কাহিনী শুনি।”

বিধূবাবু বলে উঠলেন, “বলে যা নরেন, শুনেছি তোরা চিঠিপত্র লেখালেখি করতিস। সত্যি কি না?”

“হ্যাঁ স্যার, ও আমাকে চিঠি দিত, আমিও ওকে চিঠি দিতাম, মাঝখানে আর একটা ওর বন্ধু ছিল, রেণুবালা সরকার, ওর হাতে চিঠি দিয়ে দিলে ও শিখাকে দিয়ে দিত। শিখাও ওর হাত দিয়ে আমাকে পাঠাত।” নরেন জানাল। ও মাথা নিচু করে বসে আছে। বিধূবাবু ওর বয়ানটা লেখা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। বিধূবাবু লেখা শেষ করতেই আমি নরেনকে ধমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম। “শুধু চিঠিতেই থেমে ছিলি?”

“না স্যার ওকে বলেছিলাম, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই, কিন্তু বিয়ের কথা

বলতেই ও আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইতো, ছুতো নাতা দেখাতো, দিদি জামাইবাবু দেখাতো।" নরেন বেশ নির্বিঘ্নে বলে গেল।

"আর কিছু করিসনি? সত্যি কথা বল। সত্যি না বললে তোকে আমি চিবিয়ে খাব।" গর্জন করলাম।

নরেন ভয়ে ওর হাত দু'টো নিয়ে দু'হাঁটুর ফাঁকে ঢুকিয়ে মাথা নীচু করে নিল। "কি হলো বল। চুপ করে থাকবি না, আমি সব জানি, তবু তোর মুখ থেকে শুনতে চাইছি।" সমানতালে গর্জন করলাম।

নরেন মাথা নাড়িয়ে জানাল, "করেছি।"

"কতদিন ক'বার, কোথায় কোথায় সব বল।"

নরেন লজ্জা লজ্জা ভাব করে বিধুবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "মাত্র তিনবার।" বলেই মাথা নামিয়ে নিল।

"শালা একটা ভদ্রলোকের বাড়ির কুমারী মেয়ের সর্বনাশ করেছিস, তারপর খুন করেছিস, তারপরও বলছিস মাত্র তিনবার। সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তো তোর ডিউটি থাকতো, তারমধ্যে কোথায় করেছিস? ওই হোমের ভিতরেই, না কি বাইরে?" জানতে চাইলাম।

"বাইরে নয়, বাইরে বলতে তো ও একবার শুধু স্কুলে যেত, হোমেই করেছি।" নরেন এবার খোলখুলি বলে ফেলল। হোমেই? মনে মনে ভাবলাম, কৃতিত্ব আছে। হোমের সব কোনা, গুজি এ ক'দিন ঘুরে সবটাই দেখা হয়ে গেছে, এর মধ্যে, এত জোড়া জোড়া চোখের মধ্যে দিনের বেলা, ওরা কোথায় শরীরে শরীরে মিলল? প্রকৃতির অদ্ভুত লীলা, খেলা মিলনের ইচ্ছা থাকলে নরনারীকে ঠিক মিলিয়ে দেয়, প্রবলতর ইচ্ছাটাই বোধহয় আসল।

নরেনই যে প্রবলতর ইচ্ছাটা জাগিয়েছে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। আর একটা মা-বাবাহীন, ছোটবেলা থেকে স্নেহ ভালবাসা বঞ্চিত সদ্য যৌবনা কুমারী মেয়ে নরেনের প্ররোচনায়, ওর ফাঁদে পা দিয়ে শেষ পর্যন্ত খুন হয়ে গেল। মেয়েদের শিখার মতো আঠারো উনিশ বছর বয়সটাই মারাত্মক। তখন শরীরে যৌবনের যে উন্মাদ উত্তেজনা আসে সেটা ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণ রাখাটাই কষ্টকর। নরেনের উস্কানিতে শিখার নিজের নিয়ন্ত্রণের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল।

বললাম, "হোমেই, হোমের কোথায়?"

নরেন ধমক খেয়ে মিনমিনিয়ে বলল, "প্রথমবার অফিস ঘরেই, ছুটির পর। সবাই চলে গিয়েছিল। ওকে আমি আসতে বলেছিলাম।"

"ও তোর কথায় রাজি হয়ে গেল।" জানতে চাইলাম।

"না-না, ওকে দেখে আমি ক্ষেপে গিয়েছিলাম। তারপর প্রায় জোর করেই।" নরেন থেমে থেমে কেটে কেটে কথাগুলি বলল।

ওর কথা শুনে আমার রাগ উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছিল। বিধুবাবুও যে রেগে যাচ্ছে, তা আমি জানি। কিন্তু তিনি নিজেকে শান্ত রেখে ওর বয়ান লিখে যাচ্ছিলেন।

"দ্বিতীয়বার কোথায় করলি?" নরেনের দুঃসাহসিক অভিযানের পরবর্তী ধাপটা জানতে চাইলাম।

"দ্বিতীয়বার সিঁড়ির তলায়।"

"কোন সিঁড়ির তলায়? সিঁড়িতো অনেকগুলো।"

"অফিসেরই সিঁড়ির তলায়। আর তারপর, শেষবার, ওই সিঁড়ির পাশেই যে ঘরটা আছে, সেখানে। এরপর ও আর রাজি হয়নি। তার কিছু দিন পরই কমলাদিদিমণির হাতে আমি ধরা পড়ে ছাঁটাই হয়ে গেলাম।" নরেন মুখ নামিয়ে নিল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এখনও বোধহয় ওর প্রেমপর্বের মায়া ত্যাগ করতে পারছে না।

"ছাঁটাই হয়েছিলি তো আগষ্ট মাসে?"

"হ্যাঁ। ছাঁটাই হলেও আমি প্রতিদিনই একবার হোমের কাছে যেতাম। আমি বেডফোর্ড লেনে দাঁড়াতাম। শিখা ওদের ছাদে দাঁড়াত। এই সময়ে মটকার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। ওতো রিপন লেনে চোলাইয়ের ব্যবসা করত। ওর সঙ্গেই গোরা, বেচু, বান্দার থাকত, ওরা ওর মদের ব্যবসায় কাজ করত। ওরাও আমার বন্ধু হয়ে গেল।" নরেনের অনায়াস স্বীকারোক্তি।

"রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিখাকে কি বলতিস?"

"ওকে আমার সঙ্গে আমার গ্রামে পালিয়ে যেতে বলতাম। কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হত না। সে সময় বেডফোর্ড লেনেই একেবারে রাস্তার ধারে মটকার বন্ধু ভোলার দাওয়ায় আমরা সবাই মিলে তাস খেলতাম। কিন্তু ক'দিন এমন চলার পর, আমার পয়সা ফুরিয়ে আসছিল। আমি দেশের গ্রামে চলে গেলাম। কিন্তু শিখার জন্য আমার মন পাগল হয়ে গিয়েছিল। আমি কাজ যোগাড় করতে জাজপুর রোডে গিয়ে ওখানকার প্রজেক্টে কুলির কাজ পেয়ে গেলাম। ওখানেও দু'টাকা রোজ। মাসে ষাট টাকা। নভেম্বরে জাজপুর রোড থেকে দু'দিনের জন্য কলকাতায় এসে শিখাকে বলেছিলাম আমার সঙ্গে জাজপুরে যেতে। এবারেও রাজি না হওয়াতে আমি ওকে বলেছিলাম, 'পরের বার ঠিক নিয়ে যাব।' ও তখন আমাকে কথা দিয়েছিল, ভেবে দেখবে। কিন্তু কথা রাখেনি।"

কি সাধুর মত কথাবার্তা নরেন বলে যাচ্ছে। যেন দেবদাস। ওর প্রেম কাহিনী শুনতে আমাদের একটুও ভাল লাগছে না। কিন্তু বাধ্য হয়েই মামলা সাজানোর

খাতিরে শুনতে হচ্ছে। কোনটা কোনটা লেগে যাবে, প্রতিটা পয়েন্ট আমাদের গুছিয়ে নিতে হয়।

বিধুবাবু বললেন, "বলে যা নরেন।"

"সেবার খুব আনন্দে জাজপুরে ফিরে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, পরের বার কলকাতায় গিয়ে শিখাকে ঠিক নিয়ে আসতে পারব জাজপুরে। ওকে বিয়ে করব। আমি খুব মন দিয়ে কাজ করছিলাম, ঘর খুঁজছিলাম। মেয়ে ছেলে নিয়ে তো কুলি লাইনে থাকা যায় না। কাজ করলেও মন সব সময় কলকাতায় শিখার জন্য পড়ে থাকত। শেষ পর্যন্ত দশই জানুয়ারি কলকাতা আসার জন্য ট্রেন ধরলাম। শিখার কথা চিন্তা করতে করতেই পরদিন কলকাতা এসে পৌঁছলাম। সোজা মোটকার কাছে গেলাম। রিপন লেনে সন্ধ্যেবেলা ও তখন চোলাই মদ বিক্রি করছিল। মোটকাই আমাকে রিপন লেনের ফুটপাতে ইসমাইল নামে আর একটা লোকের সঙ্গে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। ওখানেই আমি ছ'সাতদিন ছিলাম।"

ইসমাইল। এই লোকটাকে পেতে হবে। ভাল সাক্ষী। খুনের সময় নরেনের আশ্রয়দাতা। জিজ্ঞেস করলাম, "ওই ইসমাইল লোকটা এখনও ওখানেই থাকে তো?"

"হ্যাঁ, যাবে কোথায়, শীতকালে রাতে কাঠ জোগাড় করে এনে জ্বালিয়ে দেয়। কথাগুলি বেশ গরম হয়ে যায়।" নরেন নির্বিকার চিত্তে বলল।

"তারপর বলে যা।"

"সেবার এসে আমি আর কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করিনি। মটকাকে বললাম। এবার শিখাকে নিয়ে যাবই যাব।' মটকা বলল, 'নিয়ে যা, যেভাবে হোক, নিজে থেকে যেতে না চাইলে জোর করে নিয়ে যাবি, আমি তো আছি, কি করে না যায় দেখে নেব। তুই ওকে ছাড়া যখন থাকতেই পারবি না বলছিস তখন না নিয়ে যাবি কেন?' পরের তিন চার দিন আমি অল্প সময়ের জন্য কথা বলতে পারলাম। তারপর পনেরো, ষোল আর সতেরো তারিখে এলিয়ট রোড ও সার্কুলার রোডের মোড়ে ওর স্কুল যাওয়ার সময় দেখা করলাম। ওখান থেকেই শিখারা বাস ধরে স্কুল যেত।"

"তোদের কথা অন্যেরা শুনত না?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"না, আমরা খুব আস্তে কথা বলতাম। তবে আমাদের মধ্যে যে প্রেম ছিল সেটা সবাই জানত।" নরেন বলল।

"তোকে তো চিনত সবাই, তুই যে পিয়নের চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছিলি, কেন হয়েছিলি তাও তো সবাই জানত, কেউ এ ব্যাপারে কমলাদেবী বা অন্য কাউকে অভিযোগ জানায় নি?"

"না, জানালে বিপদ হতে পারত। সেই ভয়েই কেউ কিছু বলত না। ওদের স্কুল যেতে হবে না?" নরেনের পরিষ্কার কথা।

"তার মানে ওদের ওপর তুই মস্তানিও করতিস, ভয়ও দেখাতিস?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"ভয় দেখাতে হয়নি, নিজেরাই ভয় পেত। বেশিরভাগই তো অনাথ, অনাথ না হলে কেউ হোমে থাকে?" নরেনের উত্তর।

নিরীহ মেয়েদের যে নরেন ও মোটকারা ভয় দেখাত, চোখ রাঙাতো, সেটা বুঝতেই পারছি। রাগ বাড়তেই লাগল।

বিধূবাবু বললেন, "বলে যা নরেন, তারপর কি হল?"

"আমি আর পারছিলাম না, সতেরো তারিখ সকালে শিখাকে বললাম, আজ রাতেই পালাতে হবে। আমি কোনও কথা শুনব না। শিখা আমার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু আমি বললাম, আমি আর দেরি করতে পারব না। তারপর কি ভাবে পালাব সেই কথা বললাম। রাতে সবাই যখন নীচের হলে খেতে যাবে, ও যাবে না। ও তখন নীচের বাথরুমের সামনে আসবে। ওখানে আমি আসব। ও জানতে চাইল, আমি কি করে ওখানে আসব। আমি জানালাম পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে আসব অন্ধকারে, তাঁত ঘরের দিক থেকে। খাওয়ার ঘণ্টা বাজার পর যখন নীচে সবাই চলে যাবে তখন আমি হাততালি দিয়ে ওকে জানাব, আমি এসেছি। তখনই যেন শিখা আসে। ও আমার কথায় রাজি হয়ে চলে গেল।"

বিধূবাবু নরেনের কথাগুলি লিখে চলেছে। আমি পাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছি। মামলা সাজানোর কথা চিন্তা করছি।

বিধূবাবুর লেখা শেষ হলে নরেন আবার বলতে শুরু করল, "শিখা রাজি হতেই আমি খুব খুশী হয়েছিলাম, মটকাকে গিয়ে সব বলতে ও আমাকে সবরকম সাহায্য করবে বলে রাজি হল। তারপর আমরা কিভাবে পাঁচিল টপকাবো, কিভাবে শিখাকে হোম থেকে বের করে আনব, কোথায় যাব সব ঠিক করলাম। ওর সঙ্গে কথা বলে আমি ভোলার বাড়িতে তাস খেলার জন্য চলে গেলাম। ওখানেই প্রায় সারা দিন কাটিয়ে দিলাম। যদিও রাতের কথা ভেবে আমার কিছু ভাল লাগছিল না। তারপর কথা মত সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় আমি রিপণ লেনে মটকার সঙ্গে দেখা করলাম। মটকা আমাকে বেডফোর্ড লেনে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় ও বেচু, গোরা আর বান্দারকে ডেকে নিল। তারপর আমরা বেডফোর্ড লেনে হোমের উত্তরদিকের পাঁচিলের পাশে একটা ল্যাম্পপোস্টের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। মটকা আমাকে পাঁচিল টপকাতে বলল, চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। নেমে এসে বললাম, আমারই যদি

এই অবস্থা হয় শিখা কি করে টপকাবে? মটকা মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক বলেছিস, চল একটা সিঁড়ি নিয়ে আসি।' মটকা আমাকে একটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রির দোকানে নিয়ে চলল, কাছেই দোকান, যাওয়ার আগে মটকা দোকানদারকে ডেকে নিয়ে গেল, ওই মিস্ত্রিকে আমিও চিনি, মটকার কথায় মিস্ত্রি আমাদের ওর সিঁড়িটা দিল। সিঁড়িটা ও দোকানের সামনেই একটা পোস্টে চেন দিয়ে তালা লাগিয়ে রেখেছিল। 'কাজ হয়ে গেলেই সিঁড়িটা ফেরৎ দিয়ে যাব।' আমিই মিস্ত্রিকে বলে সিঁড়িটা নিয়ে আমরা চলে এলাম।"

একদমে নরেন বলে যাচ্ছে। আমিই বললাম "দাঁড়া নরেন, বিধূবাবু লিখে নিক।" নরেন থামল। মিস্ত্রিকেও দরকার। মারাত্মক সাক্ষী। আমি চিন্তা করে নিলাম।

"আমরা আগের জায়গায় ফিরে এলাম। গোরারা ওখানে দাঁড়িয়েই ছিল। ঠিক হল, আমি আর মোটকা পাঁচিল টপকে হোমে ঢুকবো। গোরারা বাইরে পাহারা দেবে। সেই মতো, আমি আর মটকা সিঁড়ি লাগিয়ে পাঁচিলে উঠে সিঁড়িটাও হোমের দিকে পাঁচিল টপকিয়ে নিয়ে গেলাম। যাতে আসার সময় শিখার আর আমাদের কোনও সমস্যা না হয়। ঠিক সেই সময় আমি হোমে রাতের খাওয়ার জন্য যে বেল বাজে সেটা শুনতে পেলাম। ঠিক সময়ই ভেতরে ঢুকেছি। আমরা অন্ধকারে লুকিয়ে রইলাম সিঁড়িটাও অন্ধকারে পাঁচিলের ধারে শুইয়ে দিলাম। যাতে দূর থেকে কেউ না দেখতে পায়। আমি জানি পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই মেয়েরা সবাই নীচে নেমে খেতে যাবে। আর তখনই আমি হাততালি দেব। শিখা জেনে যাবে আমি এসেছি।"

"দাঁড়া।" নরেন থেমে গেল। মিনিট তিনেক সব চুপ। বিধূবাবু লিখে চলেছেন। লেখা শেষ হলে বললেন, "হ্যাঁ বল, তারপর কি করলি।"

"আমি আর মোটকা লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁতঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। রাতে ওখানে কেউ থাকে না, কেউ যায়ও না। ঠিক সময় হাততালি দিলাম।

আমি এর মধ্যেই দেখেছি শিখা তিনতলায় ওদের ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ওর বন্ধু রেণুবালার সঙ্গে কথা বলছে। আমি হাততালি দিতে ও আমাকে হাত দেখিয়ে ইশারা করে দাঁড়াতে বলল।"

নরেন বিধূবাবুকে লেখার সময় দিতে থামল।

মিনিট দুই পর আবার বয়ান দিতে শুরু করল, "আমরা এগিয়ে গেলাম পাম্পরুমের দরজা দিয়ে ঢুকে ওদের বাথরুমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। সন্ধ্যে ছ'টার পর ওদের নীচের বাথরুমে আর কেউ যায় না। আমি জানতাম। ওই বাড়ির বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই দেখলাম রেণুবালা উপর থেকে নেমে এল,

আমাদের বলল, 'শিখা আসছে।' এই কথা বলে ও খেতে ডাইনিং হলের দিকে চলে গেল। ও চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শিখা নেমে আসতেই আমি এগিয়ে গেলাম ওর সঙ্গে কথা বলতে। মোটকা যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছিল সেই কথাটাই ওকে বললাম যে, আমাদের পেছন পেছন চলে এস, পাঁচিল টপকানোর সিঁড়ি এনে রেখেছি, তোমার কোনও অসুবিধা হবে না। শিখা দাঁড়িয়ে রইল ; এগোল না। আমি বললাম, কি হল,' ও বলল, 'না আমি এমনি করে যাব না, তুমি বেহালায় গিয়ে আমার দিদি জামাইবাবুর থেকে পারমিশন নিয়ে এস। ওরা বললে, হোম থেকেও আমাকে ছেড়ে দেবে ; তখন যাব। এইভাবে যাব না।' ওর কথা শুনে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আমি তখন বললাম, 'কি হল, আমরা কি এখানে ইয়ার্কি মারতে এসেছি? তুমি নিজের থেকে না গেলে আমি তোমায় জোর করে নিয়ে যাব।' ঠিক সেই সময় মটকা আমাদের কাছে এগিয়ে আসে।"

বিধুবাবু নরেনকে থামিয়ে দেয়। নরেন মাথা নীচু করে বসে থাকে। হয়ত ওই মুহূর্তের দৃশ্য ভেবে এখন অনুতাপ হচ্ছে। অথবা শিখাকে না পেয়ে দুঃখ হচ্ছে। বা এখন জেল খাটতে হবে ভেবে আফশোয হচ্ছে। কি মনে করছে নরেনই ভাল জানে। আমাদের ঘৃণা হচ্ছে।

বিধুবাবু লেখা শেয করে আবার নরেনকে বলতে বললেন, নরেন শুরু করল," মটকাকে দেখেই শিখা ভয় পেয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গেল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে জাপটে ধরতেই ও চিৎকার করতে লাগল। মটকা ওর শাড়ির আঁচলটা ওর মুখে গুজে দিল। শিখা আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর জন্য ছটফট করতে লাগল। আমি ওকে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে গেলাম। ও আরও জোরে হাত পা নাড়তে লাগল। মোটকা ওর হাত দুটো চেপে ধরল। আমি গলা চেপে ধরলাম। ও গোঁঙাতে গোঁঙাতে ছটপট করতে লাগল। আমি আরও জোরে চেপে ধরলাম। ওকে টেনে বারান্দা দিয়ে নিয়ে যেতে চাইলাম। মিনিট তিন চার। দেখলাম ও আর ছটপট করছে না। নেতিয়ে গিয়েছে। মাথাটা আমার গলা ধরা হাতের উপর এসে পড়েছে। মুখ দিয়ে লালা মতো কি পড়ছে।"

আমি বললাম, "শালা, মেয়েটিকে মেরে ফেললি।"

নরেন বলল, "বিশ্বাস করুন স্যার আমি ওকে মারতে যাইনি, কিন্তু দেখলাম, ও মরে গেছে। তখন আমি আর মোটকা কি করি, ওকে নীচে নামিয়ে দিলাম। টানতে টানতে একটা বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর দরজা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি পাঁচিল টপকে সিঁড়ি নিয়ে পালিয়ে এলাম। কারণ আর একটু দেরি হলেই অন্য মেয়েরা খাওয়া শেষ করে ওখানে এসে যেত। আমরা ধরা পড়ে যেতাম।"

"ধরা কি তুই এখন পড়িসনি? মোটকাদেরও ধরব।"

আমার কথা শুনে নরেন আবার মাথা নীচু করল। আমি বললাম, "মাথা নীচু করে এখন ন্যাকামি করছিস। একটা অল্পবয়সী মেয়েকে খুন করতে হাত কাঁপল না, তাকে ভোগ করলি, খুন করলি। এখন ন্যাকামি করছিস। এবার আমাদের খেলা দেখবি। জেল খাটা নরেন আমার কথা শুনে একবার আমার দিকে তাকাল আবার মাথা নীচু করল।

বিধুবাবু লেখা শেষ করে নীরবতা ভেঙ্গে বললেন, "তারপর, বলে যা।"

"তারপর আর কি আমরা ছুটে রিপন লেনে গেলাম। মটকাই আমাকে দেশে চলে যেতে বলল। ওর কথা শুনে আমি সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে গেলাম, কিন্তু সে রাতে আমি কোনও ট্রেন পেলাম না। পরের দিন সকাল এগারোটার ট্রেন ধরে জাজপুর রোডে চলে গেলাম।"

"বা! কী সুন্দর স্বীকারোক্তি। নরেনের প্রেমলীলা শেষ। ও এখন তাড়াতাড়ি শিখাকে ভুলে কর্মস্থলে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করবে। তারপর আর একটা শিখাকে জোগাড় করবে, তাকে ভাগাতে চাইবে বা বিয়ে করবে, ঘর বসাবে, সন্তানাদি উৎপাদন করবে। সংসার করবে, স্বপ্ন দেখবে, আর শিখা হোমের বাথরুমে মরে পড়ে থাকবে। নরেনের সঙ্গে পালাতে না চেয়ে সে অপরাধ করেছে! সেই অপরাধের সাজা হয়েছে মৃত্যু। নরেনের হাতে। তার আর কোনও স্বপ্ন নেই, ঘর বসানোর, সংসার করার, সন্তান মানুষ করার। একজনের প্রবল খামখেয়ালী, প্রবল ইচ্ছার শিকার হয়ে তাকে যেতে হবে লাস কাটা ঘরে। তারপর শ্মশানে, চিতায় জ্বলতে। অন্যজন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে দেখতে জাজপুর রোডের প্রোজেক্টে কাজ করবে।

না! নরেনের সেই স্বপ্ন দেখা আমরা বন্ধ করব। শিখা আর বাঁচবে না ঠিকই, কিন্তু নরেনকেও আমরা ছাড়বো না।

নরেনের বয়ান খুঁজে খুঁজে ঠিক জায়গা মতো খুটিগুলি পোক্ত করে পুতঁতে আরও ভাল ভাল সাক্ষী জোগাড় করতে বেরিয়ে পড়লাম। হোমে গিয়ে জানলাম, শিখার সঙ্গে সকালে মাধবী বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরি পাল, শান্তি সরকার স্কুল যেত এবং এলিয়ট রোড ও সার্কুলার রোডের মোড়ে একই সঙ্গে বাস ধরে ওরা অরবিন্দ বালিকা বিদ্যালয়ে যেত।

আমি মাধবী, গৌরী ও শান্তিকে ডেকে ওদের বয়ানও নিয়ে নিলাম। ওরা বলল, পনেরো, ষোল ও সতেরো তারিখে ওরা তিনজনেই এলিয়ট রোড ও সার্কুলার রোডের মোড়ে নরেনের সঙ্গে শিখাকে কথা বলতে দেখেছে। এরা মামলার ভাল

সাক্ষী হবে। এদের ঠিকমতো সাহস দিতে হবে যাতে আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ভয় পেয়ে ভুল না বলে ফেলে।

পরদিন দুপুরে নরেনকে হোমে নিয়ে এসে যেখান দিয়ে ও আর মোটকা হোমে ঢুকেছিল, যা যা করেছিল তা দেখে নিলাম। হোমের উল্টোদিকে যে চায়ের দোকানে বসে ও আর মোটকা চা খেত সেটা দেখে, সেখান থেকেই সাক্ষীর বয়ান লিখে নিলাম। সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ আমার ব্যক্তিগত নজরদার খবর দিল এক নম্বর বেডফোর্ড লেনের সামনে মটকাকে দেখা গেছে। তার মানে মটকার টাকা ফুরিয়ে গেছে। ও বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছে।

খবর শুনেই আমি জিপ ছোটালাম। আমার জিপে নরেনও আসে। ভালই হয়েছে। দরকার পড়লে ও আমাকে মটকাকে চিনিয়ে দিতে পারবে।

দু'মিনিটের মধ্যে আমরা বেডফোর্ড রোডে এসে ঢুকলাম। নরেনই আমাকে মটকাকে দেখিয়ে দিল। ব্যাস, এক লাফে জিপ থেকে নেমে মটকার হাত চেপে ধরলাম। টেনে নিয়ে এলাম আমার জিপে। নরেনকে আমার জিপে দেখে মটকা একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, বলল, "তুই। তুই এখানে!"

"ওঠ শালা, তোরা ভাবিস তোরা খুন করবি, তারপর আরামে ঘুরে বেড়াবি আর আমরা ঘুমাবো।" চোখ রাঙিয়ে মটকাকে বললাম। আমি জানি, ও একটা ছিঁচকে অপরাধী। পিঠে অল্প কিছু ওজন পড়লেই হড়হড়িয়ে সব উগরে দেবে।

জিপ ছুটিয়ে দিলাম লালবাজারের দিকে। মটকা ওরফে আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে এসে হাজির করলাম আমাদের দফতরে। নরেনকে পাঠিয়ে দিলাম লালবাজারের লকআপে। এবার মটকাকে নিয়ে পড়তে হবে। ওর বয়ান লিখতে হবে।

বয়ান বলার আগে কিছু ওষুধ দিতে হবে, নয়তো কাঁঠাল পাকবে না। তারপর ওর ওপর ওষুধ প্রয়োগ করতেই ও হিন্দিতে বলে উঠল, "হ্যাঁ সার, আমি নরেনের পাল্লায় পড়ে শিখাকে খুন করতে ওকে সাহায্য করেছি, আমি সব কথা বলে দিচ্ছি।"

"বল, কি কি করেছিলি।"

আমরা তদন্ত করে ও নরেনের বয়ান থেকে যা যা শুনেছি, লিখেছি মটকার স্বীকারোক্তি প্রায় একই। ও আর নরেনই যে শিখা হত্যার মূল আসামি তাও সে স্বীকার করল। শুধু এক জায়গায় মোটকা বলল, "শিখাকে যখন নরেন বলল ওর সঙ্গে যেতে শিখা বলল, 'এত রাত্রে গেলে আমাদের দু'জনকেই পুলিশে ধরে ফেলবে, আমি যাব না।' তারপর শিখা বলেছিল ওর বাড়িতে জানিয়ে ওদের ইচ্ছা হলে ও যাবে। শিখা আর কোনও কথা না বলে উপরে উঠতে চাইলে নরেন ওকে পেছন থেকে জাপটে ধরে। আমি মুখ চেপে ধরি। নরেন গলা চেপে ধরে। শিখা মরে গেল। আমরা ওকে বাথরুমে রেখে পালিয়ে আসি।"

বারই ফেব্রুয়ারি দুপুর আড়াইটার সময় আমাদের কনস্টেবল অমল সরকার যাকে বেডফোর্ড লেনে নজরদারিতে রেখেছিলাম, সে জানাল গোরা নামে একটা ছেলে ওখানে ঘুরছে। খবর নিয়ে জেনেছে সে মটকার শাকরেদ ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে মটকাকে জিপে তুলে আর দু'জন কনস্টেবনলকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলাম। নরেন যেমন মটকাকে চিনিয়ে দিয়েছিল, মটকাও গোরাকে চিনিয়ে দেবে। না চিনিয়ে যাবে কোথায়?

আধঘণ্টার মধ্যে আমরা জিপ নিয়ে বেডফোর্ড লেনে পৌঁছে গেলাম। বেডফোর্ড লেনে ঢুকতেই গোরাকে দেখে ফেলে মটকা একটা চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলের দিকে নির্দেশ করে আমাকে হিন্দিতে বলে উঠল, "ওইটা গোরা স্যার।"

দু'নম্বর বেডফোর্ড লেনের সামনে থেকে গোরা ওরফে আবদুল আজিজকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে এলাম। পাঁচজন আসামির মধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করলাম, বাকি দু'জন বাচ্চু ও বান্দার ফুটপাতবাসি। তারা কোথায়, কোন ফুটপাতে চলে গেছে কেউ বলতে পারছে না। এদের মতো আসামিদের নিয়েই হয় সমস্যা। এরা ঠিকানা বিহীন। এদের কোনও মাটির টান নেই, ঘরের টান নেই, মায়া নেই, যেখানে রাত হয় সেখানেই কাত হয়। যে কোনও কাজ এরা জুটিয়ে নিয়ে পেটটা ঠিক চালিয়ে নেয়। এই সব পরিচয়হীন মানুষ কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কোথায় যে হাওয়ার মধ্যে মিশে যায় তার থেকে খুঁজে বার করা খুব কঠিন। হঠাৎ যদি কোথাও এদের পরিচিত কেউ দেখে ফেলে, খবর দেয় তবেই একমাত্র এদের পাওয়া যায়। তবু ওদের ধরার চেষ্টা তো করতেই হবে।

লালবাজারে গোরাকে আমাদের দফতরে নিয়ে এসে কয়েকটা বাউন্ডারি মেরেই জিজ্ঞেস করলাম, "বাচ্চু ও বান্দার কই তাড়াতাড়ি বল।"

গোরা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি জানি না স্যার, ওরা মটকার কথা শুনে সেই যে পালাল, আর এসেছে কি না জানি না। ওরা আমার সঙ্গে ছিল না। আমি মেটিয়াব্রুজে পালালাম। ওরা কোথায় গেছে জানি না।"

"মেটিয়াব্রুজে কোথায় ছিলি, কি করতিস?"

"পাহাড়পুর রোডে, কিছুই করতাম না, ওখানে আমি এক বন্ধুর কাছে ছিলাম। মটকা আমাকে ওর কাজের জন্য রোজ দু'টাকা করে দিত। সেই থেকে ক'টা টাকা ছিল, মেটিয়াব্রুজে থাকতে থাকতে সব টাকা ফুরিয়ে যেতে আমি ফিরে এসেছিলাম। ধরা পড়ে গেলাম।" গোরা কান্না থামিয়ে বলে গেল।

কাগজ টেনে নিয়ে গোরার বয়ান লিখতে বসে গেলাম। ওর নাম, ঠিকানা, বাবার নাম, বয়স, কর্ম সব লিখে জিজ্ঞেস করলাম, "তুই নরেনকে কবে থেকে চিনিস?"

"ছ'সাত মাস আগে থেকে, মটকার বন্ধু। ও মেয়েদের হোমের পিয়ন ছিল। তারপর ওকে চাকরির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ওকে আমার একদম ভাল লাগত না। সবসময় মেয়েছেলের কথা বলত। মটকা যে কেন ওকে তোল্লা দিত জানি না স্যার। তোল্লা দিত বলেই আমরা ফেঁসে গেলাম। মটকার দোকানটাও ফালতু বন্ধ হয়ে গেল। আমারও কাজ গেল। কি যে করল। মটকার কথাতে নরেনের কাজ করতে গিয়ে ওরা হোমে কি একটা কাজ করে এল। তারপর আমাদের পালাতে হল। মটকার বউ, ছেলেরাও এখন খেতে পাচ্ছে না।"

গোরা যে সত্যি কথা বলছে, তা আমি মনে মনে বুঝতে পারছি এবং গোরা, বাচ্চু ও বান্দার যে মোটকার কথায় অযথা ফেঁসে গেছে তাও বুঝতে পারছি মটকাই ওদের গুরু, মটকাই ওদের চালায়, ওরা মটকার কর্মচারী। এইসব নীচু স্তরের অন্ধকার জগতে গুরুর কথাতেই সব কিছু করতে হয়। প্রশ্ন করার বা চিন্তা করে কাজ করার কোনও অধিকার নেই। অবশ্য এরা গুরুর আদেশ নিয়ে চিন্তাভাবনাও করে না। অবকাশও নেই। বিশ্লেষণ বা বিচার বলে যে একটা বস্তু আছে তাও ওরা জানে না। গুরু যা বলে সেটাই চোখ বুজে মান্য করাটাই এই জগতের নিয়ম। ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক, নীতি বা আদর্শ ব্যাপারগুলি কি সে সম্পর্কে ওরা কিছুই জানে না। অন্ধকার জগতে এদের জন্ম, অন্ধকারেই ওই জগতের শিল্পকর্মে ওদের হাতেখড়ি, সেখান থেকেই উপার্জন, সেখানেই ওদের পৃথিবীর আবর্তন।

গোরাকে বললাম, "সতেরো তারিখের কথা বল।"

"কি বলব বলুন স্যার, আমাদের মালগুলি গুছিয়ে রাখছিলাম তখন।" "মালগুলি মানে চোলাই মদের ব্লাডার? ওগুলি কোথায় রাখতিস?"

"কখনও স্যার, নর্দমায়, কখনও স্যার রিপন লেনের একটা ভাঙ্গা দেওয়ালের বড় বড় গর্তে, কোনও দিন স্যার আমাদের ওখানে মটকার এক ছোট ঘর নেওয়া আছে সেখানে। বেশি মাল আসলে অনেক জায়গায় রাখতে হয় তো।"

"কোনও দিন ধরা পড়িস নি?"

"না স্যার, মটকার সব ফিট। আবগারি, থানার ডাকবাবু সব ফিট। এবার আর রক্ষে হল না। থানা থেকে সব ভেঙ্গে দিল। মটকাও পালাল, আমরাও পালালাম। এমন কাজ কেউ করে স্যার?"

গোরার কথায় আমারই হাসি পেল, আমাকেই প্রশ্ন করছে। ভাবখানা এমন যেন মহান এক কাজ বাদ দিয়ে মটকা অন্য কাজ করে ঠিক করেনি। ভুল করেছে। আমি মুখটা কঠিন করে বললাম," তা তোদের মালগুলি কখন গুছাচ্ছিলি? তারপর কি কি হল, বলে যা।"

"সন্ধ্যেবেলা স্যার, আমি, বাচ্চু ও বান্দার মাল গুছিয়ে খদ্দেরদের জন্য এলিয়ট রোড ও রিপন লেনের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ওই সময় থেকেই তো খদ্দের আসা শুরু করে। আমাদের খদ্দেরগুলিও তেমন স্যার, সবাইকে চিনি। কেউ স্যার বসে খায়, কেউ দাঁড়িয়ে মেরেই চলে যায়। সবাই স্যার পয়সা মারতে চায়, তাই আমরা আগেই পয়সা নিয়ে নিই।"

"চুপ কর গোরা, তোর মদ বিক্রির কথা কে শুনতে চাইছে? যেটা জিজ্ঞেস করছি সেটা বল।" ধমকে বললাম।"

"হ্যাঁ স্যার, তখন মটকা আমাদের কাছে এল। বলল, দু-ঘণ্টা পর আমি আসব, তোরা থাকিস। একটা কাজ আছে, যেতে হবে। কিছুক্ষণ ঠেক বন্ধ থাকবে। কাজ হয়ে গেলে আবার ঠেক চালাস।' ওই কথা বলে মটকা চলে গেল। আমরা ঠেক চালাতে লাগলাম। কাউকে বসালাম না। পুলিশের ঝামেলার কথা বলে সবাইকে তাড়াতাড়ি ভাগালাম।"

গোরা একটা করে কথা বলেই ও ওর প্রিয় জীবিকার কথায় ফিরে যাচ্ছে। প্রতিদিন দু'টাকা রোজগারের কথা, ঠেকের কথা ও কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ঠেকও গেল, জাবিকাও গেল, এখন লালবাজারে, এটা ও কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। তাই ও ওর স্থানে সুযোগ ফেলেই ফিরে ফিরে যাচ্ছে। এটা ওকে দোষ দেওয়া যায় না। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। পেট চালানোর ধান্ধা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে প্রত্যেকের আচরণই ওর মতো হয়। সেখানে বোধহয় সাদা কালোর তফাৎ নেই, চোর সাধুর তফাৎ নেই; জন্তু মানুষের তফাৎও এখানে সামান্য।

"আবার তুই তোর ঠেকের কথায় গেছিস?"

"না স্যার, মটকা দু-ঘন্টা পর, আটটার সময় এল। সঙ্গে স্যার নরেনও ছিল, মটকা এসেই আমাদের বলল, 'চল'। আমরা ঠেক গুছিয়ে রেখেছিলাম। মটকার কথায় আমি, বাচ্চু ও বান্দার বেডফোর্ড লেনের দিকে যাচ্ছিলাম, মটকা আমাদের বলল, শিখা নামে হোমের একটা মেয়ের সঙ্গে নরেনের ভাব হয়েছে। ওকে নিয়ে রাতেই পালাবে। যেতে না চাইলে জোর করে নিয়ে যাবে। নরেনকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। কাজটা শুনে আমাদের ভাল লাগলো না। কিন্তু যা চায় আমাদের তো করতে হবে। মটকার কথায় আমরা হোমের পাঁচিলের কাছে এলাম। নরেন একটা ল্যাম্পপোস্টে উঠে টপকাতে গেল। পারল না স্যার। ওর মুখ দেখে আমি হেসে ফেলেছিলাম। মটকা আমাকে লাথি মেরে থামিয়েছিল। তারপর মটকা আর নরেন আমাদের দাঁড়াতে বলে চলে গেল। তারপর ইলিয়াসদার একটা কাঠের সিঁড়ি এনে ওরা দু'জন হোমের ভেতরে টপকে গেল। আমরা তিনজন বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রায় আধঘণ্টা পর ওরা আবার টপকে চলে এল। সিঁড়ি নিয়ে যেতে যেতে

মটকা আমাদের শুধু বলল, 'ভাগ যাও।' আমরা ছুটলাম। বাড়ি চলে গেলাম। তখনও জানি না স্যার কি হয়েছে। পরদিন সকালে মটকা আমাকে বলল, নরেন ওই মেয়েটাকে মেরে ফেলেছে। আমাদের তাই ভেগে যেতে বলছে। কিন্তু কোথায় যাব স্যার। মেটিয়াব্রুজে আমার এক বন্ধু আছে, ওর কাছে গেলাম। ক'দিন ছিলাম স্যার। টাকা ফুরিয়ে গেল, পাড়ায় এলাম। আপনি ধরে নিয়ে এলেন। এবার কি হবে?" গোরা বয়ান শেষ করে আমাকে প্রশ্নই করে ফেলল।

"কি হবে দেখতেই পাবি। খুন করলে যা সাজা হয়, খুনীকে সাহায্য করলেও একই সাজা হয়।"

আমার কথা শুনে গোরার কি প্রতিক্রিয়া হল ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওকে লকআপে পাঠিয়ে দিলাম।

পরদিন মটকাকে নিয়ে গিয়ে ছাব্বিশ নম্বর রিপণ স্ট্রিট থেকে মহঃ ইলিয়াসের কাঠের সিঁড়িটা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেলাম। ওই সিঁড়িটা ব্যবহার করেই নরেন আর মটকা হোমে ঢুকেছিল।

দ্রুত তদন্ত শেষ করার জন্য লেগে পড়ে গেলাম। সাক্ষী হল মোট একচল্লিশ জন। মটকা আদালতে স্বীকারক্তি দিয়ে রাজসাক্ষী হবে বলে ঘোষণা করেও পিছিয়ে গেল। মামলা সাজানোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যক্ষদর্শী কোনও সাক্ষী নেই। সবটাই ঘটনার পরম্পরা আনুযায়ী, পারিপার্শ্বিক অবস্থান চিহ্নিত করে সাজাতে হবে। সেটা করতে গিয়ে আমাদের সামান্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল। কঠিন কঠিন মামলা সাজাতে গিয়ে প্রায়শঃই আমাদের মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে, নিতে হবেও। অবশ্য একটা কথা অবশ্যই সঠিকভাবে মনে রাখতে হবে, যাকে বা যাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে সেই সব আসামী যেন একশ ভাগ আসল হয়, দোষী হয়। এটা নিশ্চিত হতে হবে আগে। বিনা দোষে যেন কাউকে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সাজা না দেওয়া হয়। এটা অপরাধ। অপরাধীকে শাস্তি দিতে গিয়ে যেন বিনা অপরাধে কেও না সাজা পায়। আমরা জেনেছি নরেন ও মটকা শিখাকে খুন করেছে, আর গোরা, বাচ্চু, বান্দাররা কিছু না জেনেই এদের সাহায্য করেছে। তারাও আইনের চোখে অপরাধী। এ ক্ষেত্রে, ওদের অপরাধ আদালতে প্রমাণ করতে যদি মিথ্যার সামান্য আশ্রয় নেওয়া হয় তবে কিন্তু আমরা অপরাধ করব না। ওরা খুন করেও আমাদের উদাসীনতায় বা অতিরিক্ত 'ধার্মিক' সাজার লোভে যদি ওরা বিনা সাজায় মুক্তি পেয়ে যায় তবে কি সেটা খুব 'ধর্মকর্ম' বা 'সাধু'র কাজ হবে? হবে না। তাই অবস্থা অনুযায়ী আমাদের মামলা সাজানোর ক্ষেত্রে কোনও কোনও জায়গায় মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে বৈকি। নিতে হবেও। এ সব ক্ষেত্রে কোনও দোষ নেই।

মহঃ ইলিয়াসের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নরেন আর মটকা যে হোমের পাঁচিল পার হয়েছিল সেটা কে দেখেছে? গোরা, বাচ্চু ও বান্দার দেখেছে। বাচ্চু ও বান্দার খুব সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানে পালিয়েছে।

তেমন খবরই আমি পেয়েছি। সুতরাং ওদের গ্রেফতার করে সাক্ষী করার কোনও সম্ভাবনা নেই। গোরা ওরফে মহঃ আজিজ ধরা পড়েছে। জেলে আছে। সে সাক্ষী হবে না। মহঃ ইলিয়াস সাক্ষী হয়েছে। সাক্ষ্য দেবে যে রাতে শিখা সেনগুপ্তা খুন হয়েছে। সে রাতে নরেন ও মটকা ওর থেকে কাঠের সিঁড়ি নিয়ে গিয়েছিল। এবং ফেরৎও দিয়েছিল আধ ঘণ্টা বাদে। মাঝখানের এই আধ ঘণ্টায় ওরা সিঁড়ি নিয়ে কি করেছিল তা ও বলতে পারবে না।

এই আধঘণ্টা মেলাবার জন্যই, যে লাইট পোষ্টের পাশে ওরা সিঁড়িটা ব্যবহার করে হোমের পাঁচিল টপকে পার হয়েছিল, সেখানে আমরা আমাদের লোক দিয়ে ফুটপাতে একটা চায়ের দোকান বসিয়ে দিলাম। অর্থাৎ ওই দোকানদার নরেন আর মটকাকে সে দিন রাতে হোমের পাঁচিল টপকে পার হতে দেখেছিল এবং কুড়ি পঁচিশ মিনিট বাদে একই ভাবে পাঁচিলের এপাশে হোমের বাইরে এসে মটকাকে গোরাদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছিল। ভাগ যাও জলদি' তারপর সিঁড়ি নিয়ে মোটকাকে দৌড় দিতে দেখেছিল। আদালতে চার্জশিট দেওয়ার আগেই দোকান বসিয়ে সব সাজিয়ে নিলাম। নরেনদের সাজা নিশ্চিত করতে এই মিথ্যা দোকানটা সাজালাম। খুব বড় অপরাধ করলাম কি? শিখার মতো একটা নিরাপরাধ উনিশ বছরের কিশোরীকে যারা খুন করল, আদালত যাতে ওদের শাস্তি দেয় সেটা ঠিক করাটা কি অন্যায় কাজ হল? নাকি ওরা আদালত থেকে বেরিয়ে গেলে ন্যায়ের কাজ হতো। কোনটা? আদালত থেকে বিচারপতি এসে সেই চায়ের দোকান সহ হোমের কোন জায়গায় শিখা খুন হয়েছিল, পাঁচিলের কোনখান দিয়ে নরেনরা হোমে ঢুকেছিল সব সরেজমিনে পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন।

বিচারপতি নরেন আর মটকা ওরফে আনোয়ার হোসেনকে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন, গোরাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। শিখারানী সেনগুপ্তের হত্যার মামলার ওখানেই যবনিকা পড়েছিল।

এইভাবে কত হত্যা ও অন্যান্য অপরাধের যবনিকা লোকচক্ষুর সামনে পড়লেও পুলিশের দফতরে তা পড়ে না। নতুন কোনও অপরাধ সংঘটিত হলে সেই অপরাধের সঙ্গে তার মিল বা অমিল খুজে পুলিশ অপরাধী ও তার সাগরেদ বা গোষ্ঠী বা দল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা খোঁজার চেষ্টা করে। আমরা যখন লাল বাজারে মার্ডার সেকশনের অফিসার হয়ে এলাম, তখন দু'টো খুন সম্পর্কিত তদন্ত ও মামলা আমাদের অবগত করা হতো। ষড়যন্ত্র ও খুনের সঠিক পথের অনুসন্ধান, তদন্ত ও ব্যাপকতা সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ানোর জন্যই ওই দুটো খুনের দৃষ্টান্ত শেখানো হতো। দু'টি খুনের ঘটনাই ঘটেছিল পরাধীন ভারতবর্ষে অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে। খুন তো আর আমল দেখে হয় না যদি না সেটা রাজনৈতিক সম্পর্কিত হয়, তাই দৃষ্টান্ত হিসাবে সেই খুনের ষড়যন্ত্রের ও নৃশংসতার উদাহরণ খুবই কার্যকরী।

দু'টি ঘটনাই সংক্ষেপে বলে রাখছি।

বিহারের সাঁওতাল পরগনার পাকুড় মহকুমায় একটা ঐতিহ্যশালী বিত্তবান জমিদার ছিল। উনিশশো উনত্রিশ সালে জমিদার কুমার প্রতাপেন্দ্র চন্দ্র পানডে মারা গিয়েছিলেন। তার ছিল দুই স্ত্রী। মারা যাওয়ার সময় তিনি রেখে গিয়েছিলেন তার প্রথমা স্ত্রীর ছেলে বিনয়েন্দ্রচন্দ্র ওরফে সাধন আর মেয়ে কাননবালা ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর ছেলে অমরেন্দ্রচন্দ্র ওরফে বাবু ও মেয়ে বনবালাকে। প্রতাপেন্দ্র চন্দ্র পানডে মারা যাওয়ার সময় প্রথমা স্ত্রীর ছেলে অর্থাৎ বড়কুমার বিনয়েন্দ্রচন্দ্র পানডে ছিল সাতাশ বছরের সাবালক, আর দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে অমরেন্দ্রচন্দ্র পানডে ছিল নাবালক।

বিহারের সাঁওতাল পরগনা জেলা এমনিতেই একটা পিছিয়ে পড়া স্থান। ব্রিটিশ আমলেও ছিল আরও পিছিয়ে পড়া স্থান, যদিও ওই অঞ্চল খনিজ ও বন সম্পদে অতি বিত্তশালী। সেই পিছিয়ে পড়া অঞ্চলেও পাকুড়ের জমিদারের সম্পত্তি ছিল বিপুল পরিমাণ। প্রতাপেন্দ্র চন্দ্র মারা যাওয়ার সময় পাকুড় জমিদারি স্টেটের বছরে আয় হতো প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। তা ছাড়াও তিনি নগদে রেখে গিয়ে ছিলেন বিশাল অঙ্কের অর্থ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। এবং তখনকার হিন্দু আইন অনুযায়ী সেই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার ছিল তার দুই ছেলে সাধন ও বাবু।

বাবা মারা যেতেই বড়কুমার বিনয়েন্দ্র ওরফে সাধন পাকুড় স্টেটের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিজের অধীনে নিয়ে নিয়েছিল এবং তাঁর আদেশ অনুসারেই জমিদারি চলতে লাগল। অন্যদিকে ছোট কুমার অর্থাৎ অমরেন্দ্র ওরফে বাবু তখন সবে ম্যাট্রিক

পাশ করে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য ভর্তি হয়েছিল। পাকুড় স্টেটের আয় ব্যয় এবং সম্পত্তি সম্পর্কে ওর কোনও সম্যক ও বিস্তারিত ধারণা ছিল না।

সম্পত্তি, বিত্ত, জমিদারির প্রতাপ সম্পর্কে বাবুর কোনও ধারণা না থাকার কারণ শুধু তার বয়সের জন্য নয়, কারণ ও কখনই ওই সব নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পায়নি। অবকাশ না পাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে বাবু জন্মের মাত্র সাতদিনের মধ্যে তার মাকে হারিয়েছিল। সে বড় হয়েছিল তার জ্যাঠাইমা রানী সূর্যবতীর কাছে। রানী সূর্যবতী বাবুর মা মারা যেতেই তাকে বুকে তুলে নিয়েছিল। তাকে মায়ের স্নেহ ভালবাসা দিয়ে রানী সূর্যবতী দেবীই মানুষ করে তুলেছিলেন। বিধবা রানী সূর্যবতীদেবীর কোনও সন্তান ছিল না। তাই তিনি প্রকৃতপক্ষে শুধু বাবুকেই নয় প্রতাপেন্দ্রচন্দ্র পানডের দুই স্ত্রীর ছেলে মেয়েদেরই নিজের সন্তানের মতোই বুকে পিঠে যত্ন করে বড় করে তুলেছিলেন। বাবু যেহেতু সবচেয়ে ছোট এবং জন্মের পর মাত্র সাতদিন মাকে পেয়েছিল তাই তাকেই রানী সূর্যবতী অতিরিক্ত স্নেহ দিয়ে বড় করে ছিলেন। বাবু সূর্যবতীকেই নিজের 'মা' হিসাবে জানত এবং দেখত।

বাবা মারা যাওয়ার পরেই সাধন পাকুরের যাবতীয় সম্পত্তি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার ফলে সে বাবুকে পাটনায় ঠিকমত টাকা পয়সাও পাঠাত না। অথচ প্রতাপেন্দ্রর ইচ্ছা ছিল সে তার ছোট ছেলে বাবুকে পাটনায় পড়াশুনার সময় সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করে দেবে। ব্যবস্থা করবে জমিদারির আভিজাত্য অনুযায়ী বাসস্থানের। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর বাবু পড়াশুনার জন্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও সাধন তার বাবার ইচ্ছার প্রতি সামান্যতম সন্মানও দেখাল না। ফলে বাবুকে অন্য সাধারণ পরিবারের ছাত্রের মতই হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতে হল। বাবুর এই অবস্থার জন্য তার হয়ে প্রতিবাদ স্বরূপ কেউ সাধনকে কোনও কথা বলার সাহস দেখাল না। কারণ সাধন প্রায় একনায়কতন্ত্রের মতো ব্যবহার করতে ততদিনে শুরু করেছে। সে তার যা ইচ্ছা তাই করতে লাগল। বাবুর জন্য সামান্য অর্থ ব্যয় করতে না চাইলেও সে নিজে মদ্যপান ও নারীসঙ্গে নিজেকে ডুবিয়ে দিল। নিজের ভোগকে উচ্চতর মাত্রায় নিয়ে যেতে সে পাকুড়ের বদলে কলকাতাকে বেছে নিল। সে কলকাতায় আসতে শুরু করল। কলকাতায় থেকে সে পাকুড়ে যেত শুধু টাকা আনতো। টাকা নিয়েই সে কলকাতায় পাড়ি দিত। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে চরম উশৃঙ্খল জীবন যাপনে একেবারে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। কলকাতায় একটা মহলে সে পাকুড়ের রাজাসাহেব নামে পরিচিত হয়ে উঠল।

সে নিজের ভোগ বিলাসের জন্য দু'হাতে দেদার খরচ করতে লাগল। ডাঃ তারানাথ ভট্টাচার্য নামে এক ডাক্তারের সঙ্গে তার কলকাতায় পরিচয় হলো। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ট বন্ধু, বন্ধুর থেকে উশৃঙ্খল জীবন যাপনের সঙ্গী। সাধনের কলকাতার

আশ্রয়স্থল ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ক্যালকাটা হোটেল' নামে একটা হোটেল বা অন্য কোনও ভাড়া বাড়িতে।

ভোগ, বিলাস ও লোভ অতিরিক্ত মাত্রায় থাকলেও সাধনের নিজস্ব সুবুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে কিছুই ছিল না। সুবুদ্ধি থাকলে সে নিজের ছোটভাইকে বঞ্চিত করে নিজের জন্য একটা ভোগ্যপৃথিবী গড়ে তুলতে পারত না। কুপথে চলতে চলতে, কু-নেশা করতে করতে তার ধ্যানজ্ঞান সবসময়ই ওই আধারই ঘোরা ফেরা করত, আর এ ব্যাপারে তার গুরু এবং একনিষ্ঠ মন্ত্রণাদাতা হয়ে উঠেছিল ওই ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য। ওরই প্রদর্শিত পথে যেতেযেতে সাধন চঞ্চলা নামে একটা যুবতীকে নিজের ব্যক্তিগত রক্ষিতা হিসাবে রেখেছিল। তা ছাড়া, বালিকাবালা নামে কলকাতা রঙ্গমঞ্চের এক সুন্দরী অভিনেত্রীকেও সাধন রেখেছিল নিজের ভোগবিলাসের জন্য। আর সাধন কলকাতায় যখন না থাকত তখন ডাক্তার তারানাথ বালিকাবালাকে নিজের ভোগে লাগাত। এইভাবেই সাধন তার জীবনের দৈনন্দিন যাত্রাকে চালাতে লাগল। এই যাত্রাতেই ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্যের সূত্রে ওর সঙ্গে পরিচয় হলো ডাক্তার দুর্গারতন ধর ও ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্যের। এরাও সাধন ও তারানাথের পথের পথিক। মদ্যপান ও নারীসঙ্গ ভোগটা যাপনের অঙ্গ করে নিয়েছিল। সাধনের অর্থে ডাক্তারবাবুরা বেশ সুখেই ভোগের জীবন উপভোগ করত।

বাবুর পড়াশুনা ও পটনায় থাকার জন্য যে অল্প পরিমান টাকা লাগত সেটা পাঠাতেও সাধন পুরোমাত্রায় উদাসীনই শুধু ছিল না, পাঠাতই না। ফলে সূর্যবতীদেবীকেই বাবুর জন্য টাকা পয়সা পাঠাতে হত। যদিও তিনি সাধনকে বহুবার সময়মত বাবুকে টাকা পয়সা পাঠাতে অনুরোধ করতেন কিন্তু সে সব অনুরোধ সাধন এক কান দিয়ে শুনত আর অন্য কান দিয়ে বের করে দিত। নিজের ভোগ এবং তার জন্য টাকা ওড়ানো ছাড়া ওর অন্য কোনও কাজই ছিল না। এমনকি রাজবাড়ির পরিবেশ সাধন এমনভাবে নোংরামিতে ভরিয়ে তুলল যে রানী সূর্যবতীদেবী বাধ্য হয়ে রাজবাড়ি পরিত্যাগ করে অন্য জায়গায় থাকতে শুরু করলেন। কখনও ভাগলপুর কখনও বা দেওঘরে। সাধন পরিকল্পনা করে রাজবাড়ির পরিবেশ কুলষিত করেছিল সূর্যবতীদেবীকে রাজবাড়ির থেকে অন্যত্র তাড়ানোর জন্যই। সূর্যবতীদেবী রাজবাড়ি ত্যাগ করার পরেই চঞ্চলা নামের রক্ষিতাকে সাধন রাজবাড়ির কাছেই একটা বাড়িতে এনে তুলল।

ছুটিতে বাবু পাটনা থেকে পাকুড়ে নিজের বাড়িতে না গিয়ে সূর্যবতীদেবী যেখানে যখন থাকতেন সেখানেই যেত। এইভাবে আর্থিক টানাটানি নিয়েই বাবু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এ. পাশ করে সূর্যবতীদেবীর পরামর্শে বি. এ পড়বার জন্য ভর্তি হয়ে পাটনায় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে লাগল।

ইতিমধ্যে বাবু সাবালক হয়ে উঠেছে। পাটনায় থাকতে থাকতে বাস্তব বুদ্ধিও অনেক পরিণত হয়ে উঠেছে। সে বহুদিন ধরেই ভাবছিল তার দাদা সাধন তাকে সম্পূর্ণভাবে ঠকাচ্ছে। রাজবাড়ি ও তার আয় সম্পর্কে তার পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকলেও এটা সে জন্মের থেকে বুঝে গিয়েছিল। তাদের আর্থিক অনটন এমন হওয়ার কোনও কারণ নেই যে তাকে অন্যের অবলম্বন হয়ে পড়াশুনা চালাতে হবে। সে যে পাকুড়ের বিখ্যাত জমিদার বাড়ির ছেলে সেটা সে ভালভাবেই জানত। শুধু তাই না প্রতি মুহূর্তে ওর পাটনার বন্ধুবান্ধবরা তা বুঝিয়ে দিত। কিন্তু সে রানী সূর্যবতীদেবীর পরিচর্যায় মানসিক ভাবে এমনভাবে বড় হয়েছিল যে সে চট্ করে কাউকে কটু কথা বলতে পারত না। সেটা তার দুর্বলতা না, ভদ্রতা। কিন্তু বি. এ ক্লাসে ভর্তি হওয়ার পর সে অনুভব করল এভাবে আর চলতে পারে না। সে দেখত, ওর ক্লাসের অন্য ছেলেরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে যেটুকু খরচাপাতি করতে পারত, সে পাকুড়ের নামকরা জমিদার বাড়ির ছোট ছেলে হয়ে সেটুকুও খরচ করতে পারত না। তাতে নিজেকে ওর বড় ছোট এবং অনাথ মনে হত। যদিও রানী সূর্যবতীদেবী তাকে আর্থিক দিক দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। কিন্তু বাবুর নিজেকে বড় অসহায় মনে হতো। সে জানত এবং বুঝত তার 'মা' তাকে তাঁর জীবন থেকে বেশি ভাল বাসেনই শুধু নয়, তাকে ছাড়া তার বাঁচারও কোনও রকম ইচ্ছে নেই। তবুও নিজের সমস্ত রকম আর্থিক সংস্থান থাকা সত্ত্বেও সে কেন রানী সূর্যবতীদেবীর দয়াতে চলবে?

সাধনের মনোভাব বুঝে বাবু ওদের স্টেটের প্রাপ্য অংশ ভাগ করে বুঝে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তাই প্রথমেই সাধন ও ওর যৌথ মোক্তারনামা বাতিল করে ওর নিজের অংশের জন্য আলাদা মোক্তারনামা ওর বিশ্বাসী, নির্ভরশীল তিনজন মানুষের নামে করে দিল। এটা ওর করার কারণ ওর প্রাপ্য অংশের বিশাল সম্পত্তি ও টাকাপয়সা যেন একমাত্র ওর মনোনীত ব্যক্তিরাই তুলতে পারেন। উনিশশো বত্রিশ সালের বারই মার্চ বাবু সুখলাল উপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বসু ও অন্য আর একজনের নামে ওর মোক্তারনামাটা সম্পাদন করল। বাবুর এই ধরনের কাজে সাধন ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রেগে গেল এবং বাবুকে বিব্রত করতে শুরু করল।

এই সময় সাধন বাবুকে বিপদে ফেলার জন্য একটা শয়তানী পথের আশ্রয় নিল। ওদের স্টেটের অন্তর্গত কালাহানপুরের সম্পত্তির খাজনা বাকি পড়েছিল এবং খাজনা আদায়ের জন্য সম্পত্তি নীলামে উঠতেই সাধন বাবুকে চিঠি লিখল নীলাম থেকে সম্পত্তি বাঁচানোর জন্য খাজনার টাকা পাঠাতে। সে ভালই জানে বাবুর কাছে কোনও টাকা পয়সা নেই, কারণ বাবুকে কোন দিন সে তার প্রাপ্য টাকা দেয়নি, এমনকি তার পড়াশুনার জন্য যে সামান্য টাকার দরকার হত সেটাও সে ঠিকমত পাঠায়নি। তাঁদের স্টেটের আয়ের সমস্ত টাকাই সাধনের কাছে থাকে। তাহলে বাবু

কোথা থেকে খাজনার টাকা মেটাবে? আয়ের অংশ সাধন হস্তগত করে নেয় আর বাবু দেবে খাজনার টাকা?

সাধন বাবুকে চাপে ফেলে মোক্তারনামাটা বাতিল করার জন্যই এই চালটা চেলেছিল। বাবু সাধনের চিঠি পেয়ে তার অক্ষমতার কথা সাধনকে জানাল, কিন্তু সাধন হেসে সেটা উড়িয়ে দিল। বাবু তখন ওদের কালাহানপুরের সম্পত্তি বাঁচানোর জন্য বাধ্য হয়ে টাকা ধার করে খাজনা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করল।

সাধন এবার বাবুকে ভয় দেখিয়ে সোজাসুজি চিঠি লিখে মোক্তারনামাটা বাতিল করতে বলল। সে এত রেগে গিয়েছিল যে সে যা খুশি তাই লিখল, বাবুকে সে মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ নামে অভিহিত করল। এমনকি বাবুর পক্ষে যারা ছিল তাঁদেরও ক্ষতি করতে শুরু করল। ওদের স্টেটের কর্মচারী অশ্বিনীবাবুকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করল। ওর দোষ, সে বাবুকে সেই মোক্তারনামাটা লিখে দিয়েছিলেন। অবশেষে সাধন জোর করে বাবুকে সেই মোক্তারনামাটা বাতিল করতে বাধ্য করাল। তারপরও কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। বাবুকে তার অংশের টাকা পয়সা থেকে একই ভাবে বঞ্চিত করতে লাগল। সম্পত্তির কোনও অংশই বাবুকে সাধন দিতে চায়নি।

উনিশশো বত্রিশ সালের আগষ্ট মাসে বাবু সাধনকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল সে তার অংশ বুঝে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কারণ সে তার প্রাপ্য অংশ কিছুই না পেয়ে দুরাবস্থার মধ্যে আর থাকতে রাজি নয়। সে মনে মনে ঠিক করেছিল ব্যাভিচারী সাধনের সঙ্গে সে আর যৌথভাবে থাকবে না। এইভাবে অন্যের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর আর নির্ভর হয়ে থাকবে না। সুতরাং তাকে তার অংশ বুঝে নিতে হবেই হবে।

সাধন বুঝতে পারল, বাবুকে আগের মত দমিয়ে রাখতে পারবে না। সে ক্ষেপে গেল। কারণ বাবুকে যদি সত্যিই তার অংশ দিতে হয় তাহলে সে মনের সুখে নিজের মর্জি মাফিক টাকা উড়াতে পারবে না। বাবুকে সে কোনদিন ভালবাসত না, সে বাবুকে শত্রু বলে মনে করত। সে এবার ভাবল সে যদি বাবুকে পৃথিবী থেকে মুছে দিতে পারে, তাহলেই সে একছত্রপতি হয়ে পাকুর স্টেটে রাজত্ব করতে পারবে। এবার তাই ঠিক করল ওই কাজটাই সে করবে, যাতে তাকে আর ভবিষ্যতে যন্ত্রণা না ভোগ করতে হয়। কিন্তু সে এটাও ঠিক করল এমনভাবে এই হত্যার পরিকল্পনা করতে হবে যাতে বাবুর মৃত্যুর কারণ হিসাবে কোনও মতেই তার দিকে কেউ তীর নিক্ষেপ করতে। পারে না সে তাই কলকাতায় এসে তার ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় বসে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করল।

ডাক্তার বন্ধুরা তাকে বলল, বাবুর শরীরে কোনও মতে যদি মারণ রোগ প্লেগের জীবানু ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই সাধনের ইচ্ছাপূরণ হবে। প্লেগ রোগে

বাবুর মৃত্যু অবধারিত, আর লুকিয়ে বাবুর শরীরে ওই রোগের জীবানু ঢুকিয়ে দিতে পারলে বাবুর মৃত্যুর জন্য কেউ সাধনকে দায়ী করতে পারবে না। সাধনের সম্পূর্ণ ইচ্ছাই ঠিকভাবে সামাধা হবে। ডাক্তার বন্ধুদের মধ্যে সাধনকে এই কাজে সহায়তা করার জন্য ছিল তার অকৃত্রিম দোসর ব্যাকটিরিও লজিস্ট ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য, ডাক্তার ডি. আর. ধর. ও ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনের প্রফেসর ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য। কিন্তু প্লেগের জীবাণু বা বেসিলি জোগাড় করা যায় একমাত্র মুম্বাইয়ের ল্যাবরাটরি থেকে, সেটা জোগাড় করাও কষ্টসাধ্য। সাধন এতদিন অপেক্ষা করতে রাজি নয়। সে তাই ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্যের সহায়তায় ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাসের বেসিলি জোগাড় করল, তারপর শুরু করল তার যাত্রা।

সাধন যখন বাবুকে খুন করার ষড়যন্ত্রে মত্ত ঠিক সেই সময় বাবু রানী সূর্যবতীর কাছে দেওঘরে পুজোর ছুটি কাটাতে সেখানে গিয়েছিল। সাধন সে খবর পেয়েছিল, সে টিটেনাসের বেসিলি নিয়ে ব্যক্তিগত গাড়িতে চেপেই দেওঘরে সূর্যবতীদেবীর বাড়িতে গিয়ে উঠল। তাঁর একটাই উদ্দেশ্য যে টিটেনাস বেসিলিটা বাবুর শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া।

দেওঘরে পৌঁছে সাধন তার কাজ সমাধা করার সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছিল না। বাবু বাড়িতে বেশিরভাগ সময় কাটাত এবং বাবুর আশেপাশে কেউ না কেউ থাকত। সে তাই একদিন সন্ধ্যেবেলা বাবুকে প্রায় জোর করে দেওঘর শহরে ভ্রমণ করতে নিয়ে গেল। সাধন বাবুকে পাটনা ও ওর পড়াশুনা স্টেটের গল্প বলতে বলতে অন্যমনষ্ক করিয়ে হঠাৎই বাবুর নাকের ফুঁটো দিয়ে টিটেনাসের বেসিলি ঢুকিয়ে দিল, আর বাবুও তা বুঝতে না পেরে সেই বেসিলি শ্বাসের সঙ্গে টেনে শরীরের ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। তারপর ওরা আরও ঘন্টাখানেক পর শহরে ঘুরে বাড়ি ফিরে গেল। সাধনের মন তখন ফূর্তিতে ভরপুর, সে তখন তার কাজ সমাধা করেছে, তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু সামনে দেখতে পাচ্ছে। পাকুড়ের পূর্ণ অধিপতি হয়ে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হিসাবে পাকুড়ের তহবিল ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করার অধিকার পাচ্ছে। কারণ টিটেনাসও একটা প্রায় মারণ রোগ, চিকিৎসা ঠিকমত না হলে মৃত্যু প্রায় অবধারিত ছিল। সাধন তার কাজ সেরে সকলের চোখের আড়ালে দেওঘর ছেড়ে আবার কলকাতায় ফিরে গেল।

টিটেনাসের জীবাণু বাবুর শরীরে ঢুকে নিজের কাজ করতে শুরু করেছে এবং পরদিন সকাল থেকেই বাবু গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যবতীদেবী স্থানীয় ডাক্তার সৌরিন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ডেকে আনলেন। অন্য দিকে তিনি সাধনকে টেলিগ্রাম করলেন সে যেন তাঁদের পাকুড়ে পারিবারিক ডাক্তার অনিলবাবুকে টেলিগ্রাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেওঘরে পাঠিয়ে দেয়। সূর্যবতীদেবীর

টেলিগ্রাম পেয়ে সাধন প্রাণখুলে একবার হেসে টেলিগ্রামের কাগজটা দুমড়ে মুচড়ে লাথি মেরে ফেলে দিল। সে তো জানেই বাবুর কি হবে, সেই কাজটা করার জন্যই তো সে দেওঘরে চড়াও হয়েছিল। তার কাজ যে শুরু করেছে সেটাই সে তার ডাক্তার বন্ধুদের সবিস্তারে জানিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা শুরু করল। বাবুর যাতে টিটেনাসের চিকিৎসা না হয়ে অন্য চিকিৎসা হয়। ভুল চিকিৎসার জন্য বাবু যেন তাড়াতাড়ি মৃত্যুর মুখ দেখে। সেই ষড়যন্ত্র মাফিক সাধন ডাক্তার অনিল বসুকে দেওঘরে না নিয়ে গিয়ে নিয়ে গেল তার ষড়যন্ত্রের দোসর ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্যকে। সাধন দেওঘরে গিয়েই ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্যকে দেখিয়ে ঘোষনা করল তিনি কলকাতার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং প্রত্যেককে নির্দেশ করার ভঙ্গিতে বলল যে, বাবুর চিকিৎসার দায়দায়িত্ব সব ডাক্তার তারানাথের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আত্মীয়স্বজন সাধনের নির্দেশ কিছুই শুনল না। তখন ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য বাধ্য হয়ে ডাক্তার সৌরিন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে বাবুর উল্টো চিকিৎসা করার জন্য কিছু ভুল পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দেওঘরে উপস্থিত বাবুর পরিজনরা কেউ চাইল না যে ডাক্তার সৌরিন্দ্র, ডাক্তার তারানাথের পরামর্শ মতো বাবুর চিকিৎসা করুক। এরপর প্রায় বাধ্য হয়েই দেওঘর ছেড়ে ডাক্তার তারানাথ কলকাতা চলে এল। ডাক্তার তারানাথ চলে যাওয়ার পরে ডাক্তার সৌরিন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসায় বাবু কয়েক দিনের মধ্যে প্রায় সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। ডাক্তার তারানাথ ফিরে আসার পর সাধন এবার অন্য কৌশল নিল। সে এবার ডাক্তার ডি. আর. ধরকে নিয়ে দেওঘরে হাজির। কোনও ডাক্তারের প্রয়োজন আছে কি নেই সেটা ওকে কেউ দেওঘর থেকে জানায়নি, তবু সে ডাক্তার ধরকে নিয়ে হাজির। ডাক্তার ধর দেওঘরে এসে বাবুকে পরীক্ষা করে স্থানীয় এক চিকিৎসককে দিয়ে কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া তাঁর একটা সিরাম ডাক্তার ধরেরই সিরিঞ্জ দিয়ে বাবুর কোমরে ইঞ্জেকশন দিতে বাধ্য করলেন। বাবুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাক্তার ধর ওকে ওই সিরাম ওর শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন। ওই সময় দেওঘরের ডাক্তার সৌরিন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেওঘরে ছিলেন না। সিরামটা নেওয়ার পরই বাবু আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাঁর শরীরে আবার পুরানো লক্ষণ দেখা দিল। ঠিক সেই সময় ডাক্তার সৌরিন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেওঘরে ফিরে এলেন এবং আবার বাবুর চিকিৎসা শুরু করলেন। বাবু আবার সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় দেওঘরে ফিরে আসার পরেই সাধন ডাক্তার ধরকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছিল।

কলকাতায় ফিরে সাধন ও তার অনুচর ডাক্তাররা হতাশ হয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সাধন ওর প্রতি আস্থা রাখার অভিপ্রায় স্বরূপ দেওঘরে বাবুর জন্য

অনেক রকম ফল ও ঔষুধ পাঠিয়েছিল। কিন্তু বাবু সে গুলি ছুঁয়েও দেখেনি। বাবু সাধনের ওপর আর কোনও রকম ভরসাই রাখতে পারছিল না।

সাধন কলকাতায় ডাক্তারদের সঙ্গে আবার পরামর্শ করে এবার এক সঙ্গে ডাক্তার ধর ও ডাক্তার শিবপদকে নিয়ে দেওঘরে এসে পৌঁছাল। তারিখটা খুব সম্ভবত উনিশশো বত্রিশ সালের ষোলই নভেম্বর। কিন্তু এবার ওদের আগমণের কোনও কারণই শুধু ছিল না, ওদের পরিকল্পনার বিন্দুমাত্র ফলও ওরা পেল না। কারণ বাবু ওই দুই ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ গ্রহনই করল না। সাধন তখন রানী সূর্যবতী দেবীর ওপর রাগ দেখিয়ে দেওঘরেই অন্য একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করল।

সাধনের রাগ হল কি অভিমান হল তাতে রানী সূর্যবতী দেবীর কিছু যেত আসত না। কারণ তাঁর নিজস্ব স্টেটের থেকে তাঁর আলাদা যথেষ্ট আয় ছিল। তিনি কারো উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। এদিকে ডাক্তার ধরের ইঞ্জেকশনের ফলে বাবুর কোমরে একটা সাইনাস দেখা দিয়েছিল। সূর্যবতী দেবী বাবুকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় চলে এলেন, কিন্তু সামান্য চিকিৎসা করিয়েই বাবুর শরীর পুনোরুদ্ধার করার জন্য হাওয়া বদলের প্রয়োজনে তিনি বাবুকে নিয়ে ভুবনেশ্বরে এলেন।

রানী সূর্যবতী ও বাবু যে বাড়িতে ছিল তাঁর দু'টো বাড়ির পরেই এক ডাক্তারের বাড়ি। কলকাতার নাম করা ডাক্তার রমেন্দু রায়ের ওখানে একটা বাড়ি ছিল। বাবুরা যখন ভুবনেশ্বরে তিনিও তখন ওখানে যান। তিনি সূর্যবতী দেবীর অনুরোধে বাবুকে পরীক্ষা করেন তখন তিনি বাবুর ডান কোমরের নীচের দিকে সাইনাস দেখতে পেলেন, সাইনাসের গভীরতা ছিল দুই ইঞ্চির মতো। সাইনাস থেকে জলীয় পদার্থ বেরিয়ে আসছিল। কিভাবে সাইনাস হল, কেন হল, বাবুর কি হয়েছিল, সেই ঘটনার বিবরণ ডাক্তার রায় রানী সূর্যবতী দেবীর কাছে শুনে ডাক্তার রায় সূর্যবতীদেবীকে পরামর্শ দিলেন বাবুকে দ্রুত কটকে নিয়ে গিয়ে সাইনাস অপারেশন করার জন্য। অপারেশন না করলে যে বাবুর বিপদ ঘটতে পারে তেমন কথাও তিনি জানিয়ে দিলেন।

ডাক্তার রায়ের কথা শুনে রাণী সূর্যবতী দেবী ওকে অনুরোধ করলেন তিনিও যেন ওদের সঙ্গে কটকে যান। রাণীর অনুরোধে ডাক্তার রায়, বাবু ও সূর্যবতী দেবীকে নিয়ে কটকে এসে কর্নেল ডাক্তার পালিতের কাছে সাইনাসের অবস্থান জানার জন্য এক্সরে করালেন।

কর্ণেল পালিত নিজেই বাবুর সাইনাস পরিষ্কার করে দিলেন। কিন্তু কটকে বাবুর অপারেশন হল না। ডাক্তার রায় তখন ওদের কলকাতায় চলে যেতে বললেন। রাণী বাবুকে নিয়ে ভুবনেশ্বর ফিরে গেলেন এবং ভুবনেশ্বর থেকে সোজা কলকাতায় চলে এলেন। কলকাতায় বাবুকে ডাক্তার এল. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষা করে অপারেশন করলেন, বাবু এবার ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠল।

বাবুকে টিটেনাসের জীবাণু দিয়ে মারা গেল না। বাবু বেঁচে গেল। বাবু বেঁচে থাকলে তো সাধনের কোনও সুবিধা নেই। বাবুর মৃত্যুই সাধনের কাছে কাম্য। তাহলেই সে পাকুড় স্টেটের সব সম্পত্তি একাই ভোগ করতে পারবে। চঞ্চলা, বালিকাবালার মতো আরও বহু নারীকে ভোগ করতে পারবে। যেমন খুশি তেমন ভাবে চলতে পারবে। সাধন বুঝতে পারছে বাবু এবার আর ছাড়বে না, সে তার সম্পত্তির ভাগ বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে এগিয়ে যাচ্ছে। বাবুর যে সব চিঠি পত্তর ও পায় কিংবা সাক্ষাতে যেভাবে কথা বলে তা ঠিক আগের মতো নয়। সেখানে বিশ্বাস হারানোর কোথায় একটা সুর রয়ে গেছে। বাবুর প্রতি সাধনের দাদা হিসাবে কোনও দিন টান ছিল না। হিংসাই ছিল। সেই হিংসাই পরে বাবুকে ছোবল মেরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। বাবুর প্রতি বিন্দুমাত্র ভালবাসা সাধনের নেই।

সাধন আরও ক্রুর হয়ে উঠল। সে তার ডাক্তার পরামর্শ দাতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসল। ওরা ওকে আগেও বলেছিল প্লেগের জীবাণু যদি বাবুর শরীরে প্রয়োগ করা যায় তবেই সাধন নিশ্চিত হতে পারে, ওর লক্ষ্যের প্লেগের জীবাণু জোগাড় করার ভার ডাক্তাররাই স্বইচ্ছায় নিল। সাধন শুধু জীবাণু সংগ্রহ করতে যে অর্থের প্রয়োজন সেটা জোগান দেবে। ওরা এটাও ঠিক করল যতক্ষণ না প্লেগের মতো নিশ্চিত মারণ জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ ওরা আর টিটেনাস বা ওই জাতীয় জীবাণু বাবুর ওপর প্রয়োগ করবে না। তার জন্য যদি কয়েকমাস বা বছরও অপেক্ষা করতে হয় তবু ওরা তাই করবে।

আলোচনায় সিদ্ধান্তে আসার পর সাধন এবার আর একটা অন্য পন্থা নিল। বাবুর মৃত্যু সম্পর্কে সাধনরা এবার স্থির বিশ্বাসী হয়ে বাবুর অজান্তে বাবুর নামে বোম্বে মিউচিয়্যাল কোম্পানীর কাছে একান্ন হাজার টাকার একটা জীবনবীমা করার জন্য আবেদনই শুধু করল না তার প্রিমিয়ামের জন্য অগ্রিম চেকও দিয়ে দিল।

সাধন নিজে বিবাহিত, তার ছেলে মেয়ে আছে, কিন্তু তার নিজের জন্য জীবন বীমা করিয়েছিল মাত্র পঁচিশ হাজার টাকার। বাবুর জন্য এতবড় অঙ্কের বীমা করার আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে সে একটা চিঠি লিখে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিতে বলেছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা বিস্ময়কর ছিল, তা হল ওই বীমার একমাত্র নমিনি হবে সে। অন্য কেউ নয়। অন্য কেউ দাবিদার হবে না। এবং এ ধ্যাপারে অনুসন্ধান যা করার সেটা যেন বীমা কার্যকরী করার আগেই কোম্পানী সেরে নেয়। অর্থাৎ বাবুর মৃত্যু হলে কোম্পানীর আর কিছু করার থাকবে না, সাধনকেই পুরো পলিসির টাকা দিতে হবে, কারণ অনুসন্ধান যা করার তা তো পলিসি দেওয়ার আগেই হয়ে গেছে। এই ধরণের অদ্ভুত অনুরোধ পেয়ে বীমা কোম্পানীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের

মনে সন্দেহ দানা বাঁধে, তারা সাধনের আবেদন নাকচ করে দেয় এবং বীমার আবেদনও গ্রহণ করে নি। অন্তরালে সাধন যে একটার পর একটা বড় বড় চক্রান্ত করে যাচ্ছে বাবুর কোনও আন্দাজই ছিল না, আসলে এমনই হয়। খুন হওয়ার আগে কেউ কি বুঝতে পারে তাকে খুন করার জন্য যড়যন্ত্র হচ্ছে। হয় না। হলে তো সবাই সাবধানী হয়ে যেত। খুন প্রতিরোধ করা তাই খুব কঠিন।

বাবুর জীবন বীমা করাতে না পারলে সাধনরা প্লেগের জীবাণু জোগাড় করার জন্য পরিকল্পনা মতো এগিয়ে যেতে লাগল। প্রথমেই কলকাতার স্কুল অফ-ট্রপিক্যালের কার্যকরী প্রফেসর হিসাবে ডাক্তার শিবপদ বোম্বের প্যারেল ল্যাবরেটরির অফিসার ইন চার্জকে একটা চিঠি লিখে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি যেন ডাক্তার তারানাথকে প্লেগের বেসিলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আরোহণের সুযোগ করে দেন। ডাক্তার তারানাথ পরিকল্পনা মতো এরপরই বোম্বে এসে ওরিয়েণ্টাল হোটেলে উঠলেন। রতন সালারিয়া নামে একটা লোককে সাধন আগেই ঠিক করে রেখেছিল। সেই তারানাথের বম্বের গাইড হিসাবে কাজ করতে শুরু করল।

সাধন আগেই সালারিয়াকে নিয়ে একবার প্যারেন ল্যাবরেটরির অফিসার ইন চার্জ ডাক্তার বি. পি. বি. নাইডুর অফিসে গিয়ে ডাক্তার শিবপদের চিঠি দেখিয়ে প্লেগের জীবাণু হস্তগত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল না হয়ে সে হাফকিন ইনস্টিটিউটের ডাক্তার নাগরাজনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কছে কিছু প্লেগ বেসিলি চেয়েছিল, এ জন্য সে ডাক্তার নাগরাজনকে ঘুষ হিসাবে কিছু টাকা দিতে ও তাঁর সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণে যেতে আহ্বান করেছিল। কিন্তু ডাক্তার নাগরাজন সাধনের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মুখের ওপর 'না' বলে দিয়েছিলেন। সাধন হতাশ হলেও হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিল না। তার যে ওটা চাই-ই-চাই। ওটা বাবুর দেহে চালান করে দিয়ে সে পাকুর জমিদারীর পুরো সম্পত্তি ভোগ করতে চায়। ডাক্তার নাগরাজনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, সে আরও খোঁজ নিতে শুরু করল। শুনল, আর্থার রোড হাসপাতালেও প্লেগ বেসিল পাওয়া যেতে পারে। সে এবার হাফকিন ইনস্টিটিউটের ডাক্তার সাথীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে অনুরোধ করে প্লেগ বেসিলি জোগাড় করার চেষ্টা করল। কিন্তু এখানেও সে ব্যর্থ হল।

সাধন এবার দেখা করল আর্থার রোড হাসপাতালে সর্বময় কর্তা ডাক্তার প্যাটেলের সঙ্গে। ডাক্তার প্যাটেলকে সাধন বলল তার বন্ধু ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্যের গবেষণার কাজের জন্য প্লেগ বেসিলির প্রয়োজন, তিনি যদি দয়া করে তার ব্যবস্থা করতে পারেন তবে ডাক্তার তারানাথ খুবই উপকৃত হবেন। সাধনের কথা শুনে ডাক্তার প্যাটেল তাকে বলল, ডাক্তার তারানাথ যদি বোম্বে আসেন তিনি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তখন তিনি ডাক্তার তারানাথের সঙ্গে আলোচনা করার পর ভেবে

দেখবেন কি করা যায়। সাধন ডাক্তার প্যাটেলের কথা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে তাঁকে আরও হাতে পাওয়ার জন্য পরদিনই সাধন নিজে অসুস্থতার ভান করে ডাক্তার প্যাটেলকে তাঁর হোটেলে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার প্যাটেলকে ভিজিট হিসাবে সাধন দিল পঁয়ত্রিশ টাকা।

ডাক্তার প্যাটেলকে পাওয়ার পর এবং তাঁর সঙ্গে যা যা কথাবার্তা সাধনের হয়েছে সেই সম্পর্কে সব জানিয়ে সাধন কলকাতায় ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্যকে টেলিগ্রাম মারফৎ অনুরোধ করল। তিনি যেন উনিশশো তেত্রিশ সালের সাতই জুলাইয়ের মধ্যে অবশ্যই বোম্বেতে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

সাধন যখন গভীর ষড়যন্ত্রে নিমগ্ন, তখন বাবু পাকুড়ে তার সম্পত্তি ভাগ করে নিজের আয়ত্তে আনার জন্য আইন বিশারদদের সঙ্গে পরামর্শ করছিল। ইতিমধ্যে বাবু জানতে পারল তাদের দু'জনের যৌথ নামে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে রাখা তের হাজার টাকা সাধন তুলে নিয়ে কলকাতায় ভবানীপুর ব্যাঙ্কে নিজের নামে জমা দিয়েছে।

বাবুর জীবন যে নিরপদ নয়, তা তার বন্ধুবান্ধব ও ঘণিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনরা বুঝতে পেরেছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাকে বহুবার সাবধানও করে দিয়েছিলেন। সে তাই সাধনের থেকে দূরে থাকারই চেষ্টা করছিল। সাধনের লোকজন বাবুর গতিবিধির উপর সবসময়ই লক্ষ্য রাখত। এবং সাধনকে যথা সময়ে তা জানিয়েও দিত।

কলকাতায় ডাক্তার তারানাথ সাধনের টেলিগ্রাম পেয়েই পরিদিন ট্রেন ধরে বোম্বের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন এবং সে সাতই জুলাইতে বোম্বে এসে সাধনের কাছে 'সি ভিউ' হোটেলেই এসে উঠলেন। সাধন ও ডাক্তার তারানাথ একই ঘরে রইল। পরদিন ডাক্তার তারানাথকে নিয়ে সাধন গেল আর্থার রোড হাসপাতালে ডাক্তার প্যাটেলের কাছে। সেখানে ডাক্তার প্যাটেল তারানাথের সঙ্গে আলাপ করার পরে, ডাক্তার প্যাটেল সেখানেই ডাক্তার মেহেতার সঙ্গে ডাক্তার তারানাথের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। তারপর তারই উদ্যোগ এবং সাহায্যে হাফকিন ইনস্টিটিউট থেকে একটা প্লেগ কালচারের টিউব সংগ্রহ করা ওদের সম্ভব হল।

ডাক্তার তারানাথের পরামর্শে সাধন ইতিমধ্যেই জান মহম্মদ নামে এক ইঁদুর ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দু'টো সাদা ইঁদুর কিনে নিয়েছিল, যাদের শরীরে প্লেগ কালচার প্রয়োগ করে তাঁরা নিশ্চিত হবেন যে প্লেগ কালচারেরই নমুনা। প্রথম দিনেই ডাক্তার তারানাথ আর্থার রোড হাসাপাতালে দু'টো প্লেগ বেসিলির সাব কালচার তৈরি করে ফেললেন।

পরদিন অর্থাৎ নয়ই জুলাই তারানাথ তাঁর তৈরি সাব কালচার পরীক্ষা করার জন্য একটা ইঁদুরের পেটের লোম পরিষ্কার করে সেখানে ওই সাব কালচার ইঞ্জেকসনের

মাধ্যমে ঢুকিয়ে দিল। ওই ইঁদুরটা অল্প সময়ের মধ্যেই মারা গেল। ডাক্তার তারানাথ উৎফুল্ল হয়ে খবরটা সাধনকে হোটেলে জানিয়ে দিলেন। এরপর ডাক্তার তারানাথ মৃত ইঁদুরটার শব ব্যবচ্ছেদ করলেন। রাতে হোটেলে ফিরে তারানাথও সাধনের সঙ্গে আনন্দ ফুর্তি করলেন। তাঁদের কাঙ্খিত জিনিস হাতে আসায় যে, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা তাতেই তাঁরা দু'জনেই আনন্দিত।

পরদিন পরিকল্পনামাফিক আর্থার রোড হাসপাতাল খোলার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার তারানাথ হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে ঢুকে গেলেন। তখনও ডাক্তার মেহেতো আসেন নি। তারানাথ তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ইঁদুরটাতে আগের দিনের মতো প্লেগ বেসিলি ঢুকিয়ে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটাও মারা গেল। ডাক্তার তারানাথ সকাল দশটার মধ্যেই ওই ইঁদুরটার শব ব্যবচ্ছেদ করে ফেললেন। এরপর ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য সবার অলক্ষ্যে প্লেগ বেসিলির টিউব সরিয়ে ফেললেন। বোম্বে আসার উদ্দেশ্য সফল।

বারই জুলাই ওই প্লেগ বেসিলি নিয়ে সাধন ও ডাক্তার তারানাথ কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। কলকাতায় পৌঁছে সাধনরা তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপটা নিয়ে পরিকল্পনা করতে বসল। প্লেগ বেসিলি তো করায়ত্ত। এবার সেটা বাবুর শরীরে তো চালান করতে হবে। নয়ত তাঁদের এতদিনকার সাধনা তো ব্যর্থ হয়ে যাবে। এখন তাই তাঁদের এমনভাবে ছক করতে হবে যে, কেউ জানতে ও বুঝতেই পারবে না যে, সাধনরা ওই প্লেগ বেসিলি বাবুর শরীরে ঢুকিয়েছে। কীভাবে সেটা সম্ভব তাই নিয়ে চলল চিন্তা ভাবনা।

সাধন যে বোম্বে গিয়েছে সেটা বাবু শুনতে পেয়েছিল এবং বোম্বে গিয়ে অযথা স্টেটের টাকা ব্যয় করার জন্য বাবু সাধনকে একটা চিঠি লিখে প্রতিবাদও করেছিল। তার উত্তরে সাধন বাবুকে জানিয়েছিল যে, তার বোম্বে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সিনেমার ব্যবসার জন্য। বাবু এই নিয়ে আর কিছু বলে নি। কারণ সে জানত সাধন তাঁর কোনও কথাই শুনবে না, নিজের মর্জি মাফিক টাকা উড়িয়ে যাবে। তবু প্রতিবাদ করল, যাতে সাধন খানিকটা হলেও সাবধান হয়ে অপচয় বন্ধ করে।

সাধন একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝেছিল, বাবুর শরীরে প্লেগের বেসিলি প্রয়োগ করতে গেলে সবচেয়ে ভাল জায়গা কলকাতা। কারণ সে নিজে তো আর ওই বেসিলি প্রয়োগ করতে পারবে না, তার জন্য তাঁর ভাঁড়া করা কোনও তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন। তাই বাবুকে কলকাতায় আনা চাই। বাবু তখন পাকুড়ে আর রাণী সূর্যবতী দেবী ওদের যতীন দাস রোডের বাড়িতে। রাণী সূর্যবতী দেবীকে সাধন একদিন অনুরোধ করলেন বাবুকে কলকাতায় আনার জন্য, কিন্তু তিনি সাধনের অনুরোধের কোনও গুরুত্ব দিলেন না। এবং বাবুকে কলকাতায় আসার কথা বললেন না। সাধন

তখন অন্য পন্থা অবলম্বন করল। সে জানত রাণী সূর্যবতীর নামে যদি বাবুকে কলকাতায় আসার জন্য পাকুড়ে টেলিগ্রাম পাঠানো যায় তবে বাবু কোনও রকম চিন্তা ভাবনা না করেই সোজা কলকাতায় চলে আসবে। সাধন তাই-ই করল। সে রাণীর নামে পাকুড়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কলকাতায় আসতে বলল। টেলিগ্রামটা পেয়েই বাবু সেদিনই কলকাতার দিকে যাত্রা করল। পাকুড় থেকে বাবু ঊনিশে নভেম্বর কলকাতার যতীন দাস রোডের বাড়িতে এসে উঠল। কলকাতায় এসে বাবু জানতে পারল সূর্যবতী দেবী কোনও টেলিগ্রাম পাকুড়ে পাঠায় নি। তাকে অন্য কেউ টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কলকাতায় এনেছে। অন্যটা কে? সন্দেহের তির সাধনের দিকে ধাবিত হল। বাবুর কাছে সূর্যবতী দেবী সমস্ত ঘটনাটা জানার পর তিনি পাকুড়ে সব কর্মচারীদের জানিয়ে দিলেন তাঁর কাছ থেকে সবিস্তারে না জেনে কোনও টেলিগ্রামের ভিত্তিতে যেন কোন কাজ কেউ না করে।

সাধন জানত টেলিগ্রাম পেয়ে বাবু কলকাতায় আসবেই আসবে। সে তাই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিনগুণতে লাগল কবে নাগাদ বাবু কলকাতায় আসবে সেই সম্ভাবনার দিন। সে তাই যে দিন বাবু যতীন দাস রোডের বাড়িতে উপস্থিত হল সেদিনই ওই বাড়িতে গিয়ে সরেজমিনে দেখতে গেল তার অনুমান অনুযায়ী বাবু হাজির কি না। বাবুকে দেখে সাধন স্বভাবতই খুব খুশি হয়েছিল। যদিও তার কোনও বহিঃপ্রকাশ কেউ দেখল না। বাবু আর সাধন ওদের সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করল। সেখানে আলোচনায় হাজির ছিল বাবুর বড় দিদি, সাধনের আপন মায়ের গর্ভের বোন কাননবালার স্বামী আশুতোষ চক্রবর্ত্তী। আলোচনার পর বাবু ও আশুতোষ উঠে পড়ল। ওরা সম্পত্তির ব্যাপারে আলোচনার জন্য যাবে আইনজ্ঞের কাছে, সেটা সাধনের কাছে ওরা গোপন রেখেছিল।

একই গাড়িতে ওরা তিনজনে উঠে বেরিয়ে পড়ল। সাধন ক্যালকাটা হোটেলের সামনে নেমে পড়ল। ওখানে ওর জন্য তখন অপেক্ষা করছে ওর কলকাতার 'রাণী' রক্ষিতা বালিকাবালা।

বাবু তো আইন মাফিক সম্পত্তি ভাগ করতে চায়। যেমন তাঁর বাবা-কাকারা করেছিলেন। কিন্তু সাধন তো তা চায় না, সে তার বাবার সম্পূর্ণ সম্পত্তি ভোগ করতে চায়। সে বাবুর কলকাতা আগমনে খুশি হলেও যতক্ষণ না বাকি কাজটা সে করতে পারছে ততক্ষণ সে কিভাবে নিশ্চিন্ত হয়। পরদিনই বালিকাবালার মাধ্যমে একটা লোককে ঠিক করে ফেলল, যে বাবুর গায়ে প্লেগ বেসিলির বীজাণুটা ঢুকিয়ে দেবে।

বাবুও আশুতোষ আইনজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা সেরে বাড়ি ফিরে সেইদিনই ঠিক করল রাণী সূর্যবতী, বাবু আশুতোষ, সৎ দিদি কাননবালা ও ওদের মেয়ে অনিমা

ছাব্বিশে নভেম্বর হাওড়া স্টেশন থেকে দুপুর দেড়টার পাকুড় প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে পাকুড়ে চলে যাবে।

পরদিন সাধন আবার যতীন দাস রোডের বাড়ীতে হাজির, সেখানে কথায় কথায় আশুতোষের কাছ থেকে জানতে পারল, বাবু সমেত একদল ছাব্বিশে নভেম্বর হাওড়া স্টেশন থেকে পাকুড় প্যাসেঞ্জার ধরে পাকুড়ের উদ্দেশে যাত্রা করবে। সাধন তো এ সবই জানতে এসেছিল। বাবুর গতিবিধি ওর জানার দরকার। বাড়ির ভেতরে কোনও বাইরের লোক এসে ওকে বেসিলি প্রয়োগ করতে পারবে না। এর জন্য চাই ভিড়ভাট্টা বা কোনও ধরণের সমাবেশ, যেখানে কাজসেরে অনায়াসে হারিয়ে যাওয়া যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে ওটা আর কোথায় ভাল পাওয়া যাবে। কিন্তু তার জন্য আগে চাই ওই লোকটাকে বাবুকে চেনানো। যাতে কোনওরকম ভুল না হয়। ভুল হলেই সর্বনাশ। বাবুর বদলে অন্য লোকের মৃত্যু হয়ে যাবে। তাতে সাধনের কোনও লাভ তো হবেই না। এত কষ্ট করে প্লেগ বেসিলি যেটা জোগাড় করেছে, সেটাও যাবে আর দ্বিতীয়বারও ওরা আর সেটা আনতে পারবে না। কারণ বোম্বে থেকে বেসিলি নিয়ে ফেরার সময় তাঁরা সৌজন্যবশতঃ ডাক্তার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করেননি। যদিও ডাক্তার প্যাটেল বুঝতে পারেননি যে ওরা প্লেগ বেসিলি নিয়ে বম্বের থেকে চম্পট দিয়েছে।

সাধন সেদিন রাতে হোটেলে ফিরে ডাক্তার তারানাথের সঙ্গে আলোচনায় বসল। আলোচনায় ওরা ঠিক করল সাধন প্রতিদিনই অন্তত একবার যতীন দাস রোডের বাড়িতে যাবে, বাবুর যাতায়াতের ওপর নজর রাখতে। আর যে লোকটাকে ভাল পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সাধন ঠিক করেছে, বাবুর শরীরে প্লেগের বেসিলি ঢুকিয়ে দিতে তাকে ডাক্তার শিখিয়ে দেবে কি ভাবে, কোথায় ইঞ্জেকশনটা পুশ করতে হবে। ছক অনুযায়ী দু'জনে দু'জনের কাজ শুরু করল।

বাইশে নভেম্বর সাধন জানতে পারল বাবু রাণী জ্যোতির্ময়ী দেবীদের সঙ্গে পরদিন অর্থাৎ তেইশে নভেম্বর ভবানীপুরের পূর্ণ থিয়েটারের সান্ধ্য শোয়ে সিনেমা দেখতে যাবে। সাধন মনে মনে ঠিক করে নিল সেদিনই সে ওর ঠিক করা প্লেগ বেসিলি প্রয়োগকারীকে বাবুকে চিনিয়ে দেবে।

রাণী জ্যোতির্ময়ী দেবী, সাধন ও বাবুর কাকিমা। ওদের বাবা প্রতাপেন্দ্রের খুড়তুতো ভাই কুমার কালীদাসের স্ত্রী। তিনিও বাবুকে খুবই ভালবাসতেন। কুমার কালীদাস মারা যাওয়ার পর থেকেই তিনি টালিগঞ্জের বাড়িতে থাকতেন। পাকুড় রাজ স্টেটের ওর অংশীদারিত্বের থেকে ওর বছরে আয় হতো প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। বাবুর অসুস্থতার সময় তিনি বহুবার বাবুকে দেখতে গিয়েছিলেন।

কথা অনুযায়ী তেইশে নভেম্বর রাণী জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর বাড়ির আরও

অনেককে নিয়ে নিজের গাড়িতে চড়ে যখন পূর্ণ থিয়েটারের সামনে উপস্থিত হলেন তখনও বাবুরা সেখানে আসেনি। শো শুরু হতেও তখন খানিকটা দেরি। তিনি হলের সামনে বাবুদের জন্য অপেক্ষা না করে ওর গাড়ির ড্রাইভার রামজয়কে বাবুর জন্য নির্দেশ দিয়ে হলের ভেতর ঢুকে গিয়ে দোতলায় নিজেদের দর্শকাশনে গিয়ে বসে পড়েন।

জ্যোতির্ময়ী দেবী হলের মধ্যে প্রবেশ করার মিনিট পাঁচ সাত পরেই বাবু তার দিদি বনবালা ও ভাগ্নি অনিমাকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ণ থিয়েটারের সামনে তার গাড়িতে এসে হাজির এবং রামজয়ের কাছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর নির্দেশ শুনে সেও বনবালাদের নিয়ে হলেব ভেতর ঢুকে গিয়ে দর্শকাসনে জ্যোতির্ময়ী দেবীদের পাশে গিয়ে বসে পড়ে।

হলে ওরা ঢোকার পর জ্যোতির্ময়ী দেবীর গাড়ির ড্রাইভার রামজয় ও বাবুর গাড়ির ড্রাইভার গৌর, জ্যোতির্ময়ী দেবীর গাড়িতে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প করতে শুরু করল। তিন চার মিনিট পরেই ওরা দু'জন আশ্চর্য হয়ে দেখল সাধন একটা ট্যাক্সি থেকে হন্তদন্ত হয়ে নামল। ওর সঙ্গে একটা কালো শক্ত পোক্ত লোক যার পরণে ধুতি, গায়ে একটা খদ্দরের জামা। তাঁরা দু'জনে এদিক ওদিক কিছু জিনিস লক্ষ্য করতে লাগল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে তাঁরা একবার হলের সামনে আসছে আবার যাচ্ছে। এভাবে ঘোরাঘুরি প্রায় মিনিট দশ করার পর ওরা সেখান থেকে চলে গেল। রামজয় ও গৌর দু'জনকেই সাধন চিনত, ও ওদের দেখল কিনা তা ওরা বুঝতে পারল না।

রামজয় ও গৌর পাকুড় রাজ পরিবারের গণ্ডগোল সম্পর্কে সামান্য অবহিত হলেও সাধনের আগমনের হেতুর কারণ যে ভীষণ গভীরে সে সম্পর্কে কোনও আন্দাজ করতে পারল না। ওরা আবার নিজেদের আড্ডার মধ্যে ডুবে গেল। হলে তখন সিনেমা চলছে।

বাইরেও যে আর একটা বাস্তব ভিত্তিক সিনেমার পটভূমি রচিত হচ্ছে সেটা বোঝা গেল যখন রামজয়রা দেখল শো ভাঙ্গার আধঘন্টা আগে সাধন আবার সেই কালো লোকটাকে নিয়ে অন্য একটা ট্যাক্সি থেকে নামল। হলের দারোয়ানকে কিছু জিজ্ঞেস করল, তারপর একা হলের ভেতর ঢুকে গেল। মিনিট পাঁচেক পর বেরিয়ে এসে বাইরে পায়চারি করতে করতে হলের উল্টো দিকে চলে গেল। দু'জনে যে কিছু একটা জিনিস তীক্ষ্ণ ভাবে খেয়াল করছে তা রামজয়েরা বুঝতে পারলেও ব্যাপারটা ওরা পরিষ্কারভাবে কিছুই বুজতে পারল না। রামজয় আর গৌর সাধনদের আর দেখতে না পেলেও সাধনরা একটা দোকানের ভেতর ঢুকে একটা বেঞ্চিতে বসে হলের সামনের দিকে দৃষ্টি রাখল।

এক সময় শো ভাঙ্গল। কিন্তু ব্যবুরা ভিড় এড়াতে ওপরে অপেক্ষা করল। সাধন ও কালো লোকটা লক্ষ্য রাখছিল। ভিড় যখন একেবারে পাতলা হয়ে গেল জ্যোতির্ময়ী দেবী, সমেন বাবুরা একে একে বেরিয়ে এল। সাধন বাবুকে চিহ্নিত করে দিল। বাবুকে চেনাতে বিশেষ কিছু করতে হয় না। সুদর্শন, ফর্সা লম্বা সরল মুখের বাবুকে অনায়াসেই সবাই চিনে ফেলবে। হল থেকে বেরিয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর গাড়িতে তাঁর দলকে নিয়ে টালীগঞ্জে চলে গেলেন আর বাবু, বনমালা ও অনিমা তাদের গাড়িতে যতীন দাস রোডের বাড়িতে ফিরে গেলেন। সাধনও কাজ সেরে তার সঙ্গীকে নিয়ে চম্পট।

সাধনরা হোটেলে ফিরে গিয়ে তারা এবার সব কাজটা সমাধা করার জন্য পরিকল্পনার শেষ ধাপ সম্পূর্ণ করার জন্য অলোচনায় বসল। সাধন, তারানাথ ও কালো লোকটা আলোচনার শেষে ঠিক করল, তার পরদিন দুপুরে একটা-দেড়টা নাগাদ যখন পাকুড়ের প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়ে ওই নির্দিষ্ট সময়েই সাধন ও তার হাতিয়ার লোকটা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে বিচার করে সরগর হয়ে যাবে। যাতে ছাব্বিশ তারিখে ওরা সহজেই পরিস্থিতি মানিয়ে নিয়ে কাজটা সমাধা করতে পারে। আর ওই দিনই ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য ছোট ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জের প্লেগ বেসিলি ভরে ওই লোকটার হাতে দেবে, যেটা ওই লোকটা বাবুর শরীরের খোলা জায়গায় পুশ করে দিতে পারে।

ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো তেত্রিশ সালের সকাল। সাধন হোটেলে তার কলকাতার 'রাণী' বালিকাবালাকে একপাশে সরিয়ে ঘুম থেকে তাড়াতাড়িই উঠে পড়ল। আজ সেই দিন, যে দিনটার জন্য সে বহু দিন অপেক্ষা করছে। আজকের দিনটা তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী কাটলেই সবচেয়ে খুশি হবে সে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই পাকুড় স্টেটের একচ্ছত্রপতি হবে সে। একদিকে সে আনন্দিত, অন্যদিকে গভীরভাবে চিন্তিত। চিন্তার কারণ কাজটা ঠিক মত হবে তো? কোনও গন্ডগোল হবে না তো, তার লোকটা কাজটা করতে পারবে তো? ধরা পড়ে যাবে নাতো? ধরা পড়ে গেলে ওর নাম বলে দেবে না তো? চিন্তার কারণ এগুলিই। চিন্তার কারণগুলি সে প্রাণপণে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। অন্যদিন সকাল দশটার আগে সে বিছানা ছাড়ে না, তারপর আগের দিন রাতের নেশার ঘোর কাটিয়ে ওর দিন শুরু হয় বেলা বারটা নাগাদ। আজ সে ভোর বেলাতেই বিছানা ছেড়েছে, গত রাতে ভাল ঘুম হয়নি। আজ কাজটা সমাধা করতে পারলে তবে রাতে দারুণ মৌজ করবে। দশটার মধ্যে ডাক্তার তারানাথ ও কালো লোকটা হোটেলে চলে আসবে। ওরা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবে। তারপর তারানাথ সিরিঞ্জটা কালো লোকটাকে দিয়ে ভালভাবে বুঝিয়ে দেবে। বেলা বারটা নাগাদ ওরা বেরিয়ে যাবে। একটু আগেই

সাধন লোকটাকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যেতে চায়, পুর্ণ থিয়েটারের পুণরাবৃত্তি আর ও চায় না। তারানাথ ফিরে যাবে ওর কাজে। ও আবার তিনটে নাগাদ হোটেলে আসবে, কাজটা ঠিক মতো হল কিনা তা জানার জন্য। ওই সময় সাধন কালো লোকটাকে তার পারিশ্রমিক দেবে। সব ঠিক আছে, সাধনের মন তবু শান্ত নয় ঠিক ভাবে হবে তো?

তবু সাধন নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগল। নিজেকে শান্ত করল। নিজেকেই সে নিজে বলল, 'আজকের কাজটার জন্য বহুদিন তুমি অপেক্ষা করছ, তাই আজকে তোমাকে শান্ত, ধীর থাকতে হবে। তার চালচলনে যেন কেউ বুঝতে না পারে যে সে কোনও বিশেষ কাজে স্টেশনে হাজির। নিজেকে একেবারে স্বাভাবিক থাকতে হবে।

বারটার সময় ক্যালকাটা হোটেলে সাধন, তারনাথ ও কালো লোকটা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করল। সাধনের খাওয়াতে মন ছিল না। কোনও মতে শেষ করল। বালিকাবালা অনেকক্ষণ আগে চলে গেছে। তারানাথ সিরিঞ্জ দিয়ে গেছে। সেটা ঠিক মত রাখা আছে। সোয়া বারটায় সাধন কালো লোকটাকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে হাওড়া স্টেশনের দিকে ছুটল। আজকের অভিযান সফল করতেই হবে। তাহলেই সে মুক্ত। দেওঘরে টিটেনাস জীবাণু দেওয়ার মতো অবস্থাটা কিছুতেই হবে না। প্লেগ থেকে বাবুর মুক্তি হবে না।

যতীন দাস রোডে সেদিন সকাল থেকেই সাজ সাজ রব। গতরাতেও অনেক বাঁধাছাঁদা হয়েছে। পাকুড়ে যে সব জিনিস পাওয়া দুষ্কর সে সব বহু জিনিস কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যাওয়াই রাণী সুর্যবতী দেবীর নিয়ম। একটা একটা করে লটবহর প্রতিবারই বহু হয়। আবার কবে কলকাতায় আসবেন, জানেন না। তাই তিনি গুছিয়ে নিচ্ছেন সংসার। কলকাতায় সাধনের উৎপাত থেকে তিনি বাবুকে নিয়ে পাকুড়ে থাকতেই বেশি নিরাপদ মনে করেন। অবশ্য সাধন যে পাকুড়ে গিয়েও উৎপাত করবে না, সে বিষয়ে কোনও নিশ্চিন্ত নন। সাধনকে এখন কেউ বিশ্বাসই করে না। করবে কি করে, সে শুধু বাবুর বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে ক্ষান্ত নয়। নিজেদের বুন্দেল রোডের বাড়িতে, যেখানে ওদের ঠাকুরমা রাণী রাজলক্ষ্মী দেবী, নিজের স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে থাকে সেখানেও নিয়মিত যায় না। দেখাশোনা করে না। সে পাকুড়ে গেলে রক্ষিতা চঞ্চলাকে নিয়ে থাকে, আর কলকাতায় থাকলে ক্যালকাটা হোটেলে আর এক রক্ষিতা বালিকাবালাকে নিয়ে থাকে। এমনই অবস্থা যে ক্যালকাটা হোটেলের কর্মচারীরা বালিকাবালাকে জানে সে সত্যিকারের পাকুড় স্টেটের রাণী হিসাবে। সাধনও কাউকে বলে নি যে বালিকাবালা ওর শুধুমাত্র রক্ষিতা। ওর সঙ্গে অন্য কোনও সম্পর্ক নেই।

সাড়ে বারটার মধ্যে সাধন কালো লোকটাকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে চলে এল। লোকটাকে মেইন গেটের একপাশে দাঁড় করিয়ে সে স্টেশন চত্বরে এক চক্কর ঘুরে এল। যতীন দাস রোড থেকে কেউ এসেছে কিনা সেটা দেখে এল। না, এখন কেউ আসেনি। ট্রেন ছাড়তে এখনও এক ঘন্টা বাকি। টিকিট কাউন্টারেও কেউ নেই। নিত্যযাত্রীরা আনাগোনা করছে। দেহাতি কিছু লোক এখানে ওখানে বসে। একদল কুলি ক'টা গোরা সাহেব ও মেম সাহেবের জিনিস নিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটছে। দু'টো ট্রেণ দাঁড়িয়ে হুস হুস করে ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে দু'টো লাল মুখো গার্ড সাহেব কি সব মস্করা করছে। সাধনের চোখ সব দিকে ঘুরে গেল। আজ এখানেই তার এতদিনের সাধনার রূপ দিতে এসেছে। আস্তে আস্তে সে গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কথা মতো কালো লোকটা ষ্টেশন চত্বরে আর ওর সঙ্গে কথা বলবে না। কেউ কাউকে চেনে না। সাধন সাধনের কাজ করবে। ওই লোকটা ওর কাজ করে সোজা চলে যাবে স্টেশন ছেড়ে। তারপর তিনটের সময় পৌঁছে যাবে ক্যালকাটা হোটেলে পারিশ্রমিক নিতে। সাধন রাস্তার দিকে তাকিয়ে বাবুদের আগমণের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

দুপুর একটা, আশুতোষ চক্রবর্তী, বাবুর আর এক খুড়োতুতো দিদির স্বামী কমলাপ্রসাদ ও বাবুর কলকাতার বন্ধু অশোক মিত্র বাবুদের তিনজন গৃহস্থালী কর্মচারী বাবুদের মালপত্র নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে এসে স্টেশনের মুখে নামল। কর্মচারীরা মালপত্র সব গুছিয়ে স্টেশনের এক জায়গায় জড়ো করে পাহারা দিতে লাগল। আশুবাবু সকলের টিকিট কেনার জন্য বুকিং অফিসের সামনে যেতেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বুকিং কাউন্টারের সামনে সাধনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। আশুবাবু সাধনকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল।

কারণ সাধনের হাওড়া স্টেশনে আসার কোনও কারণই থাকতে পারে না। ওর সঙ্গে এখন কারও এমন সম্পর্ক নেই যে ও স্টেশনে এসে সবাইকে বিদায় জানাবে। ওকে কেউ পছন্দই করে না। এমন কি ওকে না দেখলেই সবাই সুস্থ বোধ করে।

আশুবাবুকে দেখে সাধনই একগাল হেসে এগিয়ে এসে বলল, "আমি একটু আগেই এসেছি। তোমাদের এত দেরি হল?"

আশুতোষ বলল, "হ্যাঁ, সবাই একটু পরেই এসে যাচ্ছি।" কথা বলতে বলতেই সে এগিয়ে গেল টিকিট কাউন্টারের সামনে। টিকিট কেটে সেগুলিকে দেবে কমলা প্রসাদকে। কমলাপ্রসাদ স্টেশনের গেটের সামনে অপেক্ষা করছে।

আশুতোষ টিকিট কেটে সরাসরি কমলাপ্রসাদের হাতে ওগুলি জমা করে কর্মচারীদের নিয়ে মালপত্র বুকিং করার জন্য এগিয়ে গেল, সাধনকে খুব একটা গুরুত্ব দিল না। যদিও সাধন ওর আপন শালা, বাবুর মতো সৎ শালা নয়।

একটা কুড়ি নাগাদ বাবু নিজেদের গাড়িতে রাণী সূর্যবতী দেবী ও অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে স্টেশনের সামনে এসে পৌছাল। ওদের গাড়ি থামতেই সাধন, কমলাপ্রসাদ ও অশোক গাড়ির সামনে এগিয়ে গেল। বাবুও আশুতোষের মতো স্টেশনে সাধনকে দেখে অবাক হয়ে গেল। ওর আগমণের কোনওহেতু খুঁজে পেল না। সাধন হেসে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে লাগল, বাবু হুঁ হ্যাঁ করতে লাগল। মহিলারা গাড়ি থেকে নামল। ওদের পৌছাতে দেরি হয়ে যাওয়াতে ওরা প্রত্যেকেই তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বাবু সবার আগে আগে, সাধন মহিলাদের সঙ্গে আস্তে আস্তে হাঁটছিল।

বাবু যখন বুকিং কাউন্টারের ঠিক সামনে তখন সাধন আর একটা ওর সঙ্গী সেই কালো, বেঁটে, শক্ত মতো লোকটাকে আর একবার ঈশারা করে বাবুকে সনাক্ত করে দিল। উপস্থিত অন্যেরা কিছুই বুঝল না। সাধনের আগমণের হেতুর অন্যতম কারণ হচ্ছে এই সনাক্তকরণ। ও চাইছিল লোকটা যেন তাঁর লক্ষ্য কোনও মতেই না ভুল করে। কোনও কারণে ভুল হলে সব দিক দিয়ে সর্বনাশ। এবার অপেক্ষা শেয কাজটুকুর। সব কিছুই পরিকল্পনা মাফিক সাজানো হয়ে গেছে।

বাবু স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে হাঁটতে নো এগজিট গেটের পাশ দিয়ে হেঁটে প্ল্যাটফর্মের দিকে যখন যাচ্ছে ঠিক তখনই সেই খদ্দরের জামা গায়ে সেই কালো বেঁটে সাধনের সঙ্গী লোকটা দ্রুত এসে বাবুর ডান হাতের পাতায় তারানাথের তৈরি করা প্লেগ বেসিলের ছোট সিরিঞ্জটা চট করে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা চাপ দিয়ে পলকের মধ্যে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বাবু ওর হাতে পিন জাতীয় কোনও তীক্ষ্ণ কিছুর ঢোকার ব্যাথা অনুভব করতেই চিৎকার করে সাধনকেই ডেকে উঠল। সাধন মহিলাদের সঙ্গে বেশ খানিকটা পেছনে পেছনে আসছে। ও সব কিছুই লক্ষ্য রাখছিল। কাজটা যে সারা হয়ে গেছে তা দেখে তার মন পুলকিত হয়ে গেল। কিন্তু বহিঃপ্রকাশ তো আর করতে পারে না। সে বাবুর চিৎকার শুনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে?" বাবু বলল, "একটা লোক কি একটা পিন ফুটিয়ে পালাল, এই দেখ।" সাধন দেখল, হাত দিয়ে জায়গাটা ঘষতে ঘষতে বলল, "ও কিছু না।" তারপর জলীয় যা কিছু হাতের পাতার ওপর ছিল সেগুলি বাবুর পাঞ্জাবির হাতা দিয়েই মুছে দিল। ব্যাপারটা তো একমাত্র ও জানে, ওগুলি কি, লোকটাই বা কে? কে এ কাজের সম্পূর্ণ ছক করেছিল।

বাবুর কেমন একটা অজানা সন্দেহ হতে লাগল, সে দৌড়ে গিয়ে কমলাপ্রসাদ ও অশোককে সব ঘটনাটা দ্রুত বলল। ওরা দু'জনেই ওর হাতের জখম জায়গাটা দেখল। আরও দেখল, চকচকে একটা জলীয় জিনিস চারপাশে লেপ্টে আছে। পাঞ্জাবির হাতায় লেগে আছে। ওদের দু'জনেরই কেমন একটা সন্দেহ হল। এই

রকম অস্বাভাবিক ঘটনায় ওরাও হতবাক হয়ে গিয়েছে। কি করবে, কি করা উচিত ওরা ভেবে পেল না। শেষ পর্যন্ত কমলাপ্রসাদ বাবুকে পাকুড়ে না গিয়ে কলকাতাতেই থেকে যেতে বলল। বাবু কিছুই বুঝতে পারছিল না। কমলাপ্রসাদ আবার তাকে কলকাতায় থেকে রক্ত পরীক্ষাও করতে বলাতে সাধন তখন কমলাপ্রসাদকে বকতে বকতে বাবুর হাত ঘষতে লাগল। তারপর ঘোষণা করল, "ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। এত ভয় পাওয়ার কি আছে?"

এদিকে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে আসছে। আশুতোষ মালপত্র বুকিং করে ট্রেনে তুলে দিয়েছে। ট্রেন ছাড়ার আগে ড্রাইভার যাত্রীদের সতর্ক করার জন্য দু'বার হুইশেল বাজিয়ে জানিয়ে দিল। ড্রাইভারের সহযোগীরা ইঞ্জিনের ফার্নেসে কয়লা তুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল।

বাবুর চোটের জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে। বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থা নেই। সাধন প্রায় ঠেলতে ঠেলতেই বাবুকে ট্রেনে তুলে দিল। বাবুর আগেই সব মহিলারা ট্রেনে উঠে গিয়েছিল। আশুতোষ কর্মচারীদের নিয়ে সব মালপত্র তুলে দিয়েছে। বাবু ট্রেনে ওঠার মিনিট খানেক বাদেই ট্রেন ছেড়ে দিল।-সাধন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ও জানে পাকুড়ে বাবুর কোন চিকিৎসারই সুযোগ নেই। প্লেগ বেসিলি ওর শরীর দখল করে বসবে।

কমলাপ্রসাদও অশোক বাবুকে ওই অবস্থায় পাকুড়ে পাঠাতে চায়নি। ওরা সাধনের সঙ্গে কোনও কথাই প্রায় না বলে হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। সাধন অন্যদিকে চলে গেল।

ট্রেনে উঠে রাণী সূর্যবতী দেবী, বনবালা, অনিমা, আশুতোষ সবাই বাবুর হাতের পিন ফোঁটার জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। বনবালা দেবীর কাছে টিনচার আয়োডিন ছিল, তিনি বাবুর হাতে টিনচার আইডিন লাগিয়ে দিলেন। বাবু একটা ছুরি খুঁজেছিল, যাতে জায়গাটা চিরে ফেলা যায়, কিন্তু ওদের কারও সঙ্গে ছুরি না থাকায় বাবু কিছুই করতে পারল না। অস্থির মন নিয়ে ওরা ট্রেনে চেপে পাকুড়ের দিকে চলতে লাগল।

সাধন প্রচণ্ড উল্লসিত মন নিয়ে ক্যালকাটা হোটেলে দুপুর দুটোর মধ্যেই ফিরে এল। তিনটের সময় আসবে তারানাথ আর কালো লোকটা টাকা নিতে। একে আজ প্রাণ খুলে সাধন টাকা দেবে। ও আজ একেবারে নিখুঁত কাজ করেছে। কাজ করে এত সুন্দর ভাবে গা ঢাকা দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে যে তা প্রায় কল্পনারও অতীত, সাধনের মন ভরে গেছে। আজ যে এত গুছিয়ে সব কাজটা হয়ে যাবে তা সাধন ভাবেনি। বাবুর মৃত্যু আসন্ন জেনেই সাধনের মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। আজ ও তারানাথদের নিয়ে খুব করে খাওয়া দাওয়া করবে। তারপর বালিকাবালা

তো আছেই। ক'দিনের মধ্যেই পাকুড় স্টেটের সব টাকাই ওর, আর কেউ ভাগীদার থাকবে না। কাউকে কোনও কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজনই থাকবে না। সব সম্পত্তির অধিকার একমাত্র ওর। একান্ত ওর ।

ট্রেনে যেতে যেতে বাবু রাণী সুর্যবতীকে বলেছিল, "এটা যদি কোনও দুর্ঘটনা হয় তবে বেঁচে যাব, আর যদি তা না হয় তবে এটা দাদার কাজ, দাদাই ষড়যন্ত্র করেছে আমাকে মারার জন্য।" রাণী সূর্যবতীর মনেও সন্দেহের দাগ একটা গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ট্রেন তার লক্ষ্যের দিকে হুস হুস এগিয়ে চলছে। শুধু সেই ট্রেনের যাত্রী বাবু ও তার সঙ্গীদের মনে কোনও শান্তি নেই। স্টেশনে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে ওদের মনের সব আনন্দের নির্যাস মুহূর্তে উবে গেছে।

তিনটে বাজার সময় ক্যালকাটা হোটেলে একে একে হাজির হল তারানাথ ও কালো লোকটা। সাধন কালো লোকটাকে চারশ টাকা দিল। যদিও তিনশ টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সাধন ওর ওপর এত খুশি হয়েছিল যে ওকে বকশিস হিসাবে আরও একশ টাকা বেশি দিল। এরপর তারানাথ আর সাধন ফূর্তি করতে বসল। তারানাথ ও সাধনের কাজ থেকে মোটা পারিশ্রমিক পেল। প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত ওরা ফূর্তি করল।

কমলাপ্রসাদ বাড়ি ফিরে এসেও হাওড়া স্টেশনের ঘটনাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। এটাকে সে কোন মতে স্বাভাবিক কোনও দুর্ঘটনা বলে ভাবতে পারছে না। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

বাবুর হাতে পিন জাতীয় কিছু ফোটার পর সাধনের ব্যবহারও কমলাপ্রসাদের ঠিক স্বাভাবিক লাগেনি। কমলাপ্রসাদ যখন বাবুকে ওই ট্রেনে পাকুড়ে যেতে নিষেধ করে বাড়ি ফিরে রক্ত পরীক্ষা করতে বলেছিল, সাধন তখন কমলাপ্রসাদের ওপর অস্বাভাবিক ভাবে রেগে গিয়েছিল, বলেছিল, "একটা ফালতু ঘটনা নিয়ে তিল থেকে তাল করা হচ্ছে। বেকার ওকে না যেতে দিয়ে ওর সময় নষ্ট করা হচ্ছে। বুদ্ধিসুদ্ধি কারও থাকলে ছোট একটা ব্যাপার নিয়ে এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে।" কমলাপ্রসাদ তখন চুপ করে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আর বাবুও ওই ট্রেনে পাকুড়ে চলে গেল।

কিন্তু বাড়ি ফিরে কমলাপ্রসাদ কিছুতেই দুশ্চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছেনা। সে শেষপর্যন্ত একদিন পরই বাবুকে চিঠি লিখে কলকাতায় এসে রক্ত পরীক্ষা করতে অনুরোধ করল, ঘটনাটা যে স্বাভাবিক তার মনে হয়নি সেটাও সে জানিয়েছিল।

বাবু কমলাপ্রসাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি। সে রবীন্দ্রনামে তার এক আত্মীয়কে নিয়ে উনত্রিশে নভেম্বর কলকাতায় এসে পৌছাল। সেদিনই বাবু সন্ধ্যে থেকে সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করতে লাগল। রাতের দিকে হু হু করে জ্বর

এসে গেল, প্রায় একাশ দুই ডিগ্রি। পরদিন বাবুকে তখনকার কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তের কাছে পরীক্ষা করতে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তার সেনগুপ্ত হাওড়া স্টেশনের ঘটনাটা শুনলেন। বাবুর হাতের যেখানে সিরিঞ্জ ফোটানো হয়েছিল সেখানে গোল মতো একটা চাক সৃষ্টি হয়েছিল। প্রচণ্ড ব্যাথা তিনি সেটাও ভালভাবে দেখলেন। পরীক্ষার পর তিনি বাবুকে কয়েকটা ওষুধ লিখে দিয়ে কলকাতাতেই থাকতে বললেন। তারপর তিনি তাঁর ভাগ্নে ডাক্তার সন্তোষ গুপ্তকে একটা চিঠি লিখে বাবুকে রক্ত পরীক্ষা করতে বললেন।

ডাক্তার সন্তোষ গুপ্ত নিজে বাবুর বাড়ি এসে তাঁর শরীর থেকে রক্ত নিয়ে গেল। কিন্তু রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আসার আগে বাবুর অবস্থা ক্রমাগত আরও অবনতি হতে লাগল। ডাক্তার নলিনী সেনগুপ্তের দেওয়া ওষুধ ওর কোনও কাজেই আসছিল না। আসবে কি করে? ডাক্তার সেনগুপ্ত তখনও বুঝতেই পারেননি বাবুর শরীরের অবনতির কারণ প্লেগ।

পয়লা ডিসেম্বর ডাক্তার সেনগুপ্ত ও ডাক্তার এল এম বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনে একসঙ্গে বাবুকে পরীক্ষা করলেন। তখন বাবুর হাতের পাতার চাকটা আরও ফুলে উঠেছে, ব্যাথাও আরও বেড়ে গেছে। জ্বরও কমেনি। তবু ওরা আরও কিছু ওষধ দিলেন। সেদিন রাতেই আবার ডাক্তার সেনগুপ্তকে এলাহাবাদ যাওয়ার জন্য ট্রেন ধরতে হল।

পরদিন রানী সূর্যবতী দেবী কলকাতায় এসে পৌঁছালেন। সেদিনই বাবুকে পরীক্ষা করলেন ডাক্তার এল. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়, তখনও রক্তের পরীক্ষার ফলাফল হাতে পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে বাবুর অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার রায় বাবুর অবস্থা ভাল অনুভব করেননি। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় রানী সূর্যবতীর কাছে হাওড়া স্টেশনের ঘটনার কথা শুনে সূর্যবতীদেবীকে বলেছিলেন পুলিশকে ঘটনার কথা জানাতে, কিন্তু বাবুর অবস্থা এমনই যে তাকে নিয়ে প্রত্যেকে এত ব্যতিব্যস্ত ছিল যে, পুলিশে খবর দেওয়া আর হল না। তাছাড়া রানী সূর্যবতী বোধ হয় পরিবারের মর্যাদার কথাটা চিন্তা করেছিলেন।

বাবুর শরীরের যখন এই হাল তখন সাধন কিন্তু একবারের জন্যও দেখা করতে এল না। কতটা অবনতি হচ্ছে, কোন কোন ডাক্তার ওকে দেখছে, সেই খবর রাখার চেষ্টা করতে লাগল গোপনে। বাবু যে ওর অস্ত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাতেই সে পুলকিত, যে দিনের জন্য তার এতদিনের পরিশ্রম। এতদিনের পতীক্ষা তা যে আসন্ন তা সে খুব ভাল ভাবে বুঝতে পারছে। কিন্তু কখন বাজবে তার আনন্দের ঘণ্টা এখন তারই অপেক্ষা, তার সময় গুজরান।

যে দিন ডাক্তার এল. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় বাবুকে পরীক্ষা করেছিলেন সে দিন অর্থাৎ ডিসেম্বরের দু'তারিখ রাতে ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য বাবুকে বাড়িতে এসে পরীক্ষা করতে করতে হাওড়া স্টেশনের ঘটনার কথা শুনে হঠাৎ মন্তব্য করে বসলেন," এটা বি. সি. পাণ্ডের কাজ, ওই লোকটাকে আমি ভালভাবেই চিনি।" তারপর বাবুকে পরীক্ষা করে বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারলেন, পৃথিবীতে বাবুর দিন শেষ হয়ে এসেছে। তবু তিনি উপস্থিত বাবুর আত্মীয় স্বজনদের বললেন," চিন্তার কিছু নেই, ভাল হয়ে যাবে, সুস্থ হয়ে উঠবে।" এই ধরনের আশ্বাসবানী অন্য কোনও ডাক্তার ওদের বলেননি। ডাক্তার ভট্টাচার্যের কথা ওদের অমৃতবানীর মতো শোনাল। ওরা তখন বাধ্য হয়ে ডাক্তার ভট্টাচার্যের ওপর আরও আস্থা রাখতে শুরু করল। বাবুর আত্মীয়রা ওকে অনুরোধ করল তিনি যেন বাবুর চিকিৎসার পুরো দায়িত্ব নেন। ডাক্তার ভট্টাচার্য ওদের কথা শুনে ওরই একজন সহকারী ডাক্তারকে বাবুকে প্রায় সর্বক্ষণ নজরে রাখার দায়িত্ব দিয়ে ওদের বাড়ি থেকে সেদিনের মতো চলে গেলেন। দায়িত্ব দিলে কি হবে, যে মারন রোগে বাবু আক্রান্ত তার তো কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না। রক্তের নমুনার পরীক্ষারও কোনও ফলাফল হাতে তখনও পাওয়া যায়নি। বড় বড় চিকিৎসকও সঠিক দিশা দিতে পারছেন না। যদিও ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত তার ভাগ্নে ডাক্তার সরোজগুপ্তকে রক্তের পরীক্ষা তাড়াতাড়ি করার জন্য বলেছিলেন। যদিও ডাক্তার সরোজ গুপ্ত ট্রপিক্যাল অফ স্কুলে চাকরিরত অবস্থায় বাইরের কোনও রোগীর রক্ত পরীক্ষা করতে আইনত পারেন না। তবুও তিনি সেটা করছিলেন। ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য বাবুর সঠিক চিকিৎসা করতে পারতেন কারণ তিনি জানতেন। ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য বম্বে থেকে সাধনের উদ্দেশ্যের জন্য প্লেগের জীবানু নিয়ে এসেছেন এবং সেটা যে বাবুর শরীরে প্রয়োগ করার জন্যই তা তিনি জানতেন আর হাওড়া স্টেশনে যে সেটাই ঘটেছে বাবুকে দেখতে এসেই তিনি সেটা বুঝে গেছেন। বাবুর হাতের পাতার ফুলে থাকা যন্ত্রনাদায়ক জায়গাটা পরীক্ষা করে তিনি মনে মনে নিশ্চিত হয়ে হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন যে, "এটা বি. সি. পাণ্ডের কাজ" তারপরই সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন এবং বাবুর আত্মীয়দের অভয়বানী শুনিয়ে তাঁর এক সহকারী অল্পবয়সী চিকিৎসককে বাবুর দায়িত্ব দিয়ে প্রায় পালিয়ে গিয়েছিলেন।

বাবুর অবস্থার উন্নতিতো দূরের কথা ক্রমশঃ ঘণ্টায় ঘণ্টায় অবনতির দিকে যেতে লাগল। ডাক্তার শিবপদ মোট চারবার বাবুকে দেখতে এলেন। রবিবার চার তারিখ রাতে এত সংকটপূর্ণ হয়ে গেল যে ডাক্তার শিবপদের সহকারী ডাক্তার আর ঘোষ তাড়াতাড়ি ডাক্তার শিবপদকে ডেকে আনতে বললেন। কিন্তু তিনি এলেন না। ভোর বেলায় বাবু ডাক্তার আর. ঘোষ-এর সামানেই মারা গেল। ডাক্তারদের সমস্ত

প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। বাবু সাধনের নিখুঁত ষড়যন্ত্রের শিকার হল। সাধনের জয় হল।

শোকে মুহ্যমান আত্মীয় স্বজন চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। সাধন ছাড়া বাবুকে প্রত্যেকেই খুব ভালবাসতো। রানী সূর্যবতীর অবস্থা সবেচেয়ে করুন। কারণ তিনি শিশু বাবুকে বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছিলেন। নিজের মা'র অভাব তিনি কোনও দিন বাবুকে বুঝতে দেননি। বাবুও সূর্যবতী দেবীকে মা বলেই ডাকতো। বাবুও একই ভাবে তাঁকে দেখত।

বাবুর মৃত্যুর খবর টালিগঞ্জ বুন্দেল গেটে ও ওদের কলকাতায় আত্মীয় বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হল। সাধন ছাড়া প্রত্যেকেই দ্রুত হাজির। যদিও সাধন সে রাতে ক্যালকাটা হোটেলে তার প্রিয়তমা রক্ষিতা নাটমন্দিরের বালিকাবালাকে ছেড়ে বুন্দেল গেটে নিজের স্ত্রীর কাছেই ছিল।

বাবুর আত্মীয়রা বাড়িতে উপস্থিত ডাক্তার আর ঘোষের কাছে বাবুর ডেথ সার্টিফিকেট চাইলেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে তিনি সেটা দিতে অস্বীকার করে, বললেন আমি দেব না, ওটা ডাক্তার ভট্টাচার্য্যই দেবেন, তারপর তিনি নিজেই বাবুর আত্মীয় পরেশ মিশিরকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্যের কৈলাস বসু স্ট্রিটে গিয়েছিলেন বাবুর ডেথ সার্টিফিকেট আনতে। ডাক্তার ভট্টাচার্য বোধ হয় তৈরিই হয়েছিলেন। তিনি ডাক্তার আর ঘোষের কাছে বাবুর মৃত্যুর সময়টা জেনে সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। রোগীকে মৃত্যুর পর না দেখেই, মৃত্যুর কারণ হিসাবে সাটিফিকেট লিখলেন, "সেপটিক নিউমুনিয়া।" এই মিথ্যে সার্টিফিকেট নিয়েই পরেশ, বাবুদের বাড়ি ফিরে এল, শ্মশানে বাবুর দেহ দাহ করার জন্য।

পরেশ বাড়ি ফিরে এসে দেখল বাবুর দিদি বনবালা কাননবালারা বাবুকে নতুন পাঞ্জাবি পরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মুখে সাদা চন্দনের টিপ পরাচ্ছে। বাবু নিশ্চিত মনে নতুন আনা খাটে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেয়ে ও যেন খুশি। সাধনের ছোবলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে সে যেন শান্তি পেয়েছে। বিলাপ সারা বাড়িটাকে গ্রাস করে আছে। উপস্থিত কোনও লোকই বুকফাটা বিলাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারবে না। পরেশ ডেথ সার্টিফিকেট আনার পর বাবুকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকে প্রস্তুত হল। ফুল মালা দিয়ে বাবুর খাট সাজানো হল। সম্পত্তির অধিকার ছেড়ে বাবু কেওড়াতলা শ্মশানে যেতে প্রস্তুত হল।

কিন্তু ঠাকুরমা রাজলক্ষ্মী দেবী 'মা' সূর্যবতী দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, দিদিরা, ভগ্নিপতিরা, ভগ্নি অনিমা ওকে ছাড়বে কি করে? ওদের দেখে মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবীটাই ওদের হাত থেকে আলগোছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাবুকে যে যেতেই হবে, যেতে হচ্ছে তাঁর দাদার জন্য। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে বাবু নিজেই বিরবির

করে ওই কথা সবাইকে বলেছে, "দাদার জন্যই আমার এই অবস্থা, দাদার জন্যই আমি মারা যাব, চলে যাব।" সেই চলে যাওয়ার সময় আসন্ন। সবার কাঁধে চড়ে দুলতে দুলতে পৃথিবীকে বিদায় জানাতে জানাতে, কাউকে দুঃখ দিয়ে কাউকে বা খুশি করে সে চলে যাওয়ার জন্য তৈরি। সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দিয়েছে দিদিরা। বিয়েতে যাওয়ার সময়তো সুযোগ পায়নি, তেমন সুযোগ সাধন তো দিল না। দেওয়ার ইচ্ছেও ছিল না। দিলে তার উদ্দেশ্যও সফল হতো না। নতুন উত্তরাধিকার এসে যেত। সাধন এত বোকা নয় যে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার একের বদলে আর এক বা একাধিক করে ফেলবে।

'হরিবোল' বলে শায়িত বাবুর দেহ নিয়ে খাট উঠে গেল আত্মীয় বন্ধুদের কাঁধে, বাড়ির বাইরে বেরিয়ে নেমে এল রাস্তায়, এগিয়ে চলল শ্মশানের দিকে। রাস্তার পথিকেরা হরি বোল শুনে একবার করে খাটের দিকে দেখছে, কেউ তা দেখে নমস্কার করছে, কেউ মুখ তুলে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে, তাঁরা তো জানে কি নিদারুণ কষ্টে কি মারাত্মক ষড়যন্ত্রের জালে ফেঁসে বাবুর এই গতি।

রাসবিহারী এভিন্যুর উপর দিয়ে চলেছে বাবুর শবযাত্রা। ট্যাক্সি থেকে সাধন নামল। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি ধুতি পরা সাধন শবযাত্রা দেখে খুশিতে উজ্জ্বল মুখ নিয়ে আবার ট্যাক্সিতে চড়ে চলে গেল কেওড়াতলার দিকে। শবযাত্রা পৌছানোর আগেই সাধন কেওড়াতলা শ্মশানের সামনে পৌছে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বাবুর শবযাত্রা এসে পৌছালে ; সাধনও শবযাত্রার পেছনে পেছনে শ্মশানে ঢুকে গেল।

এতদিন যে বাবু মৃত্যুশয্যায় যমদূতের সঙ্গে প্রতিমূহূর্তে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল ততদিন সাধনের মুখ কেউ বাবুর বিছানার পাশে দেখেনি। বড় বড় ডাক্তারদের হার মানিয়ে যমদূতেরা যখন বাবুকে নিয়ে চলে গেল তখনই সাধনের আগমন ঘটল।

শ্মশানে প্রায় প্রত্যেকেই দেখল সাধন খুশি মনে বহু মানুষের মধ্যে টাকা বিলোচ্ছে। তারপর দাহকাজ শেষ। আগেই নিয়ম অনুযায়ী হিন্দু মতে আচার অনুষ্ঠান ও গঙ্গাস্নান না করেই প্রায় নিঃশব্দে শ্মশান থেকে চলে গেল। কারও কারও মনে ওর এই আচরণ বিস্ময়কর লাগলেও অনেকের লাগেনি। ওর এই ধরনের মনোভাব দেখে অনেকের মনেই বাবুর শেষ দিকের উক্তিকে বিশ্বাসযোগ্যই মনে হতে লাগল। বাবু মৃত্যুযশ্যায় বারবার বলত," দাদা আমাকে বাঁচতে দিল না।"

বাবুকে তার আত্মীয় স্বজন উপস্থিত পুরুষেরা শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পর বাড়ির মহিলারা বিলাপের মধ্যেই ঠিক করে ফেলল যে তাঁরা আর এখন কলকাতায় থাকবে না, সেদিনই কলকাতা ছেড়ে পাকুড়ের দিকে যাত্রা করবে। কারও কোনও আপত্তি শুনবে না। বাবু ছাড়া আর একদিনের জন্যও এই বাড়িতে থাকতে পারবে না।

শ্মশান যাত্রী পুরুষেরা বাড়ি ফিরে এসে মহিলাদের সিদ্ধান্ত শোনার পর ওরাও কোনও কথা না বলে ওদের শোকের অন্তরঙ্গ অনুগামী হয়ে সেদিনই অল্প কিছু জিনিসপত্র নিয়ে পাকুড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। পেছনে পড়ে রইল খাঁ খাঁ বাড়ি, আগোছালো জিনিস আসবাব পত্র ঠিকানাবিহীন শোকাগ্রস্থ হয়ে। বাড়ির নিরবতার মধ্যেই যেন একটা বুকফাটা আর্ত চিৎকার লুকিয়ে অশ্রু ঝরিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে সাধন কারও কোনও খোঁজ খবর না নিয়ে চলে গেল ক্যালকাটা হোটেলে। সেখানে দুপুরের মধ্যেই চলে এল তার ভাইয়্যা ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য। যার সরাসরি কর্মকাণ্ডের জন্যই সাধন আজ তার উদ্দেশ্যে এতখানি সফল হয়েছে। সে কেন আজ আর খোঁজ নেবে রানী সূর্যবতী, বনবালা কাননবালা বা পরিবারের অন্যদের। এদের প্রত্যেকের গতি বাবুর মতো হলেও ওর কিছু যায় আসে না। সে শুধু বোঝে নিজেকে আর নিজের রিপুকে। আর তার আত্মসুখের জন্য চাই প্রচুর টাকা, সেই টাকাই যোগান দেবে পাকুড়স্টেট। আর কেউ নেই সেখানে অংশীদার। এই সুখের দিনের জন্যই এতদিন সে অপেক্ষায় ছিল। আর সেই অপেক্ষার অবসান হওয়ার মুহূর্তে সে কেন নেবে অন্যের খোঁজ? সে আজ ভাইয়্যা তারানাথ আর 'রানী' বালিকাবালাকে নিয়ে খুশির ফোয়ারা ছোটাবে।

পাকুড়ে পরিবারের মহিলা ও আত্মীয় বন্ধুরা পৌছালেও কারও মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। একদিনে বাবুর পারলৌকিক কর্মের আয়োজন শুরু করলেও, মৃত্যুটা যে স্বাভাবিক ভাবে হয়নি এ ব্যাপারে কারও মনে দ্বিমত নেই। হাওড়া স্টেশনের ঘটনা থেকেই যে বাবুর মৃত্যু পরোয়ানা জারি শুরু হয়েছে তাতেও কারও সন্দেহ নেই। তাই ওই ঘটনা যে কোনও আকষ্মিক ঘটনা নয় এ ব্যাপারেও তারা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু কি করে যে এই ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন হবে তা নিয়ে মহিলারা দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু দোষী শাস্তি পাক এটা ওরা মনে প্রানে চায়। কি করে? কি জন্যই কি রোগে বাবুর অকাল মৃত্যু হল তাও তখনও ওদের অজানা। রক্ত পরীক্ষার ফল যে এখনও পাওয়া যায়নি। রোগীর মৃত্যু হয়ে গেছে রহস্য জনক কারনে। যতক্ষণ পর্যন্ত না রক্তের নমুনার ফল জানা যাচ্চে তা রহস্যজনকই হয়ে থাকছে।

কিন্তু একজন নিঃশব্দে ট্রপিকাল স্কুলে বাবুর রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে যাচ্ছিলেন। তিনি ডাক্তার নলিনী সেনগুপ্তের ভাগ্নে এম. বি, ডি. টি. এম. ডিগ্রিধারী ও ট্রপিকাল স্কুলের গবেষনার কর্মচারী ডাক্তার সন্তোষ গুপ্ত।

ডিসেম্বরের চার তারিখ বাবুর মৃত্যু হলেও তিনি তাঁর কাজ থামিয়ে দেননি। তিনি বাবুর মৃত্যুর দু'দিনের মধ্যে অর্থাৎ ছ' তারিখ বাবুর রক্তের মধ্যে মরফোলজিক্যাল চরিত্রের পেস্টুরেল্যা পেস্টিস বা 'বি'-পেস্টিসের সন্ধান পেলেন। রক্তের মধ্যে এ ধরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের পর তাঁর মনে হল এটা প্লেগ ছাড়া অন্য কিছু

হতে পারে না। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে তাঁর ধারণাটা সঠিক কি না তা যাচাই করার জন্য তিনি ডাকলেন, ডাক্তার ডি. মনটি, ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার পাঁজা ও ক্যাপ্টেন পাশরিচাকে। তার আরও একটা কারণ ছিল, তিনি এর আগে কখনও বি, পেস্টিস্ এর আগে আবিষ্কার করেন নি। এরপর তাঁরা পাঁচজন মিলে আলোচনা করে ঠিক করলেন, এই সন্দেহজনক প্লেগ একটা সাদা ইদুঁরের শরীরে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হোক তাঁদের ধারণাটা ঠিক না বেঠিক। তারপর তাঁরা দ্রুত দরকারী পেপটন ওয়াটার কালচার তৈরি করলেন। কারণ ওই প্লেগ কালচার তরল করে না নিলে ইঞ্জেকশন দিয়ে ইঁদুরের শরীরে ঢোকানো যাবে না। পরদিনই এক সি-সি পেপটন জলে মেশানো ওই সন্দেহজনক প্লেগ একটা সাদা ইঁদুরের শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। একদিন পরই ইঁদুরটা মারা গেলে তার শববাবচ্ছেদ করা হল। আর মৃত ইঁদুরটার দেহে পাওয়া গেল প্লেগের জীবাণু। অর্থাৎ তাঁদের অণুমান সঠিকভাবেই প্রমাণিত হল। এরপর একেবারে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার জন্য ক্যাপ্টেন পাশরিচারের পরামর্শে এগারো তারিখ ওরা আবার একই পদ্ধতিতে তিনটে সাদা ইঁদুরের শরীরে ইঞ্জেকশন দিয়ে প্লেগ কালচার ঢুকিয়ে দিলেন। বারই ডিসেম্বর ওই তিনটের মধ্যে দু'টো ইঁদুর মারা গেল আর একটা প্লেগের কাছে হার মারল তার পরদিন। তিনটে ইঁদুরের শবব্যবচ্ছেদ করে জানা গেল প্লেগের অস্তিত্ব।

এরপর ডাক্তার সন্তোষ কুমার গুপ্ত বাবুর রক্ত পরীক্ষার ফল পাকুড় রাজ পরিবারের নিকট আত্মীয় রবীন্দ্রনাথ পানডে ওরফে নবু, যিনি যে কোনও বিপদে রাণী সূর্যবতীর পাশে থেকে সাহায্য করতেন এবং বাবুর অসুস্থতার সময় প্রচুর সাহায্য করেছেন, তাকে ডাক যোগ পাঠিয়ে দিলেন। পনেরোই ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ বাবুর রক্ত পরীক্ষার ফলটা হাতে পেয়ে জানতে পারলেন বাবুর মৃত্যু হয়েছে প্লেগের কারণে। অর্থাৎ হাওড়া স্টেশনে বাবুর হাতে যে পিন জাতীয় কিছু ঢোকানো হয়েছিল, তার মধ্যে দিয়েই বাবুর শরীরে প্লেগের জীবাণু পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলকভাবে।

অন্যদিকে ক্যাপ্টেন পাশরিচারও বাবুর রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট তৈরি করে তখনকার কলকাতার স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে জমা দিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, প্লেগ মহামারির আকার ধারণ করতে পারে এবং আঠারশো আটানব্বুই সালে কলকাতায় একশ বিরানব্বুই জন মানুষ প্লেগের আক্রমণে মারা গিয়েছিলেন। তারপর থেকে প্লেগের আক্রমণে মৃত্যুর কথা তিনি শোনে নি। হঠাৎ বাবুর দেহে কোথা থেকে প্লেগের জীবাণু ও পরিণামে মৃত্যু হল এবং সেটা যাতে মহামারির পর্যায়ে না যায় তাই ক্যাপ্টেন পাশরিচারের সতর্কবার্তা।

রবীন্দ্রনাথ পানডে বাবুর মৃত্যুর কারণ জানতে পেরে আর বসে থাকতে পারলেন

না। তিনি জানতেন বাবুর মৃত্যুর কারণ একটা চক্রান্তের ফসল এবং সেই চক্রান্তের নায়ক যে কে তাও তিনি প্রায় নিশ্চিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পানডের মনে পড়ল ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুকে পরীক্ষা করে এবং হাওড়া স্টেশনের ঘটনা শুনে প্রথমদিনই রাণী সূর্যবতীকে বলেছিলেন, ঘটনাটা পুলিশের গোচরে আনতে। কিন্তু সূর্যবতী দেবী নিজেই বাবুকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে তা আর তিনি করতে পারেন নি। এবার রবীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন, আর চুপ করে বসে থাকা উচিত নয়। কারণ বাবুকে যে হত্যা করা হয়েছে সে ব্যাপারে এখন তিনি নিশ্চিত। কিন্তু কিছু করার আগে সেটা রাণী সূর্যবতী দেবীকে জানানো দরকার। এবং তিনি সেটা করলেন। বাবুকে যে প্লেগের জীবাণু দিয়ে খুন করা হয়েছে তিনি সেটা ডাক্তার সরোজ কুমার গুপ্তের রিপোর্ট অনুযায়ী সবিস্তারে বললেন। রাণী সূর্যবতী দেবী বাবুর মৃত্যুর পর নিজেই এত শোকগ্রস্থ হয়ে গিয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ পানডেকে বাবুর মৃত্যু রহস্য উন্মোচন করে দায়ী লোকেদের বিরুদ্ধে যা যা করার দরকার তা করার অনুমতি দিতে এক মুহূর্তও সময় নিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ পানডে এরপর আর সময় অপচয় না করে পাকুড় রাজ পরিবারের পুরনো বন্ধু ও পাকুড় আদালতের আইনজীবী কালীদাস গুপ্তের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করলেন। তিনি ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই বুঝেছিলেন বাবুর মৃত্যুর জন্য প্রকৃত দোষী হচ্ছে সাধন। কালীদাসবাবু ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই বুঝেছিলেন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে প্রকৃত ঘটনা উন্মোচন করা দিন দিন কঠিন হয়ে যাবে। তাই তাঁরা আলোচনা করে ঠিক করলেন যত তাড়াতাড়ি পারে ওরা ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করবে। এই আলোচনার কথা রবীন্দ্রনাথ পানডে রাণী সূর্যবতীকে জানাবার পর ওরা ঠিক করলেন যা ব্যবস্থা নেওয়ার, যতটা গোপন রাখা যায় সেই চেষ্টাই করবেন। ওরা নিজেদের মধ্যেই একটা গোষ্ঠী ঠিক করলেন, যারা বাবুর আপন লোকই শুধু নয়, বাবুকে সত্যিই যারা ভালবাসতেন। এই গোষ্ঠী তৈরী হল রাণী সূর্যবতীকে প্রধান করে, রবীন্দ্রনাথ, বৈদ্যনাথ পানডে, বনবালা, আশুতোষ চক্রবর্তী, কমলাপ্রসাদ ও আইনজীবী কালীদাসবাবুকে নিয়ে। তারপর ওরা এই রহস্যের জাল উন্মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই গোষ্ঠীর মধ্যে রাখা হ'ল দু'জন আইনজীবীকে। একজন কালীদাস বাবু ও অন্যজন বাবুরই কাকা বৈদ্যনাথ পানডে। তিনি ভাগলপুর আদালতের আইনজীবী ছিলেন। তিনিও বাবুকে সাধন সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন এবং হাওড়া স্টেশনের ঘটনার দিন ওদের সঙ্গেই ছিলেন এবং তিনিও কমলাপ্রসাদের মতো সেদিন বাবুকে বলেছিলেন কলকাতা ত্যাগ না করে রক্ত পরীক্ষা করবার জন্য কলকাতায় থেকে যেতে। কিন্তু সেদিন সাধনের ধিক্কারে বাবুর এমনই অবস্থা হয়েছিল

যে, সে কমলাপ্রসাদ ও বৈদ্যনাথের কোনও সাবধানবানীই না শুনে পাকুড়ে চলে এসেছিল।

পর্দার আড়ালে যে এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে তা সাধন বুঝতে পারেনি। সে বাবুর মৃত্যুর পর একবার পাকুড়ে এসে কিছু টাকা নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে নিজের আনন্দে মত্ত হয়ে গেল, যদিও তাঁর মনে বাবুর রক্ত পরীক্ষার ফল কি বার হল তা জানার জন্য সবসময়ই কৌতূহলী ছিল, এবং এ বিষয়ে জানবার জন্য দু' একবার এদিক ওদিক ঘোরাঘুরিও করেছিল। কিন্তু কেউ তার সঠিক উত্তর দিতে না পারায় সে খানিকটা দুশ্চিন্তাগ্রস্থও হয়ে পড়েছিল। বাবুর পারলৌকিক কাজ পাকুড়ে খুবই শোকাবহ আবহাওয়ার মধ্যে শেষ হল। যদিও সেদিন সাধন অনুপস্থিতই রইল। সাধনের এই আচরণের মধ্যে কেউ আর অস্বাভাবিকতা দেখল না।

কালীদাসবাবুর পরামর্শ মতো উনিশসো চৌত্রিশ সালের দশই জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ দেখা করলেন দুমকার পুলিশের সুপরিটেন্ডের সঙ্গে। দেখা করে কালীদাস বাবুর লিখে দেওয়া একটা অভিযোগপত্র জমা দিলেন। সেই অভিযোগপত্রে বাবুর মৃত্যুরহস্য যেন ভালভাবে তদন্ত করে দেখেন তার জন্য প্রার্থনা করলেন। কমলাপ্রসাদও একইভাবে ডেপুটি সুপারিটেনডেন্টের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিলেন। তাছাড়া কলকাতার সি আই ডি কেও ঘটনার বিবরণ জানানো হল। কালীদাসবাবু প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে দেখা করে কিভাবে এই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করলেন। দুমকার এস-পি রবীন্দ্রনাথের আবেদনের উত্তর দিয়ে জানিয়েছিলেন তিনি যেন তাড়াতাড়ি কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযোগ জমা দেন। কারণ এই মামলার এক্তিয়ার কলকাতাতেই। এছাড়াও আশুতোষ চক্রবর্তীকে নিয়ে কালীদাসবাবু পনেরোই জানুয়ারি সাঁওতাল পরগনার ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের বাংলোতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাবুর মৃত্যুকে ঘিরে যে রহস্য তৈরি হয়েছে তা নিয়ে বিশদভাবে বললেন। তারপর তিনি সেই ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন কলকাতা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর একটা পরিচয়পত্র লিখে দেন। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রায়বাহাদুর এস সি মুখোপাধ্যায় কালীদাসবাবুর সব কথা শুনে পরদিনই ঘটনার বিরণ লিখে একটা চিঠি পাঠিয়ে দেন কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে এবং সেই চিঠির অনুলিপি একটা দিয়ে দেন কালীদাস গুপ্তকে। চিঠির অনুলিপি পেয়ে কালীদাসবাবু আর দেরি করেন নি, সোজা কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আঠেরোই জানুয়ারি কলকাতায় পৌঁছে লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার এস পি চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করেন।

মিঃ চক্রবর্তী কালীদাসবাবুর সব কথা শুনে তাকে পরামর্শ দিলেন বিস্তারিত

বিবরণ লিখে তিনি যেন ডি. সি. ডি. ডি-র কাছে জমা দেন। কালীদাসবাবু নিজে আইনজীবী, তিনি এ ব্যাপারে সবই জানেন, তিনি অভিযোগ লিখে কমলাপ্রসাদকে দিয়ে সেটা সাক্ষর করে জমা দিলেন। পুলিশ এটাই এফ-আই-আর হিসাবে গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করল। বাইশে জানুয়ারি অভিযোগ জমা দেওয়ার পর খুব গোপনে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতর তদন্ত শুরু করল। কমলাপ্রসাদের এফ আই আরের সঙ্গে বাবুর রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট, দুমকার পুলিশ সুপারকে দেওয়া রবীন্দ্রনাথ পানডের অভিযোগপত্র, সাধনের পাঠানো মিথ্যে নাম দিয়ে টেলিগ্রামের অনুলিপি, রাণী সূর্যবতীকে লেখা বাবুর চিঠির অনুলিপি ইত্যাদি।

ডি. সি. ডি. ডি. সেদিনই বাবুর হত্যার মামলার তদন্তের ভার দিলেন সাব ইনেসপেক্টর শরৎচন্দ্র মিত্রকে। শরৎবাবু ডি সি সাহেবের নির্দেশ পেয়ে তদন্ত শুরু করলেন পরদিন থেকেই। তিনি একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন আশুতোষ চক্রবর্তী, ডাক্তার লোলিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার সেনগুপ্ত, ডাক্তার সন্তোষ কুমার গুপ্ত, রাণী জ্যোর্তিময়ী দেবীকে। এরপর তিনি আটচল্লিশের বি কৈলাস বসু স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্যকেও জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। এছাড়া স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনের ডিরেক্টরের কাছে লিখিত ভাবে ক'টি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন।

তেরই ফেব্রুয়ারি ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদের খবর পৌঁছে গেল ডাক্তার তারানাথের কাছে। সে আর সময় নষ্ট না করে তার ভাইয়্যা সাধনকে পাকুড়ে টেলিগ্রাম করে দ্রুত কলকাতায় চলে আসতে বললেন। সাধন তারানাথের টেলিগ্রাম পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় চলে এল। তারানাথের কাছে টুকরো টুকরো খবর শুনে সে চলে গল ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত ও পরে ডাক্তার সন্তোষ গুপ্তের কাছে। ওদের দু'জনের কাছেই সাধন জানতে চাইল, গোয়েন্দা দফতর কি ধরণের তদন্ত শুরু করেছে এবং সেই তদন্তকারী অফিসারের নামটাই বা কি। এতদিন সাধন খুব সাবধানে একটা একটা করে পা ফেলে তার লক্ষ্যে পৌঁছালেও এখানে সে একটা ভুল করে বসল। কারণ ও যে ডাক্তার সেনগুপ্ত ও ডাক্তার গুপ্তের কাছে তদন্তের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে সেই খবরটাও পৌঁছে গেল লালবাজারে। সন্দেহের তীর আরও এতে ঘনীভূত হল।

এরপর ঘটনা দ্রুত ঘটতে লাগল। স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনের ডিরেক্টরের কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে শরৎবাবু তারপর তল্লাশি ও আসামিদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করতে শুরু করলেন।

দিনটা ছিল উনিশশো ছত্রিশ সালের ষোলই ফেব্রুয়ারি। সেদিনই শরৎবাবু আশুতোষ চক্রবর্তীর কাছ থেকে জানতে পারলেন সাধন সেদিনই নগদ চোদ্দশো টাকা ও

ব্যাঙ্কের চেক বই নিয়ে সকাল সাড়ে আটটার বোম্বে মেল ধরে বোম্বের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। ওর উদ্দেশ্য একটাই, বোম্বের যে সব সাক্ষীসাবুদ আছে; যেখান থেকে প্লেগের কালচার জোগাড় করেছিল, তাদের নিজের পক্ষে এনে মামলাকে লোপাট করা। কারণ সাধন নিজে যখন প্লেগের জীবাণু প্রথম খুঁজতে শুরু করেছিল তখনই ও ডাক্তারবন্ধুদের কাছ থেকে জেনেছিল প্লেগের জীবাণু পেতে গেলে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে নয় পশ্চিমাঞ্চল থেকে জোগাড় করতে হবে। তখনই সে জেনেছিল যে একমাত্র বোম্বের হাফকিন ইনস্টিটিউটে আঠারোশো ছিয়ানবুই সাল থেকে প্লেগ কালচার নিয়ে গবেষণা হয় এবং একমাত্র এই ইনস্টিটিউট থেকেই সরকারি অনুমোদনে কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য গবেষণাগারে প্লেগ কালচার পাঠানো হয়, কিন্তু কোনও ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানকে প্লেগ কালচার দিতে পারে না। আরও ব্যাপার ও জেনেছিল, বোম্বেরই আর্থার রোড হাসপাতাল হল একমাত্র হাসপাতাল যেখানে প্লেগের চিকিৎসা হয়। সেই কারণে, প্রয়োজনে ওই হাসপাতালে হাফকিন ইনস্টিটিউট থেকে প্লেগ কালচার পাঠানো হয়। আবার একইভাবে আর্থার রোড হাসপাতাল ওই ইনস্টিটিউট ছাড়া অন্য কাউকে প্লেগ কালচার হস্তান্তর করতে পারে না। সাধন আরও জেনেছিল, কানভূমা ভ্যালির গবেষণাগারে প্লেগের ওপর গবেষণা চালালেও সেখান থেকে প্লেগ কালচার পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তাছাড়া, হায়দরাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ ও পুনের প্লেগ হাসপাতাল থেকেও প্লেগ কালচার হস্তগত করার কোনও উপায় নেই। অর্থাৎ আর্থার রোড হাসপাতাল ও হাফকিন ইনস্টিটিউটই একমাত্র সম্ভাব্য দু'টো প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে প্লেগ কালচার পাওয়া যেতে পারে। এবং সাধনরা তাই করেছিল। আর যাদের সহায়তায় ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য ওটা করেছিল তাঁদের যদি টাকা ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে নিজের বশে এনে ফেলতে পারে, তবে বাবুকে যে ওরাই খুন করেছিল তার প্রমাণ করা পুলিশের পক্ষে দুঃসাধ্য। সেই কারণে সাধন দ্রুত বোম্বে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ষোলই ফেব্রুয়ারি বোম্বে মেলে যাত্রা শুরু করেছিল।

আশুতোষ চক্রবর্তীর কাছ থেকে শরৎবাবু সাধনের বোম্বের উদ্দেশ্যে যাত্রার খবরই শুধু পাননি, ট্রেনের কত নম্বর কোচে সাধনের টিকিট ও টিকিট নম্বরই বা কি সেটাও জানতে পেরেছিলেন। এই খবর জানার পর শরৎবাবু আর দেরি না করে তাঁর উর্দ্ধতন অফিসারদের সেটা জানাতেই তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বার্তা পাঠিয়ে দিলেন আসানসোল ও মোগলসরাই রেলওয়ে পুলিশকে। মেল আসানসোল পেরিয়ে গেলেও যাতে মোগলসরাইতে সাধনকে গ্রেফতার করা যায় তাই ওরা দু'টো স্টেশনেরই পুলিশকে বার্তা পাঠিয়ে দিলেন একসঙ্গে। ঘটনাচক্রে আইনজীবী কালিদাস গুপ্ত ওই ট্রেনেই বোম্বে যাচ্ছিলেন। সেটাও আশুতোষবাবু শরৎবাবুকে জানিয়েছিলেন। শরৎবাবু

রেলওয়ে পুলিশকে যে বার্তাটা পাঠালো তাতে তিনি বললেন, 'বি সি পানডে নামক এক ব্যক্তি বোম্বে মেলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে বোম্বের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। টিকিট নম্বর শূন্য দুই পাঁচ সাত। কোচ নম্বর তিন এক চার নয়। তাঁর রঙ ফর্সা। তার চেহারা বলিষ্ঠ ও লম্বা। তাকে চিহ্নিত করতে পারবেন কালীদাস গুপ্ত নামক এক আইনজীবী, যিনি ওই ট্রেনের ওই নম্বরের কোচের পাশের কোচে বোম্বে যাচ্ছেন। কালীদাসবাবুর চোখে চশমা আছে, তাঁর গায়ের রঙ কালো। ওই বি. সি. পানডে এক খুনের মামলার আসামি, তাকে যেন গ্রেফতার করা হয়। শুধু টেলিগ্রামের ওপর ভরসা না করে শরৎবাবু হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে রেল পুলিশের সাহায্যে নিজে আসানসোল রেল পুলিশকে টেলিফোনে সাধনকে গ্রেফতার করতে অনুরোধ করার সময়ই জানতে পারলেন ট্রেন তখনও আসানসোল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে এবং আসানসোল রেল পুলিশ থেকেই শরৎবাবুকে বলা হল, তিনি যেন হাওড়া স্টেশনেই অপেক্ষা করেন, যাতে আসানসোলে সাধনকে গ্রেফতার করতে পারবে, সেই খবরটা তাঁরা হাওড়া স্টেশনেই শরৎবাবুকে দিতে পারেন এবং ঘটনা ঘটলও তাই।

খবর পেয়েই রেলপুলিশের অ্যাসিস্টেন্ট সাব ইন্সপেক্টর মিঃ মোল্লা, এ এস এম মি সূতন, হেড টিকিট কালেক্টর এস দে, টিকিট কালেক্টর ডি সি চক্রবর্তী, কনেস্টবল দুলারি ও রামদয়াল সিংকে নিয়ে স্টেশনে অপেক্ষমান তিন আপ বোম্বে মেলের দিকে গিয়ে প্রথমে কালীদাস গুপ্তকে ধরে। তাকে অনুরোধ করলেন পাশের কোচে গিয়ে বি সি পানডেকে সনাক্ত করে দিতে। কালীদাসবাবু এক কথায় রাজি। কারণ তিনিও যে বাবুর হত্যার কিনারা করার জন্য যে পারিবারিক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, তার সদস্য। কালীদাসবাবুই সাধনকে সনাক্ত করে দিলেন। রেলপুলিশ সাধনকে গ্রেফতার করে জি আর পি থানায় নিয়ে গেলেন আধঘন্টার মধ্যেই আসানসোল রেলওয়ে পুলিশ থেকে শরৎবাবুকে জানানো হল ওরা বিনয়েন্দ্র পানডে ওরফে সাধনকে গ্রেফতার করেছেন।

পরদিন সকালবেলাতেই কথা অনুযায়ী আসানসোলের রেলওয়ে পুলিশ লালবাজারে শরৎবাবুর হাতে সাধনকে হস্তান্তরিত করে চলে গেলেন। সেদিনই সাধনকে আদালতে হাজির করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের থেকে ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য, ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য ও ডাক্তার দূর্গারতন ধরকে গ্রেফতার ও ওদের বাড়ি তল্লাশির পরোয়ানাও বার করে নিলেন। সেদিন রাতেই গোয়েন্দা দফতরের অফিসাররা ওদের বাড়ি তল্লাশি করে গ্রেফতার করতে বেরিয়ে পড়লেন। শরৎবাবু ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্যের তের নম্বর টেগর ক্যাসেল স্ট্রিটের বাড়ি ও সাত নম্বর বৈষ্ণবচন্দ্র শেঠ লেনের চেম্বার তল্লাশি করলেন, কিন্তু কোনও জায়গাতেই তাকে না পেয়ে শরৎবাবু তাঁর বাহিনী নিয়ে লালবাজারে ফিরে এসে দেখলেন আর এক অফিসার

পবিত্র কুমার দত্ত ডাক্তার দূর্গারতন ধরকে তাঁর উনসত্তর বি সিমলা স্ট্রিটের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে এসেছেন।

শরৎবাবু থাকতেন আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার কোয়ার্টারে। পরদিনই ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য ওই থানায় শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। শরৎবাবু ওখানেই ডাক্তার তারানাথকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তারানাথ সব অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, জীবনে কোনওদিন বোম্বে দেখেন নি। সুতরাং সাধনের কথা মতো বোম্বে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া তিনি পরিষ্কারভাবে জানালেন যে প্লেগ কালচার নিয়ে তার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।

মামলাটার গভীরতা বুঝে ডি সি ডি ডি একুশে ফেব্রুয়ারি নির্দেশ দিলেন সাব ইনেস্পকটর শরৎ কুমার মিত্রকে শুধু সাহায্য নয়, মূল তদন্তের ভার তুলে দিলেন গোয়েন্দা দফতরের ইনেসপক্টর মহম্মদ লুৎফার রহমানের হাতে। দায়িত্ব নিয়েই লুৎফার রহমান ও শরৎবাবু তদন্তের কাজে আরও জোর দিলেন। পাকুড় থেকে গ্রেফতার করে আনলেন সাধনের দুই রক্ষিতা বালিকাবালা ও চঞ্চলাকে। গ্রেফতার করলেন সাধনের সঙ্গী মন্মথ বক্সি, বীরেন্দ্রনাথ পানডে ও কালীকিঙ্কর মিত্রকে। এরা প্রত্যেকেই আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে গেল।

মামলাটা ঠিক মতো সাজানোর জন্য, এই মামলার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকেরই বয়ান নথিভুক্ত করা হল।

এই মামলার একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আছে বোম্বে শহরে। কলকাতা পুলিশের অনুরোধে বোম্বে পুলিশের তরফে ইনেসপেক্টর বাবু নারায়ণ পুরুষোত্তম ওয়াগলে তদন্ত শুরু করেছিলেন। তিনি রয়াল পঞ্জাব হোটেল থেকে রতন সালারিয়া ও মিঃ কে ডি গুপ্তকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করলেন। বিশে ফেব্রুয়ারী, মিঃ ওয়াগলে হাফকিন ইনস্টিটিউটে গিয়ে দেখা করলেন। ডাক্তার নাগরাজন, ডাক্তার শেঠী ও ডাক্তার নাইডুর সঙ্গে এবং তাঁদের অফিসের কাগজ পরীক্ষা করলেন। মিঃ ওয়াগলেকে সাহায্য করার জন্য কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের সাব ইনেসপেক্টর পবিত্রকুমার দত্তকে বোম্বে পাঠানো হল। এরপর ওরা দু'জনে মিলে আর্থার রোড হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার মেহেতা ও ডাক্তার প্যাটেলের বয়ান লিখলেন। তাছাড়া তাঁরা আলী আব্বাস, আত্মা সিং, ইরানি, জান মহম্মদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদেরও বয়ান লিখে নিলেন। বোম্বের যে সব হোটেলে সাধন ও ডাক্তার তারানাথ প্লেগ কালচার জোগাড় করার জন্য ছিলেন, সেই ওরিয়েন্ট হোটেলে ও সি ভিউ হোটেলের রেজিস্টার্ড দেখে সেগুলিও বাজেয়াপ্ত করলেন। তদন্ত শেষ করে বিভিন্ন সময়ের চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও হোটেল রেজিস্টার্ড ইত্যাদি নিয়ে পবিত্রবাবু কলকাতায় ফিরে এলেন।

ডাক্তার শিবপদ ইতিমধ্যে লালবাজারে এসে গোয়েন্দা দফতরে এক লিখিত বক্তব্য পেশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্য শেষ পর্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মনে না হওয়াতে, শেষ পর্যন্ত চব্বিশে মার্চ পুলিশ ওকেও গ্রেফতার করল। কিন্তু সাধনের যে সাকরেদ বাবুর হাতে হাওড়া স্টেশনে ইঞ্জেকশান দিয়ে প্লেগের জীবাণু ঢুকিয়েছিল তাকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজলেও কিছুতেই গ্রেফতার করতে পারল না। সাধন কোনও কথাই স্বীকার করেনি। পুলিশকে সাহায্য করা তো দূরের কথা। মামলাটার চরিত্র দাঁড়ালো পারিপার্শ্বিক নথিপত্র, ও সেই সংক্রান্ত সাক্ষীর উপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ খুনের সাক্ষী তো কেউ নেই। বাবুকে যে ষড়যন্ত্র করে খুন করা হয়েছে সেটা প্রমাণ করাই এ মামলার শেষ কথা। খুন করা হয়েছে প্রমাণিত হলেই সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে কে বা কারা তাকে এইভাবে খুন করল। তাই মামলার নথিপত্র, তথ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থান ও ঠিক স্থানে ঠিকমতো সাক্ষীর বিবরণই এই নিপুন ষড়যন্ত্র প্রমাণ করা সম্ভব। এখানেই দক্ষতা দেখাতে হবে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ও তার সহযোগীদের। সেইজন্য তদন্তকারী মূল অফিসার লুৎফার রহমান, শরৎকুমার মিত্র, পবিত্রকুমার দত্ত, ইনস্পেক্টর জে. এন. লাহিড়ী শুধু কলকাতা বা বোম্বে নয়, পাকুড়, দেওঘর, পাটনা, ভুবনেশ্বর, কটকে ঘুরে ঘুরে সমস্ত সাক্ষীদের বয়ান লিখে ফেললেন। দ্রুত ঘটনার তদন্ত একসঙ্গে না করলে, যাবতীয় নথি তছনছ হয়ে গেলে এই ধরনের পরিকল্পনামাফিক, জটিল খুনের মামলা যে আদালতে প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে তা তদন্তকারী অফিসাররা ভালই বুঝেছিলেন বলে তাঁরা সামান্যতম সময়ও অপচয় না করে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন।

তদন্ত শেষ হওয়ার পর মার্চ মাসে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সাধন, ডাক্তার তারানাথ, ডাক্তার শিবপদ ও ডাক্তার দূর্গারতন ধরের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল। এরপর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কে. এ. তৈয়ব সাহেব সমস্ত নথি দেখে ও বাহাত্তর জন সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে উনিশশো চৌত্রিশ সালের একুশে মে দায়রা আদালতে সোপর্দ করলেন।

এরপর আলিপুরের দায়রা বিচারপতি টি. এইট. এলিসের আদালতে জুরির বিচার শুরু হল। কলকাতা ও বোম্বের সাক্ষী, বহু নথি দিয়ে সরকার পক্ষ থেকে আসামিদের বিরুদ্ধে বাবুকে খুন ও খুনের জন্য ষড়যন্ত্র প্রমাণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করার পর উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ষোল তারিখ রায় দানের দিন ধার্য হল। পত্রপত্রিকায় এই মামলার বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হওয়ার ফলে রায়দানের দিন আদালতে রায় শোনার জন্য বিশাল জনসমাগম হল। অধীর আগ্রহে তাঁরা বিচারপতির রায় জানার জন্য কেউ আদালত কক্ষে কেউ বা সেখানে জায়গা না পেয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। জুরি মহোদয়গণ তাঁদের শীর্ষ জুরির মাধ্যমে তাদের রায় বিচারপতি এলিস সাহেবকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। বিকেল চারটে কুড়ি

মিনিট নাগাদ বিচারপতি জুরিদের নিয়ে আদালতে রায়দানের জন্য প্রবেশ করে যে যাঁর আসনে বসলেন। আসামি চারজন কাঠগড়ায় বসে আছে। আইনজীবিরা তাদের আসনে। বিচারপতি আসন গ্রহণ করার পর আদালত একেবারে নিশ্চুপ। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেরও কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আলিপুর দায়রা আদালত চত্বরের বিশাল বিশাল গাছগুলিও ফাল্গুনের প্রথম দিনের হাওয়া গায়ে না মেখে হঠাৎ যেন ঠায় দাঁড়িয়ে গেল। যেন জানতে চায়, বাবুকে যে সত্যিই খুন করা হয়েছিল তার প্রমাণ কি পুলিশ আদালতে দিতে পেরেছে? না দিতে পারলে তো আসামী মুক্তি পেয়ে যাবে। ড্যাঙ ড্যাঙ করে সাধন আবার চলে যাবে চঞ্চলা বা বালিকাবালার কাছে। বিনোদনের সাগরে ভাসবে। আর বাবুর সম্পত্তি ও মৃত্যুর মূল্যে গড়ে উঠবে বালিকাবালাদের জন্য প্রাসাদ।

আদালতের নিস্তব্ধতা শেষ করে বিচারপতি জুরিদের কাছে জানতে চাইলেন "আপনারা সবাই একমত হয়ে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?"

তাঁরা বললেন, "হ্যাঁ," তারপর বিচারপতি প্রত্যেক আসামিদের নাম ধরে ধরে আলাদাভাবে তাকে কি ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং সেই ধারা অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে কি কি সিদ্ধান্ত জুরিরা নিয়েছেন সেই সম্পর্কে তাঁদের মতামত কি, একই নাকি, তাও জানতে চাইলে জুরিরা বিচারপতিকে জানিয়ে দিলেন, হ্যাঁ সেই ব্যাপারেও তাঁরা সহমত পোষণ করেই তাঁরা তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।

জুরিদের মতামত শোনার পর বিচারপতি এলিস সাহেব তাঁর রায় পড়ে শোনাতে শুরু করেন। স্বাভাবিকভাবেই আদালতকক্ষে তাঁর কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

বিচারপতি পড়তে শুরু করলেন, "জুরিগণের সঙ্গে একমত হয়ে আমি তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছি। যদিও আমি দোষী আসামিদের প্রতি তাঁরা যে ক্ষমা প্রদর্শন করতে বলেছেন তা মেনে নিচ্ছি না। যেভাবে সম্পূর্ণ ঠান্ডা মস্তিষ্কে নিপুন ও অকল্পনীয়ভাবে হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হয়েছে তা এক কথায় অচিন্তনীয়। সেদিক থেকে দেখে দোষী আসামিদের প্রতি কোনওরকম ক্ষমা না দেখিয়ে, এই আদালত তাদের সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। আসামি বিনয়েন্দ্র চন্দ্র পানডে ও আসামি তারানাথ ভট্টাচার্যকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে এবং যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু হয় ততক্ষণ ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এবং এই দন্ডাদেশ মহামান্য হাইকোর্টের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কার্যকর করা যাবে না। সেইজন্য এই দু'জন দণ্ডিত আসামিকে সাতদিনের মধ্যে মহামান্য হাইকোর্টের কাছে যথাযথভাবে আপিল করার জন্য আদালত আদেশ দিচ্ছেন। আদালত আসামি দূর্গারতন ধর ও আসামি শিবপদ

ভট্টাচার্যকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দিচ্ছেন। জুরিমহোদয়গণকেও তাঁদের কাজ থেকে অব্যাহতি দিচ্ছেন।”

ডাক্তার দূর্গারতন ধর ও ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য আলিপুর দায়রা আদালত থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি চলে গেলেও, সাধন ও তারানাথ ভট্টাচার্যের জায়গা হল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ফাঁসীর আসামিদের রাখার জন্য বিশেষ সেলে। সেলগুলির সামনেই ফাঁসীর মঞ্চ। তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের তুমুল যুগ। জেলগুলিতে ভর্তি বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী। জেলগুলির সেল থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি। আর তারই মধ্যে স্থান পেল সাধনের মতো নীচ প্রবৃত্তির আসামি। তাদের মনে ‘দেশ’ নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা ভাবনা নেই। নিজের বিনোদনের ফোয়ারার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ভাইকে খুন করার জন্য রয়েছে সবরকমের জল্পনা কল্পনা। তারই মধ্যে ডুবে ছিল তারা।

সাধন ও তারানাথ আলাদা আলাদাভাবে দায়রা বিচারপতির আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করল। তারানাথের আপিল পৌঁছাল বাইশে ফেব্রুয়ারি, আর সাধনের আপিল জমা পড়ল পঁচিশে ফেব্রুয়ারি।

কলকাতা হাইকোর্টে এই আপিলের শুনানি শুরু হয়েছিল ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে বিচারপতি লর্ড উইলিয়ামস ও বিচারপতি নাসিম আলির ডিভিশন বেঞ্চে। বিচারপতিরা উনিশশো ছত্রিশ সালের দশই জানুয়ারি তাঁদের রায় শোনাল। তাঁরা আসামি দু'জনের ফাঁসীর আদেশ রদ করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। এই চাঞ্চল্যকর মামলার এখানেই ইতি হয়েছিল।

জীবন পরিবর্তিত হচ্ছে সময়ের সঙ্গে তাল ঠুকে। কে কত দিক এগিয়ে যেতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। নতুন শতাব্দীতে পা রেখে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে এই আমাদের কলকাতা শহরের পরিবর্তন দেখেও সময়ের রং দেখে মাঝে মধ্যে আশ্চর্য হই বইকি। পুলিশের চাকরির দৌলতে অপরাধীদের পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে সময়ের রঙের পরিবর্তিত চমকের তাল কখন যে কত কত বৈচিত্র্য এনেছে তাও অগোচরে রয়ে গেছে। কিন্তু মানুষের ভেতরের লোভও কি রঙের পরিবর্তনের সঙ্গে বিচিত্র হয়নি? হয়েছে। লোভ আরও বেড়েছে, সঙ্গে অপরাধ বেড়েছে। স্বাধীনতা পূর্বোত্তরেই আমরা দেখলাম সাধন লোভের দাসত্ববৃত্তি করতে গিয়ে বাবুকে খুন করেছেই শুধু নয়। সে প্রায় নিখুঁতভাবে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে, সেটাই প্রয়োগ করেছে। উত্তর স্বাধীনতার যুগেও আমরা কখনও বিজ্ঞানের আরও নিখুঁত প্রয়োগ কিংবা একেবারে কৌশলহীন প্রয়োগ দেখেছি, অপরাধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কলকাতায় এলাকাভিত্তিক দাদাগিরির অপরাধ শুরু হয়েছিল পঞ্চাশেরই দশকে, তার বিস্তৃত রূপ আকার নিয়েছিল কংগ্রেসী আমলেই, ষাটের দশকে। কমিউনিস্ট তখন ক'জনই বা ছিলেন। আর যারা ছিলেন আইনের চোখে তাঁদের অপরাধগুলিও ছিল কোনও না কোনও আন্দোলন ভিত্তিক। আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই অপরাধ। দাদাগিরি বা রাজত্বের ধারণা তাঁদের মধ্যে তখন ছিল না। এলাকায় এলাকায় তাঁরা নিপাট ভাল মানুষ, যাদের এড়িয়ে চলাই ছিল সাধারণ মানুষের নিয়ম। ধান্ধাবাজির শিকড় তাঁদের মধ্যে গেড়ে বসেনি। বসার প্রশ্নও তখন ছিল না। কারণ ক্ষমতার কেন্দ্রে না আসলে ধান্ধার খেলার বাঁশি বাজে না। আর এই খেলায় যারা ওস্তাদ তাঁরা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যারা থাকে তাদেরই গায়ের পাশে যাওয়ার জন্য প্রাণপাত করে। অর্থ উপার্জনই এদের এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। ভোগবাদই এদের দর্শন, ভোগই একমাত্র ধ্যান। বিনাশ্রমে উপার্জন ও ভোগ করার জন্য তাই এরা শুরু করে দাদাগিরি, আর এইসব দাদাদের কাজে লাগিয়ে ভোটের তরী পার হওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি এদের কাজে লাগায়, এমনকি, সত্তরের দশকে তো এই ধরনের অনেক দাদা রাজনৈতিক নেতা বনে গিয়েছে। কয়েকজন এম. এল. এ., এম. পিও হয়েছে। মন্ত্রীও হয়েছে। এটা শুধু আমাদের পশ্চিমবাংলারই চিত্র নয়। সারা ভারতবর্ষেরই চিত্র। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে। ওখানে সরকার গড়া ও তাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা করার সমস্ত কারিগরই 'দাদাদের' হাতে। ওরাই ওখানে বিভিন্ন রূপে গড়্‌ফাদার। আজকে

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পুলিশেরও একাংশ এই সব 'দাদাদের' লেজুরবৃত্তি করে, তাঁদের হুকুম মতো কাজ করে। আমাদের দেশ একটা অদ্ভুত জায়গা। আমরা ভারতীয়রা বড় বেশি আবেগপ্রবণ। আমরা এই সব বিভিন্ন রূপধারী দাদাদের মিথ্যাচার গুলিকে হজম করে সহজেই সেটা সত্য ভেবে বসি। বাস্তবের কষ্টিপাথরে ফেলে কখনও যাচাই করে দেখিনা, কোনটা সত্য আর কোনটা নির্ভেজাল মিথ্যা। ওদের কলঙ্কের দায় আমরাও বয়ে পরোক্ষে নিজেদের দোষী করে ফেলি। সমাজ জীবনের এই সব অপরাধকে সহ্য করে আমরা নিজেরাই কি অপরাধী হয়ে যাই না? যে সব লোকেদের জেলে থাকা উচিত তারা যদি মন্ত্রীর মসনদে বসে দেশ চালায় তারজন্য কি আমরাও বহুলাংশে দায়ী নই? দাদাদের এই বিপুল শক্তির স্তম্ভ বানানোর পরোক্ষ শ্রমিক কি আমরা নই? জ্ঞানকে নয় অজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়ার দোষে কি আমরা দোষী নই? তথাকথিত অনেক প্রাতঃস্মরণীয় নেতারাই যে একদিন তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে এই সব দাদাদের প্রশ্রয়, আশ্রয় দিয়ে সমাজের মাথায় বসিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁরাও কি অপরাধী নয়? হ্যাঁ, 'এখনও সেই ট্র্যাডিশন সমানেই চলছে।'

ষাটের দশকের প্রথম দিকে মধ্য কলকাতার তালতলা থানা এলাকায় এক অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান পরিবারের সাতভাই ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোদের অত্যাচারের জ্বালায় ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান পরিবারগুলিই ওদের লক্ষ্যবস্তু ছিল। ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ার পর এই সব অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান পরিবারগুলি সামাজিকভাবে এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আর এই দুর্বলতার সুযোগগুলিকে কাজে লাগাতে ওই আঙ্গলো ইন্ডিয়ান সমাজেরই এক পরিবারের সাত ভাই সশরীরে নেমে পড়েছিল। ওই পরিবার থাকতো পঁচানব্বই সি ধর্মতলা স্ট্রিটে (তখনও ধর্মতলা স্ট্রিটের নাম লেনিন সরণী হয়নি)। পার্সি রডরিক, সিরিল রডরিক, ইভান, ভিভিয়ান, স্ট্যানলি, রুডলফ ও ওদের ছোট ভাই মিলে নিজেরাই গড়ে তুলেছিল একটা ছোটখাট বাহিনী। আর এই বাহিনীর মধ্যে ভিভিয়ান, স্ট্যানলি ও রুডলফই ছিল বেশি অত্যাচারী বাহিনীর সেনাপতির কাজটা করত ভিভিয়ানই। এই ভাই বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ক'জন চাকরি করলেও, তোলা আদায় করে রোজগার করে নিজেদের জীবনটা উপভোগ করাটাই বেশি পছন্দের ছিল ভিভিয়ানের।

অত্যাচারী হিসাবে ওই ভাই বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে উচ্চতার প্রভেদ থাকলেও মদ্যপানের ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ পার্থক্য ছিল না। প্রত্যেকেই ওদের এলাকায় মাতাল হিসাবে বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান সমাজে এমনিতেই মদের চলন ছিল অবারিত। মদ্যপান ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু ভিভিয়ানরা

সেটা নিজেদের রক্তে একেবারে গেঁথে নিয়েছিল। সকালে অল্প কয়েক ঘণ্টা সময় ওদের পাকস্থলীতে তাজা মদ থাকত না। সম্ভবত আগের রাতের মদের ধুন্ধুমার যুদ্ধটাকে স্তিমিত হওয়ার জন্য খানিকটা সময় শরীরকে দিত। সেই সময়টুকু পার হওয়ার পর আবার বন্ধ বোতল খুলে মদ ঢেলে শরীরকে চনমনে করে আপন আপন কর্মে মনসংযোগ করত।

দুষ্কৃতী হিসাবে দুষ্কৃতীদের মধ্যে এক একটা স্তর থাকে। স্তর হিসাবে ওদের সমাজে এক একজনে এক এক রকম 'সন্মান' পায়। ছোটদা থেকে বড়দা হয়। এম, এল, এ, এম, পি, থেকে মন্ত্রী হয়। সাধারণ থেকে ভি, আই, পি, হয়। তুই থেকে আপনি হয়। দা থেকে স্যার হয়। পাড়ার চায়ের দোকান থেকে ফাইভ স্টার হোটেলে স্থান হয়। দুষ্কৃতীদের এ এক অনন্য উত্তরণ। এই উত্তরণের হিসাবটা ষাটের দশকের প্রথম দিকে এতটা চালু হয়নি। সেই হিসাবে দুষ্কৃতীর কোন স্তরের ছিল ভিভিয়ান?

উনিশশো বাষট্টি সালের নভেম্বর মাস। ঘড়িতে তখন সকাল এগারটা। আকাশ শরতের শেষ লগ্নে পরিষ্কার বাতাসে শীতের আগমনীর সামান্য উঁকিঝুকি। পুজোর মরসুম চলে যাওয়ার পর খানিকটা বা উদাসী। মধ্য কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডের প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততা অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ভিভিয়ানের শরীরেও ঢুকে গেছে তাজা মদ। ভিভিয়ানের বহুদিনের নিশানা এক ভদ্রমহিলা। প্রতিদিনের মতো সেদিনও তাঁর ছেলেকে ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলের সামনে নামিয়ে টানা রিকশায় ফিরে যাচ্ছে ইন্টালির আনন্দপালিত রোডের বাড়িতে। রিকশাচালকের টুনটুন ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে ভিভিয়ানের লম্বা, শ্যমলা রঙের পেটানো শরীরের ভেতরও আনন্দের ধ্বনি বেজে উঠল। টকটকে লাল চোখের তারা নাচতে লাগল। বুকের ভেতর জ্বলে উঠল তরতাজা মদের আগুন। কারণ, ওই ভদ্রমহিলা ভিভিয়ানের ইশারায় কোনও আমল দেননি। প্রায় মাস তিনেক ধরে অবজ্ঞা করে চলেছেন। অথচ তারই এলাকায়, তারই মুঠোর মধ্যে তিনি প্রতিদিন আসেন। ছেলেকে স্কুলে দিয়ে যান, নিয়ে যান। ভিভিয়ান ভাবে এই মহিলা কি জানে না তার ক্ষমতা? জানে না, ভিভিয়ান যদি ইচ্ছে করে তবে তার ছেলের জন্য ওই স্কুলের দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে? যদি জানেই, তবে কোন সাহসে সে তাকে অবহেলা করে চলে? আর যদি না জানে, তবে আজ জেনে নিক, তার প্রতাপ, তার শক্তি। সিদ্ধান্ত নিল, সে আজ একটা হেস্তনেস্ত করবেই করবে। ভিভিয়ানের দাঁতে দাঁত ঘষে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। দু'হাতের মুঠো দু'টো আপনা আপনিই কঠিনভাবে বন্ধ হল। নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুতগামি হল। সমস্ত মুখ জুড়ে নিষ্ঠুরতার ছোবলের ঝলকানি। সেই ঝলকানি দিয়ে সে ওই রিকশাচালকে ইঙ্গিত করল। রিকশাচালক ভিভিয়ানকে চেনে। তার নিঃশব্দ আদেশ অমান্য করলে যে তার ওই এলাকায় রিকশা চালিয়ে

রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত। তাই ইঙ্গিত পেয়ে দম করে সে রিকশা থামিয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ঝট করে এক লাফ। ভিভিয়ান ভদ্রমহিলার কোল ঘেঁষে রিকশায় ওর পাশে বসে গেছে। ভিভিয়ান দ্রুত শুরু করে দিয়েছে ওর কাজ। নিশ্চিত গম্ভীর গলায় রিকশাচালককে হুকুম করল, 'গাড়ি ঘোরা', ব্যাস, ওইটুকু বলেই সে তার মুখ নিয়ে গেল ভদ্রমহিলার মুখের কাছে। সে জানি রিকশাচালক বাধ্য হবে তার হুকুম তালিম করতে। ততক্ষণে ভিভিয়ান তার ডান হাত দিয়ে জাপটে ধরেছে ভদ্রমহিলার পিঠ। বাঁ হাত নিয়ে গেছে অভ্রান্ত নিশানায় ভদ্রমহিলার বুকের ওপর। রিকশাচালক ভিভিয়ানের হুকুম শুনে ভয়ে মৌলালির দিক থেকে তার রিকশার মুখ ঘুরিয়ে আবার স্কুলের দিকে চলার জন্য উদ্যত।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভদ্রমহিলা প্রথমে সামান্য বিহ্বল। আক্রমণে বিভ্রান্ত, বিব্রত। নিজের শাড়ি ঠিক রাখার জন্য উদভ্রান্ত। ভিভিয়ানের মুখ থেকে তীব্র তাজা মদের গন্ধে তিনি উৎকণ্ঠিত। ভদ্রমহিলা তাঁর ডান হাতে গায়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ভিভিয়ানের মুখটা নিজের মুখ থেকে সরিয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠলেন, "বাঁচাও, বাঁচাও।" কিল চিৎকারে পরিবেশ দ্বিখন্ডিত।

ভিভিয়ানকে যারা চিনতো তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে জীবন্ত শবের মতো দাঁড়িয়ে এই যুদ্ধের দর্শক। কিন্তু ওখানে আরও অনেক পথচারী ছিলেন যাঁরা ভিভিয়ানের পরিচয় জানতেন না। তাঁরা এক নারীর চিৎকারে এবং ভিভিয়ানের কান্ড দেখে দৃশ্যের শুরুতে খানিকটা হকচকিয়ে গেলেও, সাময়িক স্থিরতা কাটিয়ে সোজা ছুটে গেলেন ওই রিকশার দিকে। ধুতি পাঞ্জাবী পরা উদ্ধত চেহারার এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক ভিভিয়ানের মাথার পেছন দিক দিয়ে ওর চুলের গোছা শক্ত করে বাঁ হাতে ধরে মারলেন একটান। ভিভিয়ানের ক্ষেত্রে ছন্দপতন। হঠাৎ চুলে এমন শক্ত হাতের টান পড়তে ভিভিয়ান আশ্চর্য হয়ে কোনও মতে টান অবস্থাতেই ঘাড় ঘুরিয়ে মাঝবয়সী ওই 'দুঃসাহসীর' দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠে বলল, "এই বুড়ো, হঠ যা।" উত্তরে ডান হাতের বিরাশি সিক্কার এক চড় ভিভিয়ানের গালে। নগদ চড়ের দাপটে ভিভিয়ানের নেশার গোড়ায় ঝড়ের তোলপাড়। সে তার বাহুবেষ্টিত মহিলাকে নিয়ে সটান রাস্তায় আছড়ে পড়ল। আছাড়ে পরা ভদ্রমহিলার শাড়ি স্বাভাবিকভাবেই অবিন্যস্ত। তিনি নিজের সম্মান বাঁচাতে ব্যস্ত। রাস্তার দর্শককুলও বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়ায় অগোছাল।

ভিভিয়ান এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য মানসিকভাবে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। 'দাদাদের' থাকেও না। 'বিক্রম' পরাজিত হলে যে পায়ের মাটি সরে যায় তা অন্য দাদাদের মতো ভিভিয়ানও সেটা জানে। সেটা সেও চায় না, চাইতে পারে

না। সে তাই বীরত্ব দেখাতে তার কোমরে গোঁজা ছুরি বার করে রাস্তা থেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করার মুহূর্তেই তার মুখে পড়ল ধুতি পরা পায়ের একটা গোটা লাথি। ব্যাস, চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শক শুরু করল এলোপাথাড়ি মার। ভিভিয়ানের শরীরে, মুখে, মাথায় ওই লাথিগুলি সটান এসে আঘাত লাগতে লাগল। ভিভিয়ান ওই লাথিগুলোর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিরোধ করারই সুযোগ পেল না।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডের সংযোগস্থলের কাছে তালতলা থানার একটা টহলদারি ভ্যান এসে হাজির। ভ্যানে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা রাস্তা বন্ধ করে একটা গন্ডগোল দেখতে পেয়ে ভ্যান নিয়ে এগিয়ে গেল। তাঁরাই ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে মুক্ত করল ভিভিয়ানকে।

জনতার রোষ থেকে মুক্তি পেয়ে পুলিশের কবলে আসার পর ভিভিয়ান রক্তাক্ত মুখে এক কনস্টেবলকে বলল, "শালা, সারা শরীরেই যখন পাবলিকের লাথি, ডান্ডার বাড়ি খেলাম তখন আর একটা জায়গা বাকি থাকে কেন? এখানেও মার, এখানেও মার।" মুখ ভেঙ্গিয়ে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভিভিয়ান সে তার পুরুষাঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করতে লাগল।

ভদ্রমহিলা তাঁর জীবনের সাঙ্ঘাতিকতম বিপদ থেকে বেঁচে নিজের শরীরের আলুথালু শাড়ি ঠিক করে নিয়ে ভয়ার্ত চোখকে স্বাভাবিকে নিয়ে এসে ওই রিকশাতে চড়েই বাড়ি ফিরে গেলেন। ঘটনার কিছুদিন পর আদালতে, ভিভিয়ানের বিরুদ্ধে 'নারী অপহরণের চেষ্টার' মামলা শুরু হলো। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে সেই নিগ্রিহিতা ভদ্রমহিলার অসহযোগিতার ফলে ভিভিয়ান আদালত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। হয়তো সেই ভদ্রমহিলা তথাকথিত সামাজিক লোকলজ্জাকে আরও বাড়তে দিতে চাননি। আসলে এই ধরণের অসহযোগিতার ফলে ভিভিয়ানের মতো দুষ্কৃতীরা যে ওই ধরনের অপরাধীরা আরও সাহস পেয়ে তাদের দুষ্কর্ম আরও বাড়িয়ে দেয় সেটাই হয়তো তিনি বুঝতে পারেন নি। সামাজিক অসচেতনতার জনা যে দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত হয় সেটা যে আমাদের দেশের জনসাধারণ কবে বুঝবেন তা এখনও অজানা। সামাজিক অসচেতনতার জন্য শুধু ভিভিয়ানদের মতোই দুষ্কৃতীরা বেড়ে যাচ্ছে না, রাজনীতির নামে, ধর্মের নামে, বিভিন্ন পরিষেবার নামে, পেশার নামে, আইনের নামে, আদর্শের নামে, সমাজ সেবার নামে কত হরেক রকম অপরাধী আমাদের সমাজ, দেশ, জাতিকে গ্রাস করেছে এবং করে চলেছে তার পরিসংখ্যান কে দেবে? এবং এই অসচেতনতা যে চেতনা দিয়েই রক্ষা করাই শুধু হচ্ছে না তাকে আরও সুরক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন ভাবে প্রয়াস চালানো হচ্ছে তা কি এই সমাজের একাংশ বুঝতে পারছেন না? পারছেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যালঘু, কিছুটা বা অসহায়।

তাঁদের চিৎকারে কেউ কর্ণপাতও করছে না, করলেও তা নিয়ে যাতে আর উচ্চবাচ্য না হয় তারই চলছে দিকে দিকে ষড়যন্ত্র।

টাকা, মদ ও নারীদেহ এই ছিল ভিভিয়ানের জীবনের মূল মন্ত্র। ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, ইলিয়ট রোডের সব কটা 'খালি কুঠিতে' ওর ছিল অবাধ গতি। ওইসব 'খালি কুঠির' সন্ধ্যাকালীন যৌনকর্মীরা বিনা পারিশ্রমিকে ওকে খুশি করতে বাধ্য হতো। ওর অবাধ্য হওয়ার অর্থ যে ওখানে ওদের দেহব্যবসা বন্ধ হওয়া, এটা ওরা প্রত্যেকেই জানত। তাই ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করত না। শুধু তাই নয়, 'খালি কুঠির' মালিকরাও ওকে ওদের রোজগারের ভাগ দিত।

তিন নম্বর ইলিয়ট রোডের বাড়িতে একটা ঘর সে দখল করে নিয়েছিল। সেখানে সে দিন ও রাতে আসর বসাত। মদ্যপানের শেষে সে অবধারিতভাবে যৌনকর্মে লিপ্ত হতো। এ জন্য সে নতুন নতুন সঙ্গী খুঁজতো।

ভিভিয়ানের এক দাদা ইভান বিয়ে করেছিল মার্গারেটকে। মার্গারেটের চার ভাই। সবচেয়ে যে বড় সে থাকত ডাঃ সুরেশ সরকার রোডের একটা বাড়িতে। ভিনসেন্ট তার পরিবার নিয়ে থাকত তেইশের সি সারেঙ লেনে। অন্য দু'ভাই তার মার সঙ্গে ওই সারেঙ লেনেরই নয়ের এক নম্বর ঠিকানার ভাড়া বাড়িতে থাকত। মার্গারেটের ছোট বোন মে রোজারিও থাকত মার্গারেটের সঙ্গেই পঁচানব্বই সি ধর্মতলা স্ট্রিটের বাড়ির দোতলার একটা ঘরে। উনষাট সালে ওর সঙ্গে এক নাবিকের বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দু'জনের মানসিক ব্যবধানের জন্য এক সপ্তাহের মধ্যে সেই বিয়ের প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। সে তখন থেকেই কুমারী জীবন যাপন করবে বলে মনস্থির করে ফেলেছিল। একটা বেসরকারী সংস্থায় সে টাইপিস্টের কাজ নিয়ে দিদির সংসারে দিদির তিন সন্তানকে নিয়ে খুশিতে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল।

একজন খুশিতে থাকতেই পারে কিন্তু তাঁর খুশিতে বাধা দেওয়ার জন্য মানুষ-বেশি দুষ্কৃতীও আমাদের সমাজে আছে। মে খুশিতে থাকলেও এক্ষেত্রে তাঁর খুশিতে প্রথমে বাধ সাধলো স্ট্যানলি রডরিক। স্ট্যানলি ওকে বিয়ে করতে চাইল। সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল। প্রত্যাখ্যান করলেই তো হবে না, সেই অপমান ভিভিয়ান চুপ করে মেনে নেবে কেন? চুপ করে মেনে নিলে তাঁদের একাধিপত্য তো দুমড়ে মুচড়ে যাবে। হোক তা আত্মীয়দের মধ্যেই। সে ঠিক করল, প্রতিশোধই শুধু সে নেবে না, মে-কে প্রতিদিন সে 'কাজে' লাগাবে। মে-র ওপর সে বিভিন্ন প্রকারে চাপ দিতে লাগল। আর এই কাজে সে তার অন্য ছোট ভাই ও বোনেদেরও লাগাল। কিন্তু মার্গারেট তাঁর স্বামী ইভানকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। হোক সে প্রতাপশালী ভিভিয়ান, নিজের বোন মে-কে ভিভিয়ানের ক্ষুদার্ত গুহা থেকে বাঁচাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

উনিশশো তেষট্টি সালের জানুয়ারি মাস। ছ'তারিখের গভীর রাতের কুয়াশা ভেদ করে ভিভিয়ান পেট ভর্তি মদ্যপান করে বাড়ি ফিরল। শীতের কামড় মদ্যপানের উষ্ণ তীব্রতায় প্রায় উধাও। কিন্তু অন্য একটা জান্তব শক্তি সারা শরীর মন আচ্ছন্ন করে তুলেছে। সে বাড়ি ঢুকে সোজা দোতলায় মে-র ঘরের দরজার সামনে গিয়ে হাজির হলো। ওর তীব্র নিশ্বাস মে-র ঘরের দরজার ওপর আছড়ে পড়তে লাগল।

মা মিসেস জে. রডরিক ছাড়া সারা বাড়ি নিশ্চুপ। সারা পাড়াও নিশ্চুপ। প্রত্যেকেই শীতের রাতের আরাম নিয়ে ঘুমের জগতে। দরজা জানালা সব বন্ধ। ভিভিয়ান এই রকমই একটা রাত খুঁজছিল। সে জানে মা-ও তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে। মে-কে সে এই রাতেই কব্জায় আনবে। আর একবার কব্জায় আনতে পারলে তার আর চিন্তা নেই। মে-কে সে তার রক্ষিতা করে রাখবে। তাতে তার নিজস্ব জগতে সম্মানও বাড়বে। তার গোষ্ঠীভুক্ত সমাজে নিত্যনতুন সঙ্গিনী ছাড়াও একটা কি দু'টো রক্ষিতা না রাখতে পারলে সম্মান ও প্রতিপত্তির ওপরের স্তরে ওঠা যায় না। এটাই ওদের বহুদিনের দস্তুর, চল। ভিভিয়ানের সব আছে, নতুন নতুন সঙ্গিনীও সে পায়, কিন্তু তার বাঁধা রক্ষিতা নেই। হ্যাঁ মে-কে সে রক্ষিতা করেই সে তার জগতের উচ্চাসনে বসতে চায়। নিজেকে তার সিংহের মতো মনে হতে লাগল। তারপর টাল সামলে সে মে-র ঘরের দরজায় টোকা দিতে লাগল।

ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ সে শুনতে পেল না। ভিভিয়ান দরজায় আবার ধাক্কা দিল। তবু নিরুত্তাপ। চারদিক অন্ধকার। ভিভিয়ান আরও জোরে ধাক্কা দিল। এই রাতকে সে বিফলে যেতে দেবে না। তার শরীরের রক্তের অণু পরমাণুতে তারই ডাক। মে-কে তার এই রাতেই চাই।

কিন্তু তার ডাকে যে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। মদে আচ্ছন্ন রক্ত তার মাথায় চড়তে লাগল। সেই তাড়নায় ভিভিয়ান এবার দরজার ওপর ডান পা দিয়ে সজোরে লাথি দিতে লাগল। দরজার ওপর প্রথম খটখট আওয়াজেই মে'র ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। এবং বুঝে ছিল ওই খটখট আওয়াজ করা লোকটা আসলে কে? সে তাঁর শরীরে চাপানো কম্বলটা আরও শক্ত করে চেপে ধরে। কম্বলটাই তাঁর বর্তমান পরিস্থিতি থেকে মুক্তির অবলম্বন করে আঁকড়ে রেখেছিল। আওয়াজ উত্তরোত্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় তাকে আরও কুঁকড়ে দিচ্ছিল। সে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। কিন্তু কিভাবে মুক্তি হবে তার। কোনও পথ সে খুঁজে পাচ্ছিল না। সে নিশ্চিত জানে, এই রাতে, এই পরিস্থিতিতে, এই অন্ধকারে একবার দরজা খোলা মানে ভিভিয়ানরূপী শয়তান অক্টোপাসকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো। আর একবার আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ তার হাতে সারা জীবনের জন্য বন্দি। তার দাসত্বের স্বীকার। যা সে কোনওভাবেই করতে দিতে পারে না।

অন্যদিকে ভিভিয়ানের লাথি মে-র ঘরের দরজার ওপর ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে। আর তার সঙ্গে শুরু হয়েছে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ।

চিৎকারের ঠেলায় জেগে গেলেন মার্গারেট। জেগেই তিনি বুঝে গেছেন, কীসের আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে এক মুহূর্তও আর দেরি না করে ইভানকে ঠেলতে লাগল। মাতাল ইভানের কি আর সামান্য ঠেলায় ঘুম ভাঙ্গে? মার্গারেট তখন বাধ্য হয়ে ওর শরীর থেকে কম্বল সরিয়ে নিল। তারপর হাত ধরে টেনে তুলল। তখনও দোতলায় মে-র ঘরের দরজার ওপর ভিভিয়ানের ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

মার্গারেট জোর করে স্বামীকে জাগিয়েই বলল, "শুনতে পাচ্ছ না কোনও আওয়াজ?"

নেশার ঘোরে ওইভাবে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় ইভান প্রচন্ড বিরক্ত হয়েছিল। কোনও মতে সে প্রশ্ন করল, "কোথায়?"

"উপরে, দোতলায় চল।" মার্গারেট প্রশ্ন ঠেলে বিছানা থেকে ইভানকে নামিয়ে দিল।

ওরা দরজা খুলে উপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সিঁড়ির মুখেই ভিভিয়ানের চিৎকার শুনতে পেল। ইভানকে ঠেলে মার্গারেট ছুটে ওপরে উঠে গেল। সামনেই মে-র ঘর। ভিভিয়ান দরজা ঠেলছে। কোনও রকম জ্ঞান যে ওর আছে তা ওকে দেখে বোঝার উপায় নেই। সে তখন অন্ধ পাগল, মে-র শরীরের উত্তাপ তার চাই-ই চাই।

মার্গারেট উন্মত্ত ভিভিয়ানের হাত ধরে টানল। ভিভিয়ান হঠাৎ হাতে টান পড়তে মাথা ঘুরিয়ে মার্গারেটকে দেখে তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গলা চড়িয়ে গালি দিতে দিতে ঠেলে সরিয়ে দিল। দৃশ্য দেখে ইভানের নেশা কেটে গেছে। সে সামান্য ধাতস্থ হয়ে তার ভাইকে ঠেলা মেরে নীচে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই ভিভিয়ান তেড়ে গিয়ে ইভানকেও মে-র ঘরের দরজায় চেপে ধরার চেষ্টা করল। ইভান ভিভিয়ানের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করল।

দোতলায় শীতের রাতের নিঝুমতা ভেঙ্গে প্রচন্ড চিৎকার, ধস্তাধস্তির ঠেলায় ভিভিয়ানের মা, বোন জেগে উঠে দোতলায় উঠে এল। তাঁরা এসে ভিভিয়ানের প্রচেষ্টায় বাধা দিতে ভিভিয়ান বাধ্য হলো রণে ভঙ্গ দিতে। সে গজগজ করতে করতে নীচে নেমে দড়াম করে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় শরীরটা ছুঁড়ে দিয়ে তখনকার মতো যুদ্ধে ক্ষান্ত হলো।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই ভিভিয়ান মার্গারেটের উদ্দেশ্যে বাছাই করা বাণী নিক্ষেপ করতে লাগল। কারণ ও জানে ওর আসল বাধা মার্গারেট। মার্গারেটকে পথ থেকে সরাতে পারলেই ও মে-কে ইচ্ছে মতো ভোগ করতে পারবে। মার্গারেটকে

ও ঘরের শত্রু হিসাবে দেখতে শুরু করেছে। ভিভিয়ান জানে, মে-র ভাইয়েরা ওর বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস পাবে না। আর মে-র বাধাকে সে তোয়াক্কার মধ্যেই আনে না। শুধু ওরা কেন, এলাকার কোনও অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান পরিবারের সদস্যই ওর কাজের প্রতিরোধ করার সাহস পাবে না। কিন্তু মার্গারেট যে ওর দাদার স্ত্রী হিসাবেই প্রধান বাধা। যদিও সেই মর্যাদা সে কোনও দিন মার্গারেটকে দেয়নি।

মার্গারেট মনে মনে ঠিক করে মনস্থির করে নিয়েছে যে, সে মে-কে তার মা-র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ভিভিয়ানের হাতের বাইরে রাখবে। মা-র বাড়িতে একটাই সমস্যা। সেখানে জায়গা কম, সে জন্যই মে ওর কাছে থাকে। আর ভিভিয়ান সেই সুযোগটাই নিতে চায়। কতদিন যে সে এইভাবে প্রতিরোধ গড়ে ভিভিয়ানের হাত থেকে মে-কে বাঁচাতে পারবে সে নিজেই জানে না। মার্গারেট জানে ভাইয়েদের মধ্যে ভিভিয়ানই সবচেয়ে বড় লম্পট। নারীদেহ পেতে সে সব কিছু করতে পারে।

সেদিন অফিস থেকে মে বাড়ি ফিরলে মার্গারেট তাঁর মনের ইচ্ছা মে-কে জানালো, মে রাজি হলো। কোন মেয়ে এরকম আক্রমণ প্রতিদিন সহ্য করতে পারে? প্রথমে স্ট্যানলি তারপর ভিভিয়ান। একেরপর এক আক্রমণে তার মনও বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এক সময় তার নিজের দেহটার ওপর ঘৃণা জন্মায়। প্রশ্ন জাগে নারী হয়ে জন্মানোই কি অভিশাপ? ভিভিয়ানদের মতো পুরুষদের লোলুপ হাত আর কামনা থেকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখবে তার শরীর? সে ভিভিয়ানের কাছ থেকে দূরে কোথাও পালাতে চায়।

মে-তাঁর মনের ইচ্ছা তাঁর মা-কে জানালো। তিনিও মে-কে পরামর্শ দিলেন, শত অসুবিধা হলেও তাঁর বাড়িতে এসেই থাকতে। ভিভিয়ানের প্রত্যক্ষ নজর থেকে সামান্য হলেও দূরে। আলোচনার পর ঠিক হলো, একদিন পর, ন' তারিখ সন্ধ্যেবেলা তিনি ও তাঁর দুই ভাই ধর্মতলা স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে সারেঙ লেনে তাঁদের বাড়িতে মে-কে নিয়ে আসবে।

কথা অনুযায়ী মিসেস রোজারিও তাঁর ছোট ছেলে রবার্টকে নিয়ে ধর্মতলার এক সিনেমা হল থেকে ছবি দেখে ধর্মতলা স্ট্রিটে ভিভিয়ানদের বাড়ি গেল মে-কে নিয়ে আসতে। মার্গারেটের আরেক ভাই স্ট্যানলি রোজারিও যথাসময়ে ওই বাড়িতে হাজির।

মিসেস রোজারিও ও তার ছেলেদের দেখে ও তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য জেনে ভিভিয়ান অসম্ভব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ওর নিশানা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, এটা ও মানতে পারল না। প্রথমেই ওর রাগ হলো মার্গারেটের ওপর। ওর মনে হলো মার্গারেটের বুদ্ধি অনুযায়ীই মে তাদের বাড়ি থেকে পালাচ্ছে। রাগে ওর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। ক্ষিপ্ত হয়ে সে মার্গারেটকে আক্রমণ করল।

দোতলায় ওঠার সিড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল মার্গারেট। ভিভিয়ানের হঠাৎ আক্রমণের জন্য মার্গারেট বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। নাকের ওপর ভিভিয়ানের ঘুষি খেয়ে ও সিঁড়ির ওপর চিৎপাত হয়ে পড়ল। ও চিৎপাত হয়েও চিৎকার করে উঠল। ভিভিয়ান কিন্তু থেমে নেই। ও মার্গারেটের চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা শরীরের ওপরই পা চালাল।

মার্গারেটের চিৎকারে গোটা বাড়ির সদস্যরা হাজির। দোতলায় ওঠার মুখে দাঁড়িয়েছিল মে। সে ছুটে এসে দিদিকে ভিভিয়ানের হাত থেকে বাঁচাতে গেল। ভিভিয়ান এমনিতেই মে-র ওপর অসম্ভব রেগে ছিল। ওই অবস্থায় হাতের সামনে ওকে পেয়ে তার রাগ ঝরাতে লাগল। মে-র শরীরের প্রতিটি আনাচে কানাচে তার হাত চলতে লাগল।

মার্গারেট ভিভিয়ানের অত্যাচারী হাত থেকে মে-কে বাঁচাতে উঠে দাঁড়াল। ওর নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে। মে আত্মরক্ষার জন্য ভিভিয়ানকে তাঁর শরীর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে ঠেলছে। কিন্তু মাতাল ভিভিয়ানের তখন পরিস্থিতি, পরিবেশ, সব মাথার থেকে উধাও। মে-কে হাতের কাছে পেয়ে তার এত দিনের পুষে রাখা কামনা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভিভিয়ান মে-কে ঠেলে মেঝেতে ফেলে দিয়ে তার ওপর ওর নিজের শরীর চাপিয়ে দিল। মার্গারেট ভিভিয়ানকে মে-র শরীরের ওপর থেকে নামানোর জন্য দু'হাত দিয়ে ঠেলতে লাগল।

মার্গারেট ও মে-র চিৎকারে রবার্ট ও স্ট্যানলি রোজারিও হাজির। ওরা ওদের বোনকে বাঁচানোর জন্য ভিভিয়ানের ওপর ঝাঁপিয়ে ওকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। বাধা পেয়ে ভিভিয়ান মে-কে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে আগুন চোখে একবার তাকিয়ে ছুটে গেল সিঁড়ির তলায়। সেখানে হাত চারেক লম্বা একটা লোহার রড ও রেখেছিল। সেটা সে হাতে তুলে নিয়ে এক লাফেই যথাস্থানে এসেই সামনে দাঁড়ানো রবার্টের মাথা লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল। কটাস করে একটা আওয়াজ। তীব্র চিৎকার করে রবার্ট মাথা ধরে বসে পড়তেই ভিভিয়ান রডটা স্ট্যানলি রোজারিওর মাথা তাক করে চালাল। স্ট্যানলি মাথাটা সামান্য সরিয়ে নিতে সেটা তাঁর পিঠের ওপর নেমে এল। মিসেস রোজারিও ও মার্গারেট ভিভিয়ানকে পেছন থেকে জাপটে ধরল। এবার ভিভিয়ানের ছোট ভাই রুডলফও আসরে নেমে পড়ল। সে মার্গারেট, রবার্ট ও মে-কে এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করল।

রোজারিও পরিবারের পরিত্রাহি চিৎকারে আশেপাশের কিছু প্রতিবেশী জড়ো হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ভিভিয়ান ও রুডলফের হাত থেকে ওই পরিবারের সদস্যদের কোনও ভাবে মুক্ত করল। ভিভিয়ান ও রুডলফ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ভিভিয়ানরা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর মে এক প্রতিবেশীকে নিয়ে রাস্তার

এক দোকানে গিয়ে প্রথমে লালবাজার কন্ট্রোল রুম ও পরে অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিল। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করে বেশিক্ষণ সময় নষ্ট আর মে করল না। কারণ রবার্টের মাথা থেকে রক্ত ক্ষরণ অব্যাহত রয়েছে। সে একটা টানা রিকশায় স্ট্যানলি ও রবার্টকে বসিয়ে প্রতিবেশীদের সাহায্যে তাঁদের নীলরতন সরকার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল।

বাড়ি ফিরে মে আর অপেক্ষা করল না। মাকে সঙ্গে নিয়ে সে সোজা সারেঙ লেনে মার বাড়িতে চলে এল। নিজের ইজ্জত কোনও মতে এ যাত্রায় বেঁচেছে। কিন্তু রবার্ট ও স্ট্যানলির অবস্থা দেখে মে-র মাথায় এর প্রতিকারের চিন্তা ঘুরছে। সে মা-কে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই ছুটল তালতলা থানায় এবং থানায় ভিভিয়ান ও রুডলফের বিরুদ্ধে রবার্ট ও স্ট্যানলিকে খুনের চেষ্টা করার জন্যে এজাহার লেখাল।

তালতলা থানায় ভিভিয়ানের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়ে। ভিভিয়ানকে সবাই চেনে। আর একটা নতুন অভিযোগ শুধু তাতে যোগ হলো। এ ছাড়া মে-র হাতে তো ভিভিয়ানের অত্যাচারের প্রতিকারের আর রাস্তাও খোলা নেই।

দশ তারিখ সকালে, ভিভিয়ানের অত্যাচারের ভয়ে মার্গারেট তাঁর স্বামী ইভানকে না জানিয়ে তার তিন সন্তানকে নিয়ে সারেঙ লেনে মা-র আশ্রয়ে এসে হাজির। ও জানে ভিভিয়ান পারে না এমন কোনও কাজ নেই। একবার যখন সে তাঁর গায়ে হাত তুলতে পেরেছে তখন ওর সামান্যতম চক্ষু লজ্জাও চলে গেছে। এবার সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যখন ইচ্ছা আক্রমণ করবে। মার্গারেট এটাও জানে ভিভিয়ানের আক্রমণের হাত থেকে ওর স্বামী ইভানও ওকে বাঁচাতে পারবে না। সে তাই বাধ্য হয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে মায়ের আশ্রয়ে চলে এল।

দশ তারিখ মার্গারেট সারেঙ লেনে এসে প্রথমেই সে তাঁর দাদা ভিনসেন্টের বাড়ি গিয়ে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের ঘটনা বিস্তারিত ভাবে সব জানিয়ে দাদাকে নিয়েই তালতলা থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিয়ে এল। এগারো তারিখ বিকালবেলা রুডলফকে তালতলা থানার পুলিশ সুরেন ব্যানার্জি রোডে কলকাতা করপোরেশনের হেড অফিসের সামনে থেকে গ্রেফতার করল। ভিভিয়ান আর স্ট্যানলি রডরিক এই খবরে আরও হিংস্র হয়ে উঠল। রোজারিও পরিবারের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা পরিকল্পনা শুরু করল।

বারো তারিখ সারাদিন ধরে ইলিয়ট রোডের ঘরে মদ্যপান সহযোগে চলল আলাপ আলোচনা। ভিভিয়ানের সব সময়ের সঙ্গী রঞ্জিত মন্ডল, সিমন দাস ওরফে বুড়ো ও রঞ্জিত বিশ্বাস ওরফে কাঞ্জিলাল ওদের আলোচনায় যোগ দিয়ে রোজারিও পরিবারের ওপর প্রতিশোধের শপথ নিল।

ওরা ঠিক করল ভিনসেন্টের একমাত্র ছেলে ভিভিয়ান ডি রোজারিও সমেত যত

জনকে পারবে ওরা পঙ্গু করে দিয়ে আসবে। ভিভিয়ান রডরিক কিন্তু মার্গারেটকে ভুলতে পারছে না। কারণ ওর জন্যই সে মে কে মুঠোর মধ্যে পেয়েও তাকে ভোগ করতে পারেনি। ওর দাবি, মার্গারেটকে উচিত শাস্তি দিতে হবে। হোক সে তার দাদা ইভানের স্ত্রী, হোক সে দাদার তিন সন্তানের মা, তাকে সে নিকেশ করার আবদার করল। কিন্তু স্ট্যানলির এটা পছন্দ হলো না। তারপর দু'জনের চিন্তার টানাপোড়েনের পর ঠিক হলো, মার্গারেটকে পঙ্গু করা হবে না, কিন্তু শারীরিকভাবে জখম করা হবে। বোন মে-কে ওদের হাতে তুলে না দেওয়ার জন্য তার প্রাপ্য তাকে দিতেই হবে। এর জন্য যদি ইভানের দুঃখ হয়, হোক, কারণ ইভানও ভিভিয়ানকে মে-র ব্যাপারে সাহায্য করেনি।

অবশেষে ঠিক কি হলো, ওরা, পাঁচজন পরদিন রবিবার তেরো তারিখে দুপুরবেলা সারেঙ লেনে রোজারিওদের বাড়ি আক্রমণ করে যাকে পাবে তাকেই পঙ্গু করে তছনছ করে আসবে।

প্রতি রবিবার সকালে রোজারিও পরিবার গির্জায় প্রার্থনা করতে যান। সেই রবিবারও মার্গারেটের মা, মিসেস এলিজাবেথ রোজারিও, তার মেজ ছেলে ভিনসেণ্ট গির্জায় প্রার্থনা শেষে যথারীতি ফিরে এলেন সারেঙ লেনে। নয়ের একের বাড়িতে চলে গেলেন মিসেস এলিজাবেথ, উল্টো দিকে তেইশের সি বাড়িতে চলে গেলেন ভিনসেণ্ট।

বাড়ি ফিরে মিসেস এলিজাবেথ দেখলেন তার জামাই ইভান ও তার এক বোন ক্রিস্টিনিকে নিয়ে তাঁদের বাড়ি এসেছেন, মার্গারেট ও তাঁর তিন সন্তানকে ধর্মতলা স্ট্রিটের বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু মার্গারেট ইভানের আশ্বাসে ভরসা করতে পারছে না, তাই সে কিছুতেই ধর্মতলা স্ট্রিটের বাড়িতে যেতে রাজি নয়। ভিভিয়ানকে ও বিশ্বাস করে না।

বাড়িতে ফিরে মিসেস এলিজাবেথ শুনতে পেলেন মার্গারেট ইভানকে জিজ্ঞেস করল, "আমাকে মারার কি প্রতিকার তুমি করলে? কোথা থেকে ভিভিয়ান সাহস পায় আমাদের ওইভাবে মারার?"

মার্গারেটের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারল না ইভান। একবার ওর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ইভান মাথা নিচু করে নিল।

সামান্য চুপচাপ। নিশ্চুপতা কাটিয়ে, মার্গারেটের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ক্রিস্টিনি মার্গারেটকে বলল, "এবার আমরা ওকে বাড়িতেই ঢুকতে দেব না, তুমি ফিরে চল।"

মার্গারেট সামান্য হাসল। তারপর পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, "তোমাদের কি সেই শক্তি আছে, ভিভিয়ান, রুডলফ, স্ট্যানলিদের আটকাবার? যদি তেমন জোর থাকতই তবে অনেক আগেই ওকে তোমরা বাড়ি থেকে বের করে দিতে। এটা তো আর

নতুন নয়। হয়তো চরম। মে-র ওপর ও যেভাবে আক্রমণ করেছে তারপর তোমরা কি করে চুপ করে থাকলে? আসলে আমি জানি, তোমরাও মনে মনে চেয়েছিলে ভিভিয়ান যখন চাইছে, তখন মে ওর কাছে আত্মসমর্পন করুক, কি চেয়েছিলে না?"

ইভান ও ক্রিস্টিনি দু'জনেই মার্গারেটের এমন সরাসরি আক্রমণাত্মক প্রশ্নের সামনে চুপ করে রইল।

মার্গারেটই আবার বলল, "তোমরা ভিভিয়ানকে কি ভাবে ভয় কর, তা তো আমি জানি। ন'তারিখের রাতে বাইরের অন্য লোকেরা না এলে মে-কে ভিভিয়ান সবার সামনেই রেপ করত। তোমরা কিচ্ছু করতে পারতে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখতে, নয়তো চলে যেতে। আমার ভাই রাবার্ট ও স্ট্যানলিকে যে ও হাসপাতালে পাঠালো তার কি করলে? তোমাদের সাহস আছে? নেই। তাই আমি আর ওই বাড়িতে যাচ্ছি না।" মার্গারেট চুপ করে গেল। ইভানদের দেখতে লাগল।

ইভানরা কোনও উত্তর দিচ্ছে না বলে মার্গারেটই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। মার্গারেট বলল, "শোনো, এখানে যখন এসেছ, দুপুরে খাও দাও, তারপরে ওই বাড়িতে ফিরে যাও। যতদিন না ভিভিয়ান তার চরিত্র পাল্টাচ্ছে ততদিন আমি ওই বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি না। অবশ্য ও কি আর চরিত্র পাল্টাবে! মনে হয় না। তোমরাও ওকে পাল্টাতে পারবে না। রাস্তায় পাবলিকের হাতে এত ধোলাই খেলো, তারপরেও ও পাল্টায়নি।"

ক্রিস্টিনি মিনমিন করে মার্গারেটকে বলল, "এখানেও তো ভিভিয়ান আসতে পারে।"

মার্গারেট একটা তির্যক দৃষ্টি ক্রিস্টিনির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "পারে। কিন্তু এখানে আমার ভাইয়েরা আছে, পাড়ার লোকেরা আছে, তারা একটা কিছু ব্যবস্থা ঠিক নেবে। ভিভিয়ান একা খেলে বেরিয়ে যেতে পারবে না।"

ইলিয়ট রোডের দৃশ্য আবার আলাদা। ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা করে ভিভিয়ান, স্ট্যানলি রডরিক, সিমন দাসেরা এসেছে তা একমাত্র তারাই জানে। আলোচনা অনুযায়ী সকাল দশটার মধ্যে রঞ্জিত মণ্ডল আর কাঞ্জিলাল সমেত ওরা পাঁচজন মদের গ্লাস সাজিয়ে বসল। গ্লাসে গ্লাসে ভিভিয়ান 'রক্ত' ঢালতে লাগল। ওই রক্ত খেয়েই ওরা অভিযানে যাবে। রোজারিও পরিবারের সদস্যদের রক্ত ঝরাবে। মদ খেতে খেতে ভিভিয়ান এক একবার দাঁতে দাঁত ঘষে নিজের শরীরের জ্বালা থামাচ্ছে। মে-কে ওর হাতে তুলে না দেওয়ার মাশুল ওদের আজ দিতে হবে। সে মনে মনে ঠিক করেছে, ওদের এমন শিক্ষা দেবে যাতে শুধু ওরা নয়, কলকাতার সমগ্র অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান সমাজ এবং মধ্য কলকাতার অন্যান্য উঠতি পড়তি মাস্তানরাও যাতে চমকে উঠবে। আর ওর বিরুদ্ধে কেউ ফোঁস করার সামান্য সাহসও যাতে না পায়, তেমন ব্যবস্থাই ওরা করে আসবে। এক ঢিলে সে অনেক পাখি মারবে।

ঘরের কোণে একটা চটের থলিতে রাখা আছে দশটা তাজা বোম। আর একটা ব্যাগে আছে এক ডজন সোডার বোতল। মদ খেতে খেতে ভিভিয়ান মাঝে মধ্যে ওই ব্যাগ দুটোর দিকে তাকাচ্ছে। ওই বোম ও সোডার বোতলের কার্যকরী ক্ষমতা আজ সারেঙ লেনের বাসিন্দারা স্বচক্ষে দেখবে। ভিভিয়ান বোম ও সোডার বোতলগুলি চারটে ব্যাগে ভাগ করতে রঞ্জিতকে আদেশ দিল। তারপর ওর কাছে রাখা একটা কিডব্যাগ থেকে ছ'টা ছুরি বের করে প্রত্যেকের হাতে একটা করে দিয়ে নিজে দুটো ছুরি কোমরে গুঁজে নিল।

দশটা থেকে বারোটা, দু'ঘণ্টা মদ্যপান সহযোগে আসন্ন আক্রমণের ছোট ছোট পরিকল্পনাতেই কেটে গেল ভিভিয়ানদের। আলোচনার মাঝখানেই ভিভিয়ানের নির্দেশ মতো বারোটার সময় সিমন আর কাঞ্জিলাল একটা হোটেলে গেল। ফিরে এল দুপুরের খাবার নিয়ে। মাংস, পরটা ও স্যালাড। সঙ্গে আরও এক বোতল রাম।

প্রথম বোতলটা অনেক আগেই খালি হয়ে টেবিলের তলায় জায়গা নিয়েছে। এবার দ্বিতীয়টার পালা। ভিভিয়ানই আবার কটকট করে ডান হাতের তালুর চাপে ওটা খুলল। গ্লাসে গ্লাসে পরিবেশন করল। সিমন মাংস, পরটা সাজিয়ে দিল। আড়াইটার মধ্যে ওদের খাওয়া ও মদ্যপান শেষ। যুদ্ধের পর আবার হবে। এবার শুরু হলো সেই যুদ্ধের অভিযানের জন্য সাজগোজ।

বোম ও সোডার বোতল ব্যাগে ব্যাগে ভাগ করা হয়েছে। ভিভিয়ান ও স্ট্যানলি নিল বোম ভর্তি ব্যাগ। রঞ্জিত, সিমন, নিল সোডার বোতল, কাঞ্জিলালের হাতে একটা হকির স্টিক। এছাড়াও প্রত্যেকের কোমরে গোঁজা আছে ছুরি। প্রয়োজনে ওগুলি কাজে লাগবে। সাজ গোজ শেষ। এবার যাওয়ার পালা। ঘরের দরজা বন্ধ করে ওরা সারেঙ লেনে রোজারিওদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

সারেঙ লেনের বাড়িগুলির পরিকল্পনা অদ্ভুত। তেইশের এ, বি, সি, নম্বরের বাড়িগুলি একই উঠোন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সি নম্বরের বাড়িতে ভিনসেণ্ট থাকলেও, বিয়ের পর থেকে তাঁর বড় ছেলে ভিভিয়ান রোজারিও বি নম্বরের বাড়ির দোতলায় একটা ঘরে থাকে।

দু'টো বাড়ির সিঁড়ি দু'টো পাশাপাশি। সরাসরি উঠোন থেকে উঠে এসেছে। দোতালায় দু'টো ছোট ছোট ঝুল বারান্দা আছে, এতই কাছে যে দুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে গল্প করলে অন্য কোনও তৃতীয় পক্ষ কিছুই শুনতে পারে না।

ভিনসেণ্টের মেয়ে ইয়োনার সঙ্গে বারান্দায় বসে মার্গারেট তিনটে পর্যন্ত ট্রানজিস্টার চালিয়ে গান শুনে মা-র বাড়িতে ফিরে গেল। ওখানেই ইভানদের সঙ্গে ও চা খাবে। ইভানরা এখনও ওর মত পরিবর্তনের আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু মার্গারেটের মধ্যে মত পরিবর্তনের কোনও লক্ষণই নেই।

অন্যদিকে কদম কদম এগিয়ে আসছে ভিভিয়ান ও স্ট্যানলি রডরিক। তাদের সামান্য পেছনে রঞ্জিত মণ্ডল, সিমন ও কাঞ্জিলাল সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে আসেছে। প্রতিশোধের উন্মাদনা। ভিভিয়ান তার চর মারফৎ খবর পেয়েছে, মার্গারেট ওর দাদা ভিনসেণ্টের বাড়িতে আছে। সুতরাং ওখানেই ও প্রথম আক্রমণ হানবে বলে ঠিক করেছে। ওখানেই সে একসঙ্গে মার্গারেট ছাড়াও ভিনসেণ্ট ও তাঁর ছেলেকে পেয়ে যাবে। একই আক্রমণে রোজারিও পরিবারকে উচিত শিক্ষা দিতে পারবে। মনে মনে ওর ইচ্ছা, মার্গারেটকে পঙ্গু করে দেওয়ার।

ভিভিয়ান রডরিকদের দল তিনটে পনেরো মিনিট নাগাদ বীরদর্পে সারেঙ লেনে এসে ঢুকল। তেইশের এ, বি, সি বাড়ির ফাঁকা উঠানে এসে দাঁড়িয়ে স্ট্যানলি গলা উঁচিয়ে হাঁক পাড়ল, "এই ভিভিয়ান, ভিভিয়ান!"

তেইশের বি-র দোতলার ঘরে ভিনসেন্টের বড় ছেলে ভিভিয়ান রোজারিও তাঁর স্ত্রী মেরিকে নিয়ে শুয়েছিল। ওর নামধরে কেউ ডাকছে শুনে ও ধড়মড়িয়ে উঠে সামনের বারান্দায় আগন্তুককে দেখতে এল। পেছন পেছন উঠে এল ওর স্ত্রী।

ওরা দেখল, রডরিকদের দুই ভাই, সঙ্গে আরও তিনটে বখাটে চেহারার ছেলে এক হাতে সোডার বোতল ও অন্য হাতে ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড উত্তেজিত ভাবে তাকে ডাকছে। ওদের আসার কারণ ও ডাকার ধরণ যে কোনও আমন্ত্রণের জন্য নয় তা ওদের সম্পূর্ণ আচরণেই বোঝা যাচ্ছে। মেরি পেছন থেকে ভিভিয়ান রোজারিওকে টেনে ধরল। টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও চট করে বারান্দার পাঁচিলের আড়ালে গিয়ে তেইশের সি-র স্টোর রুমের ছাদে উঠে গেল আত্মরক্ষার জন্য।

সিমন একটা সোডার বোতল ভিভিয়ান রোজারিওকে লক্ষ্য করে ছাদের দিকে ছুঁড়লো। দড়াম করে ওটা ফাটলো। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও একটা কাঁচের টুকরো ছুটে এসে লাগল ওর কপালে। রক্ত পড়তে লাগল। হাত দিয়ে অনুভব করল। এরপর আর ওদের আগমণের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও দ্বিমত হতে পারে না।

ভিভিয়ান রোজারিও আড়াল নিয়ে গলায় সম্পূর্ণ জোর দিয়ে বাড়ির অন্যদের সাবধান করার জন্য চিৎকার করতে লাগল, "কেউ বের হবে না! বের হবে না।"

ভিভিয়ান আর স্ট্যানলি রডরিক তেইশের সি-র দোতলায় সোজা উঠে গেল। সামনেই ভিনসেন্টের ঘর। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ওর মেয়ে ইয়োনা ও কারমেল। ছোট ছেলে মারভিন পাশের ঘরের ভেতরে। কি হচ্ছে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

বড় ঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ভিনসেন্ট। বড় ছেলের সাবধানবাণী শুনে ও আর ঘর থেকে বের হয়নি, বের না হলে কি হবে? যমরাজের দূতেরা যে ঘরের দরজার সামনেই হাজির। ভিনসেন্ট ওদের মূর্তি দেখেই ভয় পেয়েছিল। তবু প্রশ্ন করল, "কি চাই?"

ভিভিয়ান উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, "মার্গারেট কোথায়?"

"নেই।" ভিনসেন্ট বলল।

"মার শালাকে মার।" চিৎকার করে হুকুম দিল ভিভিয়ান। স্ট্যানলি ঘরের ভেতর ছুঁড়ে মারল একটা সোডার বোতল। ঘরের ভেতর সেটা আছাড় খেয়ে ফাটলো।

ভিভিয়ান এবার ওর ব্যাগ থেকে বার করল বোম। ভিনসেন্টের শরীর লক্ষ্য করে ছুঁড়তেই সেটা বিকট আওয়াজ করে ফাটলো। সেই আওয়াজ সারেঙ লেনের বাসিন্দারা ছাড়াও তালতলা অঞ্চলের জনগণ শুনতে পেল।

আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার পর ভিভিয়ান আর স্ট্যানলি এবার ঘরের ভেতর ঢুকল। ভিনসেন্টের শরীরটার ঠিক কি অবস্থা হলো তা স্বচক্ষে পরখ করতে। পর্যবেক্ষণ করে ওদের পছন্দ হলো। বোমের তেজটা ওদের চাহিদা পূরণ করেছে।

রঞ্জিতরা তিনজনেই উঠে এসেছে সিঁড়িতে। ওরা ছুরি নাচিয়ে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে, যাতে সামনে না এসে রডরিকদের কাজে কেউ ব্যাঘাত ঘটায়।

কাজ শেষ করে ভিভিয়ান আর স্ট্যানলি "মেরেছি, শালাকে মেরেছি" বলে চিৎকার করতে করতে ওই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। বারুদের তাজা গন্ধ তখন সারা বাড়িময়। সেই গন্ধ ভিভিয়ান রডরিকদের ওস্তাদি জাহির করছে। রডরিকদের চোখে মুখে তারই উল্লাস।

রডরিকরা দুই ভাই আর দাঁড়াল না। ছুটে নীচে নেমে এল। পেছন পেছন সিমন ও রঞ্জিতরাও। ওরা উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পৌঁছাল। ভিনসেন্টের ছেলে ভিভিয়ান রোজারিও ছাদ থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে এল রাস্তায়, চিৎকার করতে লাগল, "ধর, ওদের ধর।"

ওর চিৎকারে ভিভিয়ান রডারিকরা আশ্চর্য হলো। সিমন একটা সোডার বোতল ওর দিকে ছুঁড়ে মারল। ওর গায়ে লাগল না। বাড়ির পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে ফাটলো। ভিভিয়ান ওর ব্যাগ থেকে বার করল বোম, ছুঁড়ল। রাস্তায় ফাটলো। আবার আর একটা। সেটারও একই গতি। সারেঙ লেন কাঁপিয়ে ফাটলো। সারেঙ লেনের বাসিন্দারা বোমের আওয়াজে হইচই করে উঠল। তার একটা আওয়াজও বোমের আওয়াজের সঙ্গে মিশে পাওয়া যাচ্ছে।

ভিভিয়ান রোজারিও ছুটল ওর বাবার ঘরের দিকে। দেখল, মা ও বোনেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। ঘরের ভেতরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ওর বাবা ভিনসেন্ট। ওর মাথার একপাশ থেকে গলগলিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। ভিভিয়ান রোজারিও ওর বাবাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এল বারান্দায়। চিৎকার করল, "পুলিশ, পুলিশ।" ওর তখন পাগলের মতো অবস্থা। বাবাকে ওই অবস্থায় বারান্দায় মা বোনেদের জিম্মায় দিয়ে ও আবার ছুটে এল রাস্তায়। দেখল ভিভিয়ান রডরিকরা চলে গেছে

কিন্তু ওদের সাকরেদ রঞ্জিত মন্ডল মাঝখানে শুয়ে আছে। আর ওকে ঘিরে আছে সারেঙ লেনের বহু লোক। রঞ্জিত ওদের হাতে ধরা পড়ে মার খেয়েছে। ধরা ও পড়ত না। কিন্তু ভিভিয়ান রডরিকের ছোঁড়া একটা বোমের স্প্লিন্টার ওর বাঁ পায়ে এসে লাগায় ও আর ছুটতে পারেনি। ছুটতে গিয়ে পড়ে গেছে। রডরিকরা বেগতিক দেখে ওকে ফেলে রেখেই পালিয়ে গেছে।

রডরিকরা সারেঙ লেনে আসতেই ওদের আসার খবর পৌঁছে গিয়েছিল মার্গারেট আর মে-র কাছে। প্রতিবেশীর একটা বাচ্চা ছেলে মে-কে খবরটা দিয়েছিল। রোজারিও ও রডরিক পরিবারের মধ্যে যে তুমুল ঝগড়া চলছে তা অনেকেই শুনেছিল। তাই বাচ্চা ছেলেটা ওদের আসতে দেখে একটা আন্দাজ করে মে-র কাছে ছুটে গিয়ে বলেছিল, "ভিভিয়ান আর স্ট্যানলি রডরিকরা আসছে।"

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মে আর মার্গারেট ভয় পেয়ে প্রথমেই ছুটেছিল ওদের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করতে। যাতে ভিভিয়ানরা অনায়াসে ওদের বাড়িতে প্রবেশ করতে না পারে। ওরা দরজা বন্ধ করে, দরজার ফাঁক দিয়ে ভিভিয়ানদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখছিল। আর ঠকঠক করে কাঁপছিল। ভিনসেন্টের বাড়ি আক্রমণ, বোমার আওয়াজ, রডরিকদের চিৎকার, উল্লাসের ধ্বনিতে মার্গারেটের কাঁপুনি স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছিল।

রডরিকরা চলে যাওয়ার পরও মিনিট দু'য়েক মার্গারেটরা অপেক্ষা করল। তারপর দরজা খুলে দৌড়ে গেল ভিনসেন্টের বাড়িতে। প্রায় সাত মিনিট ধরে রডরিকরা যে তান্ডব করে গেছে তার ফল দেখে ওরা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। ভিনসেন্টের কোন জ্ঞান নেই। মাথার পাশ দিয়ে রক্ত ঝরে চলেছে। ওর বড় অপরাধ ও মার্গারেট ও মে-র দাদা এবং ওদের সাময়িক আশ্রয় দেওয়া। যেটা রডরিকদের দু'ভাইয়ের পছন্দ না। সুতরাং তাকে তার কর্মের জন্য কিছু মাশুল তো দিতেই হবে।

ঘটনা ঘটার প্রায় দশ মিনিট পরে তালতলা থানার সাব-ইন্সপেক্টর তারাপদ দত্ত একটা ভ্যানে করে তিনজন কনস্টেবল সমেত সারেঙ লেনে হাজির। প্রাথমিক তদন্ত সেরে তিনি ভিনসেন্ট ও আহত রঞ্জিতকে পাঠিয়ে দিলেন নীলরতন সরকার হাসপাতালে। ওদের সঙ্গে ভ্যানে গেল ইভান। তাই ভাইদের কর্মকান্ডের খেসারত দিতে একমাত্র ইভানই ভিনসেন্টের সঙ্গী হলো। রঞ্জিতকে গ্রেফতার করে পাহারা দেওয়ার জন্য তারাপদবাবু দু'জন কনস্টেবলকে নিয়োগ করলেন।

ফিরে এলেন তেইশের সি-র ভিনসেন্টের ঘরে এবং ভিনসেন্টের স্ত্রী থেলমা ডি রোজারিও সমেত প্রত্যেককে নির্দেশ দিয়ে গেলেন, ঘটনাস্থল, ভিনসেন্টের ঘর যেমন আছে ঠিক তেমনই রেখে দিতে, কোনও কিছু অদলবদল না করতে।

থানায় ফিরে তারাপদবাবু রিপোর্ট লিখলেন। তখন ওই থানার লকআপে আটক

আছে রডরিকদের আর এক ভাই রুডলফ। ওকে ডেকে তারাপদবাবু ভিভিয়ানদের খোঁজ জানার চেষ্টা করলেন। তারপর সেদিন রাতে ওকে সঙ্গে নিয়ে তারাপদবাবু, সাব-ইন্সেপেক্টর মৃদুল রায়, হেড কনস্টেবল বি. এন. পাণ্ডে ও অন্য দু'জন কনস্টেবল ভিভিয়ানদের খোঁজে প্রথমে গেলেন নবাব আবদুল রহিম স্ট্রিটের একটা বাড়ির জুয়ার আড্ডায়, না সেখানে কাউকে পাওয়া গেল না। তারাপদ বাবুরা তারপর রুডলফের কথা মতো গেলেন ডাঃ সুরেশ সরকার রোডের অন্য একটা বাড়িতে। সেখানেও ভিভিয়ানরা কেউ আসেনি। খোঁজ নিলেন ধর্মতলা স্ট্রিটের নিজেদের বাড়িতে আসেনি। কোথায় ভিভিয়ান রডরিক স্ট্যানলি ও ওদের অন্য দুই সাকরেদ? রডলফ ওদের গতিবিধির খবর দিতে পারছে না কেন?

তারাপদবাবু, মৃদুল বাবুরা খালি হাতে রাত দু'টোয় থানায় ফিরে এলেন। এবং অব্যর্থ ভাবে ব্যর্থতার চোট হজম করল রুডলফ।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ তারাপদবাবু নীলরতন সরকার হাসপাতালে গেলেন রঞ্জিতকে জেরা করতে ও ভিনসেণ্ট শারীরিক অবস্থা দেখতে। হাসপাতালে গিয়ে প্রথমেই শুনলেন, ভিনসেণ্ট সব চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। বোনেদের রক্ষা করতে গিয়ে সে ভিভিয়ানের হাতে জীবন দিয়ে নতুন করে বেঁচেছে।

তারাপদবাবু ভিনসেণ্টের মৃতদেহটা দেখে তালতলা থানায় ফিরে এলেন এবং থানায় এসে জানতে পারলেন ভিনসেণ্ট খুনের মামলার তদন্তের ভার তালতলা থানার দায়িত্ব থেকে লালবাজারে গোয়েন্দা দফতর নিয়ে নিয়েছে। এবং নির্দেশ অনুযায়ী তারাপদবাবু সব কাগজপত্র নিয়ে তখনকার মার্ডার সেকসনের অফিসার ইনচার্জ শম্ভুদাস সরকারের হাতে সঁপে দিয়ে এলেন।

এবার শুরু হলো আসল তদন্তের কাজ। শম্ভুবাবু, আমাদের দফতরের অন্য অফিসার শিশুরঞ্জন দাস, বিধুভূষণ দত্ত ও ফরেনসিক দফতরের লোক নিয়ে ঘটনাস্থলে তদন্ত করতে গেলেন। এবং ব্যাপকভাবে তদন্ত ও মার্গারেট, মে, মিসেস এলিজাবেথ রোজারিও, ভিনসেন্টের স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে আর সারেঙ লেনের কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের জবানবন্দী নিয়ে ফিরে এলেন। ভিভিয়ান রোজারিও সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিল। ও আর ওর স্ত্রী মেরি ইয়ানো কারমেল রডরিকদের প্রতিটা কাজই প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিল। বাবার মৃত্যুর খবরে ওরা এত শোকগ্রস্থ ছিল যে স্বাভাবিকভাবেই জবানবন্দী নিতে শম্ভুবাবুদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পুলিশের কাজটাই এমন। এই রকম পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ঠিক কাজটা করে আসতে হয়।

তারপর শুরু হলো অন্য গুরত্বপূর্ণ কাজ। খুনীদের খুঁজে বার করে গ্রেফতার করা। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্ট্যানলি রডরিক তেরো তারিখের

ওর ডানপায়ের ক্ষত সারাতে গেল। ক্ষতটা হয়েছিল ঘটনার সময় সোডার বোতল ফেটে। হাসপাতালের আউটডোরে স্ট্যানলি নিজের নাম, ঠিকানা গোপন করে অন্য নাম লেখাল। ওখানে ও নিজের নাম বলল, মারভিন স্মিথ, তিন নম্বর, ইলিয়ট লেন। কিন্তু খবর এসে গেল। চৌদ্দ তারিখ ওই হাসপাতালের আউটডোর থেকেই তালতলা থানার অফিসাররা ওকে গ্রেফতার করে লালবাজারের অফিসারদের হাতে তুলে দিলেন। লালবাজারের সেণ্ট্রাল লক আপে ওর আস্তানা হলো।

ঘটনা ঘটার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচ আসামির মধ্যে দু'জন আমাদের হাতে। বাকি তিনজনের জন্য ব্যাপক জাল বেছানো শুরু হলো।

পঞ্চাশ ষাট দশকে একটা সুবিধা ছিল, কলকাতা ও শহরতলি এত ঘিঞ্জি হয়ে যায়নি। কোনও অঞ্চলে নতুন কেউ এলে সোর্সদের নজরে পড়ে যেত। তখন অল্প সংখ্যক সোর্স দিয়ে কাজও করা যেত। সোর্সরাও আমাদের কাজ করতে ভয় পেত না, এমনকী বহু সাধারণ মনুষও পুলিশকে অনেক খবর দিয়ে দিত মানবিক কারনেই, তাছাড়া অফিসাররাও সোর্সদের সঠিকভাবে দেখভাল করত। তাই খবর পেতে অনেক সুবিধা ছিল। সত্তর দশকের পর থেকে কলকাতায় সোর্স তৈরি করা ও তাদের পরিচর্যা করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। অপরাধটাও এই জনসমুদ্রে লুকিয়ে থাকার অতিরিক্ত সুবিধা পেতে লাগল।

রঞ্জিত মণ্ডল, ও স্ট্যানলিকে জলে ফেলে দিয়ে ভিভিয়ান সিমন ও কাঞ্জিলাল চলে গিয়েছিল কামারডাঙ্গা বস্তিতে। সাত নম্বর কামারডাঙ্গা রোডে থাকত বিজয় ও হোচো। হোচো ওর বাড়ি থেকে মিনিট পনের দূরত্বে মৌলালি বাজারে ও মাছ বিক্রি করত আর অন্য সময়ে ঘরামির কাজও করত। কাঞ্জিলাল ও রঞ্জিতের সঙ্গে ওর ছিল বন্ধুত্ব। তাছাড়া ওই বস্তির অন্য এক বাসিন্দা রজক নেবুলালের সঙ্গেও ছিল ঘনিষ্ঠতা। ভিভিয়ানরা তাদের মতো কাজ সমাধা করলেও রঞ্জিত মণ্ডলের গ্রেফতার ও স্ট্যানলির আহত হওয়ার ঘটনাটা ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না।

ভিনসেণ্টের বাড়িতে যুদ্ধ ও তার পরবর্তী ঘটনার জন্য ভিভিয়ানদের নেশার পারদ নেমে গেছে। সেটা না তুললে ওদের ঠিক মন বসছে না। হোচোকে গিয়ে ওর বাড়িতে ধরল।

সিমন হোচোকে বলল, "গুরু একটা বোতল জোগাড় করে দে।" হোচোর মা ভীষণ অসুস্থ। ও দায়িত্ব নিল না। নেবুলালের কাছে পাঠিয়ে দিল। নেবুলাল ওদের বসিয়ে বোতল ও খাবার জোগাড় করে দিল, ওরা খেতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর হোচোও ওদের সঙ্গে যোগ দিল। আস্তে আস্তে নেশার পারদ চড়তে শুরু করল। কিন্তু সিমন, কাঞ্জিলাল ও ভিভিয়ানদের অসংলগ্ন কথাবার্তায় হোচো আর নেবুলাল কিছুই বুঝতে পারল না। তবে একটা বড় ধরনের কোনও ঘটনা যে ওরা ঘটিয়েছে

তা আন্দাজ করতে পারল। কারণ ওদের সঙ্গে একদিকে একটা চটের ব্যাগের ভেতর রাখা আছে দশ বারোটা বোম। আর অন্য একটা একই ধরনের ব্যাগে রয়েছে তিন চারটে সোডার বোতল। ওইগুলি যে সাজিয়ে রাখা বা পান করার জন্য আনা হয়নি তা ওদের দু'জনের কাছেই পরিষ্কার।

হোচো একবার ওর প্রিয় বন্ধু রঞ্জিতের খবরাখবর জানতে চাইল, সিমনকে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁরে, রঞ্জিতের খবর কি? ও কোথায়?"

সিমন উত্তর দেওয়ার আগেই ভিভিয়ান মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, "ও গেছে শালা মাতাল, টাল সামলাতে পারে না।" হোচো আর নেবুলাল আর কোনও প্রশ্ন করল না। কিন্তু এই জবাবে ওরা খুশি হতে পারল না। তবু চুপ করে মদ খেতে লাগল।

ভিভিয়ান, সিমন আর কাঞ্জিলাল মাঝেমধ্যে ফিসফিস করে যে কথা বলছে তাতে ওদের সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো। এটা হোচোরা বুঝে গেছে যে ওরা কিছু একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে ওদের এখানে সাময়িক আশ্রয় নিতে এসেছে।

শীতকাল, ঝপ করে সন্ধ্যে নেমে এল। কখন যে এল, মাতাল বাহিনীর কারও হুঁশ নেই, হোচো শীত অনুভব করতেই বলে উঠল, "আমি বাড়ি যাচ্ছি, আলোয়ান আনতে। তোরা বস," হোচো উঠে চলে গেল।

ভিভিয়ান চিন্তিত ও দলের নেতা। একজন পুলিশের হাতে। স্ট্যানলি কোথায় জানে না। বাকি, দুজনকে লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব ওর। কোথায় যাওয়া যায়? রঞ্জিত ধরা না পড়লে এত চিন্তিত হতো না। রঞ্জিত ওদের সব গোপন জায়গাই জানে। পুলিশের জেরার মুখে ও তাদের বলে দিতে পারে। অবশ্য একটাই আশা, প্রথমে রঞ্জিতকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ওখানে পুলিশ ওকে বেশি জেরা করতে পারবে না। মারতেও পারবে না। এই ফাঁকে ওদের লুকিয়ে পড়তে হবে। মনে মনে ও ওর পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করে নিলো। নেবুলালকে বলল, "নেবুদা, কাঞ্জিলাল আর সিমন আজ রাতে তোমরা এখানে থাকবে। আমি এসে ওদের নিয়ে যাব। কালকেই আসব।"

নেবুলাল খানিকটা অবাক চোখে জানতে চাইল, "কেন, কি হয়েছে?"

ভিভিয়ান ডান হাতটা উঠিয়ে বলল, "সে তুমি পরে শুনবে, হোচোদাকেও বলে দেবে।" তারপর কাঞ্জিলাল ও সিমনদের বোমের ব্যাগ দুটো দেখিয়ে বলল, "ওই গুলি তোরা এখানে রাখ, আমি না আসা পর্যন্ত তোরা কোথাও যাবি না," সিমনরা মাথা নাড়ল। ভিভিয়ান উঠে পড়ল। ওর নেশা চড়ে গেছে। মে-কে না পেয়ে ও এমনিতেই প্রচণ্ড হতাশ। মার্গারেটকে পঙ্গু করতে না পারায় নিজেকে ব্যর্থই মনে করছে। ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে পা বাড়াল। ওখানেই রাত কাটাবে।

তেরো তারিখ রাতে ভিভিয়ান খালি কুঠিতে আরামে এ-ঘর ও-ঘর করে রাত কাটিয়ে দিল। চৌদ্দ তারিখ সকালে সে প্রথমে গেল নবাব আবদুল রহমান স্ট্রিটের মে রাফেলের বাড়ি। ওখানে একটা ঘরে ভিভিয়ান মাঝে মধ্যে থাকত। কিন্তু এটাও নিরাপদ নয় জেনে দুপুর বেলাই ও সরে পড়ল। নিরাপদ স্থানটা কোথায়?

মধ্য কলকাতায় আমাদের যত সোর্স ছিল তারা সজাগই ছিল। ভিভিয়ানকে ওরা ভালভাবেই চেনে। তাছাড় মৌলালির মোড়ে বৈদ্যনাথ পাণ্ডে সহ তিনজন কনস্টেবল নজরদারিতে বহাল হলো। কারন ওই অঞ্চল দিয়েই ভিভিয়ান ও তার সাকরেদের যে চালাফেরা চলছে সেই খবর আমাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।

সেদিন রাতেই আমাদের দুই অফিসার দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য ও এন কে দাশবর্মন মে রাফেলের বাড়িতে হানা দিলেন, কিন্তু যে ঘরটায় ভিভিয়ান থাকত সেটা বাইরে থেকে বন্ধ থাকায় তারা আর বাড়ির মালিককে কিছু না জানিয়ে ফিরে এলেন। ওখানে ভিভিয়ান নেই। খালি কুঠিতেও সোর্সদের নজর বাড়িয়ে দেওয়া হলো। খালি কুঠিতে ওর অবাধ যাতায়াত তা জানা গেছে। ভিভিয়ান ছিল এখন পালিয়েছে। এই খবরটা এল। ওর সঙ্গে খালি কুঠির একজন যৌনকর্মীও আছে। সেই খবরও পাওয়া গেল। অর্থাৎ ভিভিয়ান মধ্য কলকাতারই কোনও এক বাড়ির কোনও ঘরে আত্মগোপন করে আছে।

পনের তারিখ রাত এগারটার সময় লালবাজারে এক জরুরি বার্তা এল। বার্তাটা হচ্ছে, ভিভিয়ান তার সঙ্গিনীকে নিয়ে পঁয়ত্রিশ নম্বর ইসমাইল স্ট্রিটের একতলার একটা ঘরে আছে।'

অফিসার দিলীপ ভট্টাচার্য ফোর্স নিয়ে ছুটলেন। ওই বাড়িটা নিঝুম রাতে অন্ধকারে ঘিরে ফেললেন। তারপর ভেতরে লোকজনকে বাড়ির সদর দরজায় আঘাত করে খুলতে বললেন। কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়া শব্দই পেলেন না। বাড়ির পেছন দিকে একটা দরজা আছে, সেটা খুলে দিলীপবাবু নিঃশব্দে ঢুকতে চাইলেন, এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন ওই একতলা বাড়ির ছাদ থেকে কেউ উঁকি মেরে নীচের দিকে তাকিয়ে অবস্থাটা বুঝতে চাইছে। দিলীপবাবু অন্ধকারেও বুঝতে ও চিনতে পারলেন, 'ওটা ভিভিয়ান'। বেগতিক দেখে ভিভিয়ান পাশের বাড়িতে যাওয়ার জন্য লাফিয়ে নামল। দিলীপবাবুও কালবিলম্ব না করে ওই কার্নিশের ওপর উঠে গেলেন। ভিভিয়ান কার্নিশের উপরেই ছুটতে শুরু করেছে। দিলীপবাবু তার পেছন পেছন। ভিভিয়ান এবার উপায়ান্তর না দেখে পাশে একটা ছোট টিনের চালের ওপর দিল লাফ। ধড়মড় করে টিন সমেত ভিভিয়ান ভূপতিত। কার্নিশে দাঁড়িয়ে দিলীপবাবু দেখলেন। তিনি টিনের চালের পাশে খালি জয়গায় লাফিয়ে নামলেন।

ভিভিয়ান বেরিয়ে এসেছে। সমানেই ছুটছে, দিলীপবাবু ওর বাঁ হাতটা ধরলেন।

কিন্তু অসাবধানে শোল মাছ ধরলে যেমন শোল মাছ তার মসৃণ শরীরের সুযোগ নিয়ে হাত ফসকে ছিটকে বেরিয়ে যায়, ঠিক একইভাবে ভিভিয়ানের বাঁ হাতটা দিলপীবাবুর ধরা ডান হাত থেকে আলতোভাবে বেরিয়ে গেল।

দিলীপবাবু বুঝলেন পরিবেশের গন্ধে। যেখানে ভিভিয়ান লাফ দিয়ে পড়েছে, সেটা একটা খাটা পায়খানা। টিনের ছাদ ভেঙ্গে ভিভিয়ানের শরীর ওই পায়খানার মাটির টাবে ঢুকে গিয়েছে। আর তারই জন্য ওর শরীর মসৃণ এবং পরিবেশে দুর্গন্ধ। দিলীপবাবুর ডান হাতের তালুতেও তারই চিহ্ন।

ভিভিয়ান সামান্য এগিয়ে গেল। দিলীপবাবু তখন বাধ্য হয়ে তাঁর গায়ে জড়ানো আলোয়ানটা খুলে জালের মতো ধরে ভিভিয়ানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভিভিয়ান মুক্তির জন্য ছটফট করল। কিন্তু ততক্ষণে অন্য কনস্টেবলেরাও ওখানে হাজির। ওর আর নড়াচড়ার উপায় রইল না।

রাত একটা নাগাদ ভিভিয়ান গ্রেফতার হলো। ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ষোল তারিখ। ওকে তালতলা থানা ঘুরিয়ে দিলীপ বাবু লালবাজারে নিয়ে এলেন। মূল আসামি ভিভিয়ান গ্রেফতার হলেও আর দুজন আসামি তখনও ফেরার। তাদের ধরতে হবে। ষোল তারিখ সারাদিন নির্জলা। কোনও খবর নেই। ভিভিয়ান বেশ ভালই খাবার হজম করল। সিমনদের কোনও খবর ও প্রথমে জানাল না।

আসামিদের মধ্যে নেতাস্থানীয় কেউ গ্রেফতার হলে তাকে আমরা বেশ চাপে রাখি। কারণ ওদের কাছ থেকেই বেশি খবর পাওয়া যায়। ভিভিয়ান চট করে মুখ না খুললেও, প্রথা অনুযায়ী অসম্ভব চাপে রইল। অবশেষে সতেরো তারিখ সন্ধ্যেবেলা ভেঙ্গে পড়ল। জানিয়ে দিল। কামারডাঙ্গা বস্তিতে ওর বাকি দুই সাকরেদ লুকিয়ে আছে।

রঞ্জিত মণ্ডলকে নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে লালবাজারে সেদিন সকাল বেলাতেই নিয়ে আসা হয়েছিল। ঠিক হলো ওকে সঙ্গে নিয়েই কামারডাঙ্গা বস্তিতে হানা দেওয়া হবে। ও ওদের ওখানকার সব বন্ধুদের ঘরবাড়ি চেনে। সুতরাং ওই-ই দেখিয়ে দেবে। না দিলে কি অবস্থা হবে তা সে ভিভিয়ানের চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সেদিন রাতেই অফিসার দিলীপ ভট্টাচার্য সি. আর. দাশগুপ্ত, এ. কে. গুপ্ত, ও রঞ্জিতকে সঙ্গে নিয়ে দশ জন কনস্টেবলের বাহিনী নিয়ে ইন্টালি থানা এলাকার কামারডাঙ্গা বস্তিতে হানা দিলেন। রঞ্জিতের কথা অনুযায়ী হোচো ও নেবুলালকে ঘর থেকে বের করে আনলেন। তারাই দিলীপবাবুদের জানাল কোন কোন ঘরে কাঞ্জিলাল আর সিমন আছে।

কাঞ্জিলাল ছিল কামারডাঙ্গা রেলওয়ে কোয়ার্টারের একটা ঘরে। ধরা হলো।

একটু দূর বস্তির একটা পরিত্যক্ত কুঁড়ে ঘরে পাওয়া গেল সিমন দাস ওরফে বুড়োকে।

আঠারো তারিখ ভোরবেলা ওদের দু'জনকে তালতলা থানা ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হলো লালবাজারে। পাঁচজন বন্ধুকে মিলিয়ে দেওয়া হলো, অবশ্য বাইরে নয়, ভেতরে।

এবার ওদের একেবারে কারান্তরালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করার জন্য খুনের মামলাটা ভাল করে সাজিয়ে শুরু করতে হবে। যে ব্যাপারে শম্ভু দাস সরকারের জুড়ি নেই।

মামলা শুরু হলো এবং চৌষট্টি সালের সেপ্টেম্বর মাসের চার তারিখে ফৌজদারি চতুর্থ দায়রা আদালতের বিচারপতি এ কে দাশ জুরির বিচারে ভিভিয়ানদের শাস্তি ঘোষণা করলেন।

তিনি ভিভিয়ানকে ফাঁসির হুকুম দিলেন। স্ট্যানলিকে দশ এবং বাকি তিনজনকে ছ'বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

যদিও কলকাতার উচ্চন্যায়ালয় থেকে ভিভিয়ানের ফাঁসির হুকুম বহাল রইল না। বদলে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো। ভিভিয়ানরা প্রেসিডেন্সী জেলে সাজা খাটতে লাগল। তালতলা ও মধ্যকলকাতার অঞ্চল ভিভিয়ানের তাণ্ডব থেকে মুক্তি পেল।

এক এক করে স্মৃতির পর্দা সরালেই, আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে এক একটা কুখ্যাত অপরাধীর মুখ। এরা কেউ পেশাদার খুনী, কেউ ডাকাত, কেউ ধর্ষণকারী। পর্দার আড়াল থেকে উঁকি মারা মুখগুলি যেন বলছে, "আমাকে দেখ, ও বলছে ধুর, ও কটা খুন করেছে? আমাকে দেখ, আমি এই করেছি, সেই করেছি।" এ যেন দুষ্কৃতিদের স্টার, মেগাস্টার, সুপারস্টারদের মিছিল। এত 'তারকা সমাবেশ' থেকে কাকে রাখি, কাকে বাদ দিই সেটাও একটা কঠিন কাজ। এই তারকাদের মধ্যে কেউ গেছে মারা, কেউ আছে জেলে, কেউ আবার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজ কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত। কেউ পেয়েছে রাজনৈতিক আশ্রয়, কেউ বা সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকার হিসাবে জীবন শুরু করে জুয়োর বোর্ড, সাট্টার ফলাও কারবার, পেট্রল ডিজেলের চোরাই ব্যবসা থেকে পাখার কারখানা। তারপর ট্যাংকারের বিরাট ফ্লিট চালনা ও নিলামের অন্ধকার পথ থেকে বর্তমানে প্রমোটার ও হোটেল ব্যবসায়ী। সে এখন কোটি কোটিপতি, দারুণ ভদ্রলোক, তার দাক্ষিণ্য পেতে তার বৈঠকখানায় সকাল থেকে সাক্ষাৎপ্রার্থীর ঠেলাঠেলি ভীড়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সেই "সাহেবের" দেখা পাওয়া প্রায় ঈশ্বরপ্রাপ্তির সমান!

কলকাতা ও তার আশেপাশের এইসব দুষ্কৃতিদের মধ্যে রয়েছে কিছু মিল, কিছু অমিল। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগের হাওয়ার সঙ্গে তারা তাল মিলিয়ে নিজেদের অপরাধের পথ ও পন্থা পাল্টিয়ে নিয়েছে। বিচিত্র সেই সব পন্থা, মোডাস অপারণ্ডি। কেউ খুন করে ক্ষুর দিয়ে, কেউ বা চপার কিংবা ছুরি চালিয়ে, কেউ করে গুলি অথবা বোমা ছুঁড়ে। হাসতে হাসতে তার শত্রুকে খুন করার মধ্যেই তাদের আনন্দ। মানুষের জীবন তাদের কাছে কিছু না। নিজের অধিকার, নিজের সেচ্ছাচার বজায় রাখাই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। সেই স্বেচ্ছাচার বজায় রাখতে প্রয়োজনে নিজের দলের সদস্যদেরও নির্বিবাদে খুন করে। রক্ত ঝরানোই তাদের একমাত্র কাজ, রক্তই তাদের আরাধ্য দেবতা। আমার চোখের সামনে স্মৃতির ছায়াছবি পর্দায় যে মুখ প্রথম ভেসে উঠলো তার নাম পান্নালাল মিত্র।

ষাট সত্তরের দশকে শ্যামবাজার হাতিবাগান এলাকায় ফরিয়াপুকুরের পান্না মিত্রকে চিনতো না এমন কোনও লোক ওই অঞ্চলে ছিল না। সে ছিল ওই এলাকার ত্রাস। যদু মিত্র লেনে বস্তির গরিব কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে পান্না ছোটবেলা থেকেই এলাকার মস্তান হয়ে ওঠে। যখন তখন যাকে ইচ্ছে ধরে মারে, দোকানদার, ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষের থেকে জোর করে তোলা আদায় করে। আর এই সব

করতে করতে বানিয়ে ফেলে তার নিজস্ব এক সাম্রাজ্য ও তার গুণ্ডাবাহিনী। সেই গুণ্ডা বাহিনী নিয়ে সে আস্তানা গ'ড়ে যদু মিত্র লেনের ভেতরেই লালাজীর খাটালে। ক্রমে ওই খাটালের নাম হয়ে যায় পান্নার খাটাল। খাটালের ভেতরেই সে তৈরী করে তার অস্ত্রাগার। খাটালটা আস্তানা করাও আরও অন্য কারণও ছিল। তা হচ্ছে খাটালে এসে মিশেছে চারদিক থেকে চারটে রাস্তা, ফলে পান্না খাটালে বসেই চারদিকটা দেখতে পেত গলিগুলোতে কে ঢুকেছে, তার শত্রু, না পুলিশ, না অন্য কেউ। পালিয়ে যাওয়ার কিংবা সাবধান হওয়ার সুযোগ সে পেয়ে যেত। শত্রু হলে সে বেরিয়ে এসে আক্রমনের মোকাবিলা করতো। ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া রুলে জেল খেটে পান্না বেপরোয়া হয়ে উঠলো।

কালো, মাঝারি উচ্চতার, ছিপছিপে চেহারার, রক্তজবার মত চোখ নিয়ে পায়জামা শার্ট পরিহিত পান্না কালো রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে তার সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে খোলা তরোয়াল, বোম পটকা, ভোজালী হাতে আরব্য উপন্যাসের দস্যুদের মত এলাকা টহল দিয়ে বিক্রম দেখাতো। এটা বেশি করত তখনই যখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী লখিয়া তার বিরুদ্ধে কোন কারণে ফোঁস করতো। এই টহলের মধ্যে সে এলাকার বাসিন্দাদের বোঝাতে চাইতো যে সেই-ই এলাকার "শের"। তার বিরুদ্ধে কদম ফেলার অর্থ গর্দানে তরোয়ালের কোপকে আমন্ত্রণ করা। তার ভয়ে তার বিরুদ্ধে কেউ কোনও কথা বলতো না। যদি কেউ তেমন করার সাহস দেখাতো পান্না তার দলের লোকেদের পাঠিয়ে দিত। তারা সেই লোকের বাড়ি গিয়ে প্রথমেই সেই দুঃসাহসী লোকটার চুলের মুঠি ধরে, টানতে টানতে পান্নার খাটালী আদালতে বিচারক পান্নার পায়ের সামনে হাজির করাতো। ততক্ষণে "আসামীর" অর্ধেক চুল পান্নার বীর সৈনিকদের হাতের মুঠোয় উঠে এসেছে। খাটিয়ায় বসে পান্না বিচার করতো। প্রথমে ধাই ধাই করে "আসামীর" মুখের ওপর সজোরে লাথি মেরে। প্রথম লাথি খেয়ে "ধৃতব্যক্তি" ছিটকে পড়ে গেলে, পান্নার চেলারা তাকে ধরে নিয়ে আসতো আবার বিচারকের পায়ের সামনে। বিচারক পান্না মারতো আবার সজোরে লাথি। এইভাবে যতক্ষণ না তার নাক মুখ থেৎলে যেত ততক্ষন চলতো লাথির পর লাথি। শেষে, বিচারক পান্না, গর্জে বলে উঠতো "প্রথম বার দোষ করে ফেলেছে, তাই ছেড়ে দিলাম, এরপর করলে, শালা শেষ করে দিবি, আমার কাছে আর আনবি না।" বিচার শেষে সেই লোকটাকে পান্নার চেলারা টানতে টানতে যদুমিত্র লেনের বাইরে ফেলে দিয়ে আসতো। একবার তার চিরশত্রু লখিয়াকে পেয়ে গেল। তাকে ধরে মারতে মারতে নিয়ে আসলো তার আদালতে। লখিয়া ভয় পেয়ে পান্নার পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো, "আর তোমার বিরুদ্ধে যাব না গুরু, আমাকে মাপ করে দাও।" পান্না লখিয়ার অবস্থা দেখে হো হো করে হেসে উঠলো। লখিয়া যতই কাঁদতে থাকলো,

পান্নার ততই হাসির বেগ বাড়তে লাগলো। তার হাসির সঙ্গে সঙ্গীরা হো হো করে হাসতে থাকে। হঠাৎ বিকৃত রুচির ধারক পান্নার খেয়াল হল লখিয়াকে এমন শাস্তি দেবো যাতে লখিয়া কোনদিন তার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে না পারে। খাটিয়ায় বসে পান্না হুঙ্কার ছাড়লো। তারপর লখিয়াকে নিয়ে মনু ও বিশুকে দিয়ে লখিয়ার ওপর শাস্তি হিসাবে দাওয়াই প্রয়োগ করলো যা সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকেও লজ্জা দেবে। অকথ্য, ভাষাহীন, বিকৃত সেই শাস্তির পর লজ্জায় লখিয়ার মাথা নীচু থেকে নীচু হয়ে গেল, চোখ দিয়ে পড়তে লাগলো টপটপ করে জল। মিনিট খানিক পর পান্না লখিয়াকে পা দিয়ে সরিয়ে বলে উঠলো, যা এবার বাড়ি যা, আর কোনদিনও আমাকে কিছু করার সাহস দেখাস না। তোদেরকে আমি কুত্তা ছাগলও ভাবি না। আজকের পর নিশ্চয়ই মনে রাখবি কথাটা। সব শালাকে বলে দিবি তোকে যা করেছি, অন্যদেরও করে দেবো।" লখিয়া উঠে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

পান্না তার দলে পুষতো পকেটমার, ছিনতাইবাজ, চোর, ডাকাতসহ সবরকম সমাজবিরোধীদের। তার এক নম্বর চেলা জয়হিন্দ নন্দী সারাদিনই মদ খেয়ে থাকলেও পান্না দু'একদিন ছাড়া অন্য দিন গাঁজাতে চূড় হয়ে থাকতো। সমকামী পান্না পাল স্ট্রিটের তপু ঘোষ নামে একটা সুন্দর ছেলেকে রেখেছিল তার পার্টনার হিসাবে। যদিও জয়হিন্দ এক সময় তার সমকামী ক্ষুধা মেটাতো। শের-ই-ফরিয়াপুকুরের যদি ইচ্ছাহত সিনেমা দেখার তবে ছুটলো তার কোন চেলা হাতিবাগান অঞ্চলের কোন সিনেমা হলে। হলের ম্যানেজারকে বলে আসতো, "দাদা আজ সিনেমা দেখতে আসবে।" ব্যাস, ম্যানেজার পান্নার জন্য শুধু চেয়ারই ফাঁকা রাখতো না, সে যেখানে বসতো তার আশপাশের অনেকগুলো চেয়ার খালি রেখে দিত। পান্না ছবি শুরু হবার আগে বীরদর্পে তপুকে নিয়ে তার জন্য রক্ষিত চেয়ারে গিয়ে বসতো। আর অন্য চেলারা সিনেমা হলের গেট থেকে চারদিক পাহারা দিত যাতে অবাঞ্ছিত কেউ না আসে।

পান্না বহু খুন জখম করলেও বুদ্ধি করে প্রমাণ লোপ করে দিত, তাই গ্রেফতার এড়িয়ে চলতো পারতো। তার দলে ছিল মোহনবাগান ক্লাবের এক সময়কার গ্রাউণ্ড সেক্রেটারির ছেলে তিলক, সে তার বাবার দক্ষিণ কলকাতার বাড়ি ছেড়ে পাইকপাড়ায় থাকতো ও পান্নার হয়ে মস্তানী করে বেড়াতো। দলে ছিল 'বিদ্যা', 'যতু', 'শেলু' টালাপাড়ার 'গুয়ে'। এরা কেউ পান্নার ডানহাত কেউ বাঁ হাত। বিদ্যা পরে দল ছেড়ে পান্নার শত্রু হয়ে যায়। কিন্তু পান্নার সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল তারই একসময়কার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ জয়হিন্দ। যখন স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র হেমেন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে পান্নার দলে ভিড়লো, তখনই পান্না জয়হিন্দের বদলে হেমেনকে তার প্রধান সেনাপতি করে নিল।

জয়হিন্দ ছিল পুরো মাতাল, নারী ধর্ষণকারী এবং যখন তখন গণ্ডগোল তৈরি করার ওস্তাদ। অন্যদিকে হেমেনের কোন নেশা ছিল না, নারীদের প্রতি নিরাসক্ত, কিন্তু প্রচণ্ড গায়ের জোরের অধিকারী ও আক্রমনে সাহসী। তাই বুদ্ধিমান পান্না তার প্রধান সেনাপতির পদটা জয়হিন্দ থেকে নিয়ে হেমেনের হাতে সঁপে দিল। ফলে জয়হিন্দ পান্নার দল ছেড়ে নিজেই একটা দল গড়ে নিল। এর ফলে প্রতিদিনই জয়হিন্দের দলের সঙ্গে হেমেনের নেতৃত্বে পান্নার দলের বোমাবাজি শুরু হয়ে গেল এলাকা বাড়িয়ে ও তার ওপর কব্জা রাখার জন্য। বোমাবাজিতে ওই অঞ্চল দিন দুপুর, রাতে সবসময় যখন তখন কেঁপে উঠতো। জয়হিন্দরা পান্নার দলকে রাতের বেলায় আক্রমণ করতো আর পান্নারা দিনের বেলায়। জয়হিন্দের দলের টিপুকে হেমেন মারলো। জয়হিন্দরা পাল্টা প্রতিশোধ নিতে পান্নাদের প্রতি আক্রমণ করলো। পান্নারা সেটা প্রতিরোধ করার পর জয়হিন্দরা তিনজন একটা ট্যাক্সিতে পালাতে থাকে, পান্নারা অন্য একটা ট্যাক্সিতে চড়ে তাদের তাড়া করতে করতে গণেশ সিনেমার সামনে আসলে পান্নারা জয়হিন্দের ট্যাক্সিতে বোমা ছুড়ে মারলো। জয়হিন্দ বেঁচে গেলেও তার দলের একজন ট্যাক্সির ভেতরেই মারা গেল। পান্নার সঙ্গী ছিল সে।

এক বছর পর পান্না জেল থেকে ছাড়া পায়। সে প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল। প্রেসিডেন্সিতে তখন বন্ধ ছিল হিন্দ সিনেমা অঞ্চলের কুখ্যাত মস্তান বসন্ত সাউ। সেখানে বসন্তের সঙ্গে পান্নার ঝগড়া হয়। গণ্ডগোলের মূল কারণ কে বড় মস্তান। বসন্ত পান্নাকে বলে সে ছাড়া পেলে পান্নাকে পান্নার আস্তানায় গিয়ে মেরে বুঝিয়ে দিয়ে আসবে কে বড়, কার শক্তি বেশি। যেমন কথা তেমন কাজ। বসন্ত ছাড়া পাওয়ার ক'দিন পর তার দলকে নিয়ে ক'টা ট্যাক্সিতে চেপে রাত আটটা নাগাদ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চললো পান্নাকে পান্নার ঘাঁটিতে মারার জন্য। পান্না যথারীতি তার খাটালের গড়ে সঙ্গীদের সঙ্গে আড্ডা মারছিল। হঠাৎ সে দেখতে পায় পর পর ক'টা ট্যাক্সি যদু মিত্র লেনের মুখে এসে দাঁড়ালো এবং তার থেকে নামলো এক এক করে বসন্ত সাউয়ের ছেলেরা ও বসন্ত নিজে।

পান্না গাঁজার কলকেটা হাত থেকে নামিয়ে খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ভাবলো, বসন্তের এত বড় সাহস যে তারই দূর্গে তাকে খুন করতে এসেছে! পান্নার সঙ্গে তার সঙ্গীরা চট্‌পট্ উঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। সব কিছু এত দ্রুত হল যে ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা তখনও ষাটবার টিকটিক করেনি।

শুরু হয়ে গেল, বৃষ্টির মত বোমাপাত। শ্যামপুকুর অঞ্চলের বাসিন্দাদের বোমাবাজিতে অভ্যস্ত হলেও তারাও এত বোমাবর্ষণে কেঁপে উঠলো। বারুদের ধোঁয়া আশেপাশের বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে মেঘের মত আস্তরণ তৈরী করলো।

বারুদের গন্ধে চারধার ছয়লাপ। ধুপ ধুপ ছোটাছুটি, চিৎকার, গালিগালাজের মধ্যে কে কোন দিকে যাচ্ছে, কোন দিকে ছুটছে বোঝা যাচ্ছে না।

আধঘণ্টা বোমাবাজি, তলোয়ারের ঝংঙ্কারের পর দেখা গেল বসন্তের ছেলেরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছে। বসন্ত ধরা পড়ে গেছে। যুদ্ধবন্দী নিয়ে অন্ধকার জগতে আন্তর্জাতিক কোন চুক্তি আছে কি না তা পান্নার জানা নেই। পান্না ও তিলকরা বসন্তকে মারতে লাগলো। বসন্তের হাত পা ভেঙ্গে দিল, ছুরি দিয়ে পিঠ পেট ফাঁসিয়ে দিয়ে তাকে একটা চটের বস্তায় পুরে শ্যামবাজার খালের ধারে ফেলে দিয়ে আসলো। কিছুক্ষণ পর খালধারের বস্তির ক'টা লোক সেই বস্তাটা দেখতে পেয়ে সেটা টেনে একটু ওপরে নিয়ে আসলো। রক্তে ভেসে যাওয়া সেই বস্তার বাঁধা মুখটা খুলে তারা হতবাক হয়ে দেখলো একটা মানুষ, তখনও তার মুখ দিয়ে ক্ষীণ আওয়াজ বের হচ্ছে। তারা ধরাধরি করে তাকে নিয়ে চলল আর জি কর হাসপাতালে। বসন্তকে ভর্তি করিয়ে দিল হাসপাতালে। বেশ অনেকদিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর বসন্ত বেঁচে গেল।

বসন্তকে নিস্ক্রিয় করার পর উত্তর ও মধ্য কলকাতায় এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে পান্নার দাপট আরও বেড়ে গেল। সে যা ইচ্ছা তাই করতে লাগলো। একদিন সন্ধ্যাবেলা পান্না তার সঙ্গীদের অনুরোধে গাঁজার বদলে দেশি বাংলা মদ খেতে শুরু করলো। মদ খেয়ে পান্না টং। উঠে দাঁড়ালো। পকেটে হাত দিয়ে দেখলো টাকা বেশি নেই। পান্নার পকেটে টাকা কম তো কি হতে পারে? কি করছে এলাকার বাসিন্দারা? সে কোমরে ছুরি গুঁজে হাতে একটা বোমা নিয়ে খাটাল থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসলো।

রাত তখন নটা। পান্না এসে দাঁড়াল একটা লেদ মেসিনের কারখানার সামনে। কারখানার মালিক তাঁর অফিসের গদিতে বসে আছেন। পান্না তাকে এসে বললে, "টাকা দে।" মালিক পান্নার অত্যাচারে অভ্যস্ত। তিনি পান্নাকে বললেন, "এখন নেই, পরে দেবো, তুই যা।" পান্না তাকে গালাগালি দিয়ে বললো, "আমি কি যেতে এসেছি। টাকা দিয়ে দে বলছি, নয়তো বোমা মেরে তোর মুণ্ডু উড়িয়ে দেবো।" পান্না তার হাতে ধরা বোমটা তার মুখের সামনে তুলে দেখালো। পান্নাকে প্রতি মাসেই সে মাসোহারা দিয়ে থাকে, তাই সে ভাবলো পান্না বোধহয় তারসঙ্গে ইয়ার্কি মারছে। তিনি তাই বোমাটাকে ভয় না পেয়ে বললেন, "এখন যা বলছি, টাকা দিতে পারবো না।" পান্না ওর কথা শুনে রেগে গিয়ে বলল, "কি টাকা দিবি না, তবে বোমা খা।" পান্না হাতখানিক দূর থেকে ছুঁড়ে মারলো হাতের বোমাটা মালিকের বুক লক্ষ্য করে। বিকট আওয়াজে তা ফেটে অন্ধকার করে দিল গদি। অন্ধকার কাটলে দেখা গেল মালিক অসংখ্য ক্ষত নিয়ে গদির দেওয়ালে ছিটকে গেছে, রক্তে ভেসে

গেছে গদি। তার কর্মচারীরা ছুটে এসে দেখলো, তাদের মালিক আর বেঁচে নেই। অন্যদিকে পান্নাও ছটফট করছে, তার দু'জন সঙ্গী তাকে নিয়ে পালালো। পান্নার এক হাতের তিনটে আঙুল বোমার আঘাতে ছিটকে কোথায় চলে গেছে, একটা চোখে বোমার টুকরো ঢুকে তার থেকে দরদর করে ঝরছে রক্ত।

পান্না বেঁচে যায়। কিন্তু একটা চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়াতে তার নাম হয়ে গেল কানা পান্না। এবার পান্না ধরা পড়ে এবং লেদ কারখানার মালিককে হত্যার অপরাধে যাবজ্জীবন সশ্রম সাজা হয়ে যায়। আবার সে ঢুকে যায় প্রেসিডেন্সি জেলে। পান্নার জেলে চলে যাওয়াতে তার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। হেমেন চলে যায় অন্যখানে। এই সুযোগে শ্যামবাজার, হাতীবাগানে দুষ্কর্মে এগিয়ে আসে বোচা ব্যানার্জী। তার দলে ছিল শেখ কাল্লু, স্বপন, ভানু, বাচ্চা। এরা কেউ পকেটমার, কেউ ছিনতাইবাজ। আর রাতে এদের কাজ ছিল মালবোঝাই লরি থেকে বস্তা নামানো। সেই বস্তাতে চাল থাকুক কি চিনি তা দেখার দরকার নেই। একটা হলেই হল। এরা অন্য প্রদেশ থেকে আসা লরি থেকে ভেড়া, পাঁঠা, গরু যখন যা পেত লরি থেকে থামিয়ে নামিয়ে নিত। আর চুরির সর্দার ছিল কানাই ঘোষ ও কানাই ভণ্ডুল। সেই বোচারা ভবনাথ সেন স্ট্রিটের ভেতরে একটা কাঠগোলায় চোলাই মদের দোকান ছিল। সেখানে একবার চোলাই মদে বিষক্রিয়ার জন্য শ দেড়েক লোক মারা যায়। বোচা বেশ কিছুদিনের জন্য এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

অন্যদিকে জেলখানায় ঢুকেই পান্না জেলারের সহযোগিতায় বানিয়ে ফেলেছে ছোটখাটো কয়েদী ও বিচারাধীন বন্দিদের ওপর জুলুম করার এক বাহিনী। পান্না তখন জেলের ভেতর "মেইট" বা "মেট", যাদের জেলের ভেতর কয়েদিদের খাটানোর জন্য নিয়োগ করা হয়, তাদের কোমরে থাকে বেশ চওড়া একটা চামড়ার বেল্ট। কয়েদিরা সেই বেল্টকে আদর করে ডাকে "পেটি"। বেল্টের মাথায় স্টিলের পাত, আর সেই পাতের ওপর ইংরাজীতে লেখা থাকে কনভিক্ট ওভারসিয়ার। এটাই তাদের খবরদারী করার পরিচয়পত্র। এই বেল্ট খুলে মেটদের যখন তখন সাধারণ বন্দিদের ওপর মারার অলিখিত অনুমতি জেল কতৃপক্ষ দিয়ে থাকে। সাধারণতঃ যাবজ্জীবন ও বহু বছরের সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মেট করা হয়, এই মেটেরা জেলের ভেতর আধিপত্য বিস্তার করে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, একটা আলাদা অত্যাচারী শ্রেণী হিসাবে জেলের ভেতর শাসন ও শোষণ চালায়। পান্না সেই মেট বাহিনীর নেতা হয়ে যায়। আর তাদের সহাযোগিতায় শুরু করে দারুণ এক রমরমা ব্যবসা। পঁচাত্তরের জরুরি অবস্থার সময় "কাফে পোসা" আইনে ধৃত সব মাড়োয়ারী, গুজরাটি, সিন্ধি ব্যবসায়ীদের প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হত। এক একজন ব্যবসায়ী জেল গেটের ভেতর ঢুকলেই জেল কর্মচারীদের সামনেই কানা পান্না ও তার দুই

জেল সাকরেদ বাবুলাল বাজপায়ী খুনের মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত সুবল কুণ্ডু ও খান্না সিনেমার পাশে এক পরিবহন ব্যবসায়ীর অফিসে ডাকাতির অভিযোগে ধৃত আট বছর কারাদণ্ড প্রাপ্ত জেলবন্দি পান্নার পুরানো চেলা জয়হিন্দ নন্দীকে নিয়ে তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়তো। পান্না তার তিন আঙুলহীন হাত দিয়ে ব্যবসায়ীদের থুতনিটা তুলে ধরে প্রথমেই শোনাতো, "শুন, পানি কা শত্রু পানা আউর দুনিয়াকা শত্রু কানা।" সেই কথায় সারা মুখে বসন্তের দাগ নিয়ে পাশে দাঁড়ানো সুবল ভুঁড়ি দুলিয়ে খ্যাঁ খ্যাঁ করে খেঁকশিয়ালের মত হেসে উঠতো। আর জয়হিন্দ লাগিয়ে দিত এক রদ্দা। ভীত ব্যবসায়ীরা ওদের তিনজনের মূর্তি দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকতো। এরপর পান্নার হুমকি, "লেখ শালা ঘর মে খত, পঞ্চাশ হাজার রুপিয়া মাঙ্গাও।" ততক্ষণে পরিস্থিতি দেখে ব্যবসায়ীরা বুঝে যেত, এদের সঙ্গে আতাঁত না করলে এরা জেলের ভেতর অত্যাচার করে টিকতে দেবে না। কারণ পান্নারা সবই করতো জেল কর্মচারীদের সামনেই। ব্যবসায়ীরা ভয়ের চোটে চিঠি লিখে দিত। সেই চিঠি নিয়ে ছুটতো কানা পান্নার অনুগত জেল সিপাইরা ব্যবসায়ীর বাড়িতে কিংবা অফিসে, যে যেমন ঠিকানা বা নির্দেশ দিত সেই অনুযায়ী। টাকা আসতো পান্নার হাতে। পান্না এবার সেই টাকা থেকে জেল সুপারিটেনডেন্ট, জেলার থেকে শুরু করে অনুগত সিপাই পর্যন্ত বাটতে শুরু করতো। তারপর সুবল ও জয়হিন্দকে কিছুটা দিয়ে মোটা অংকটা নিজের কাছে রাখতো। পরদিন তার ভাইপো জেলখানায় তারসঙ্গে দেখা করতে আসলে সেই টাকা তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিত। টাকা চলে আসতো যদু মিত্র লেনে। এইভাবে কানা পান্নার তখন প্রতিদিন রোজগার ছিল ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা। জেলে বসে কোন বন্দি এত টাকা জেল থেকে রোজগার করেছে কী না সারা পৃথিবীর গবেষকদের কাছে তা একটা বিশেষ গবেষণার বিষয় হতে পারে। ব্যবসায়ীরা টাকা দিয়েও শান্তি পেত না। তাদের প্রতিদিনই খুচখাচ নজরানা দিতে হত পান্না ও সুবলদের। তা সেটা হীরা, চুনি সহ বিভিন্ন রকম পাথর কিংবা বিদেশী ঘড়ি থেকে শুরু করে দামী সিগারেট পর্যন্ত একটা না একটা কিছু। জেল কর্তৃপক্ষের বেআইনী অনুমতিতে ব্যবসায়ীদের বাড়ি থেকে প্রতিদিন আসতো খাবার। সেই খাবার ব্যবসায়ীদের হাতে যাওয়ার আগে পান্নাদের ভোগে লাগতো। তারপর উচ্ছিষ্ট যেত নির্দিষ্ট লোকের হাতে।

একবার এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী পান্নার নির্দেশ অনুযায়ী চিঠি লিখতে অস্বীকার করলো। সে পরিষ্কার জানালো, তার কাছে অত টাকা নেই, সুতরাং সে টাকা দিতে পারবে না। তার উত্তর শুনে পান্না আশ্চর্য হয়ে গেল, এত বড় দুঃসাহস? পান্নার ওপর কথা? পান্না রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। সে তাকে টানতে টানতে জেলের ভেতর নিয়ে গেল। ততক্ষণে পান্না দেখে নিয়েছে সেই ব্যবসায়ীর একটা

দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। পান্না এবার তাকে একটা চাতালে চিৎ করে ফেললো। তারপর তার বুকের ওপর দু হাঁটু দিয়ে চেপে চেপে রগড়াতে লাগলো। পান্নার আদেশে তার এক অনুগত কয়েদী ছুটে জেলখানার রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসেছে একটি সাঁড়াশি ও নোড়া। পান্না এবার ব্যবসায়ীর মুখ ফাঁক করে সেই সাঁড়াশিটা ঢুকিয়ে দিয়ে সোনা বাঁধানো দাঁতটা গায়ের জোরে টানতে লাগলো। ব্যবসায়ীর চিৎকার সারা প্রেসিডেন্সি জেলের বন্দিরা শুনতে পেল। প্রেসিডেন্সি জেলে তখন বন্দি ছিল কয়েকশ নকশাল ও অন্য রাজনৈতিক পার্টির কর্মীরা। ছিল আজিজুল হক, নিশীথ ভট্টাচার্য্য। তারা কেউ কিন্তু পান্নার বিরুদ্ধে কিছু বললো না। তারা নীরব দর্শক হয়ে রইলো। তারা হয়তো ভেবেছিল, 'শ্রেণীশত্রু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর দাঁতটা উপড়ে ফেলার কাজটা কমরেড কানা পান্না ঠিকই করেছে।" অন্যদিকে ব্যবসায়ীর সেই চিৎকার উপভোগ করতে লাগলো পান্নার বীরত্ব দেখার জন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুবল ও জয়হিন্দরা। টানের চোটে মাড়ির একটা অংশ সমেত দাঁতটা উঠে এল পান্নার হাতে। ব্যবসায়ীর মুখ দিয়ে পড়তে লাগলো গলগল করে রক্ত। আর সেই রক্তমাখা দাঁতটা দু'হাতে নিয়ে পান্না নোড়া দিয়ে থেৎলিয়ে দাঁত থেকে খুলে নিল ছোট সোনার পাতটা। কাঁচা দাঁতের টুকরোগুলো পান্না ব্যবসায়ীর মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে তার বুক থেকে উঠে দাঁড়ালো বিজয়োল্লাসে। জল দিয়ে রক্ত ধুঁয়ে সে পকেটে রেখে দিল সোনার টুকরোটা। যন্ত্রণায় কাতর চাতালে পড়ে ছটফট করতে থাকা সেই ব্যবসায়ীকে দর্শকের ভূমিকায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন সিপাই নিয়ে চলল জেল হাসপাতালের দিকে। পরদিন সকালে ডাক্তার ওই ক্ষত দেখে জানতে চাইলেন, কে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। যখন তিনি শুনলেন পান্নার নাম, তিনি চুপ করে গেলেন। কারণ তাকেও যে জেলখানায় আসতে হয় চাকরি বজায় রাখার স্বার্থে। পান্নার আগে জেল থেকে ছাড়া পায় সুবল, সে জেল থেকে বেরিয়ে উত্তর কলকাতার এক "খাঁটি নকশাল নেত্রীকে" বিয়ে করে। যার সঙ্গে তার প্রেসিডেন্সি জেলেই আলাপ হয়, ঘনিষ্ঠতা হয়। এ যেন দমদমের মা, বাবা, ঠাকুর্দা ও ঠাকুর্মা হত্যাকারী সুদীপা ও ডাকাতির আসামী রাজুর প্রেম কাহিনীর প্রথম পর্বের চিত্ররূপ।

জেল খেটে পান্না বেরিয়ে আসলো যদু মিত্র লেনে। সেখানে দেখলো ভাইপো তার টাকায় তিনতলা বিশাল বাড়ি বানিয়েছে। প্রথমে আনন্দ হল কিন্তু তারপরেই জানলো কোন কিছুই তার নামে নয়, সবই ভাইপোর নামে। তাকে সেই বাড়িতে ভাইপো দয়া করে একতলার একটা ছোট ঘরে থাকতে দিল। জেল থেকে টাকা রোজগারের রেকর্ডের জন্য যার নাম গিনিস বুক অফ রেকর্ডে নাম ওঠার কথা সে এবার দেশি বাংলা মদ খেতে শুরু করলো এর ওর থেকে ভিক্ষা করে। হতাশায় মদ খাওয়াটাই তখন কানা পান্নার ধ্যানজ্ঞান হয়ে গেল। মদ খেয়ে পান্না হয়তো তার

ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবতো তার অতীতের বীরত্বের কথা। কিংবা হয়তো ভাবতো, চোরের ওপর তার ভাইপো বাটপারি করে তাকে উচিত শাস্তিই দিয়েছে। সে যেমন মানুষের ওপর অত্যাচার করে টাকা আদায় করেছে, তাকে এরকম দয়ার ভাত না খেলে সে কি করে বুঝবে মানুষের দুঃখ? পান্নার আর তখন নতুন করে মস্তানী করার বয়স ও গায়ের জোরও নেই। তাছাড়া এত বছরের ব্যবধানে তার সাম্রাজ্য অন্যের হাতে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে, সেখানে গজিয়ে গেছে নতুন নতুন সব মস্তান। যারা আর বুড়ো পান্নাকে পাত্তাই দিত না। শুধু মাঝে মাঝে "গুরুদক্ষিণা" হিসাবে ওই বাংলা মদের দামটাই দিত। হতাশ পান্নার এসব সহ্য হত না। তাই সে খালি মদ খেত আর ঘরে এসে শুয়ে থাকতো। একদিন সকালে দেখা গেল পান্না মিত্র তার ঘরে মরে পড়ে আছে। পান্না মারা গেলেও তার চেলা চামুণ্ডারা কিন্তু বেঁচে আছে। এবার তাদের পালা।

পান্না জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগে জয়হিন্দ জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সে পকেটমার হিসাবে জীবন শুরু করে পান্নার প্রধান সেনাপতির পদ অলংকৃত করে এবং সেই সেনানী ছেড়ে নিজের একটা সেনার দল গড়েছিল। জয়হিন্দ থাকতো মোহনবাগান লেনে। সে তার নতুন বাহিনী নিয়ে মত্ত অবস্থায় ওই এলাকার বাসিন্দাদের ওপর যা ইচ্ছা তাই করতে লাগলো। সন্ধ্যের পর থেকেই মদ খেয়ে জয়হিন্দ রাস্তায় যে কোনও মহিলা পেলেই তাকে জাপটে ধরে টেনে তার ডেরায় নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করতো। একদিন সন্ধ্যেবেলা সে মদ খেয়ে তার বিরোধীদলের লোক হিটুর বৌকে জড়িয়ে ধরে। হিটুর বৌ দৌড়ে সে যাত্রা পার পেয়ে যায়। হিটু এরপর জয়হিন্দের এই কাজের প্রতিশোধ নিতে গোপাল যাদবকে এসে বলে এবং জয়হিন্দকে খুন করার জন্য তাকে বোমা বানানোর টাকা দেয়। গোপাল সেই টাকা নিয়ে হাওড়ার ঘোঁসুটি থেকে বোমা বানিয়ে নিয়ে আসে কিন্তু জয়হিন্দকে না পেয়ে সে জয়হিন্দের দলের ছেলে পালের ভাইকে মারে। জয়হিন্দ ছিনতাই, ডাকাতি, পকেটমারীর দল তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার টিকিটের কালোবাজারীর ব্যবসাও চালাতো। টকী শো হাউস, মিত্রা, দর্পনা সিনেমার বেশির ভাগ ব্ল্যাকারই ওর দলের ছিল। এই নিয়ে অন্যদলের ব্ল্যাকারদের মারপিট ওই অঞ্চলের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইসব ঘটনার জেরেই একদিন ফরেপুকুরের মসজিদের সামনে রতন ভৌমিক, প্রদীপ ভৌমিক ও রুবি রুদ্ররা তাকে ধরে চপার দিয়ে মারলো। চপারের আঘাতে ওর হাত, মুখ, পিঠ সব চিরে চিরে গেল, কিন্তু জয়হিন্দ প্রাণে বেঁচে গেল। ওর কিছুদিন পর ঊনসত্তর সালে ডিসেম্বরের দু'তারিখে দিনের বেলা শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ের কাছে মোহনলাল স্ট্রিট ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোডের কাছে শ্যামবাজার হোটেলের সামনে হেমেনের দলের ছেলে ও জয়হিন্দের

ছোঁড়া বোমায় মানিকতলা থানার কনস্টেবল পরশুরাম রাই খুন হয়ে গেল। তার গোপন ডেরায় হানা দিয়ে প্রচুর বোমা, বোমার মশলা, রক্তমাখা জামাকাপড় ইত্যাদি উদ্ধার হল। জয়হিন্দ সেই কনস্টেবল হত্যার মামলায় গ্রেফতার হল। ডাকাতির মামলায় ছাড়া পাওয়ার ক'দিনের মধ্যে আবার জয়হিন্দ প্রেসিডেন্সি জেলে ঢুকে গেল। জেলে ওর কোনও অসুবিধাই হয় না। গ্রেফতার হয়ে আসা জেল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ নতুন নতুন আসামীদের প্রথমে যেখানে জেলে রাখা হয় সেই "আমদানি ডরমিটরি" যা জেলের ভাষায় আমদানি ফাইল বলা হয়। সেখানে আসামীদের ওপর অত্যাচার করে রোজগার তো হয়ই, তাছাড়া তার সমকামী ক্ষুধা মেটানোরও সাথী সে সেখান থেকেই জোগাড় করতো। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশিদিন তার পার্টনার হিসাবে টিকেছিল নকশাল তরুণ বিমলেন্দু ঘোষাল। তবে কনস্টেবল হত্যা মামলায় সে মুক্তি পেয়ে গেল। মুক্তি পেয়ে আবার সে তার পুরানো জায়গায় ফিরে এসে শুরু করলো তার কাজকর্ম। ছিনতাই, রাহাজানি, তোলা আদায়, দুষ্কর্মের সবকিছুতেই তার হাত পাকা। সে পুরোমাত্রায় সেইসব চালাতে লাগলো। পাঁচুকে সঙ্গী করে হাড়ি নামে একরকম জুয়া খেলাতো। সে ছিল নিষ্ঠুর। কাউকে বিশ্বাস করতো না। যখন তখন যাকে খুশি মারতো। একদিন তার পুরানো দোস্ত রঞ্জার সঙ্গে সন্ধ্যেবেলায় মোহনবাগান লেনের মোড়ে দেখা। রঞ্জা জয়হিন্দকে বললো, "কি গুরু, অনেকদিন খাওয়াচ্ছো না, আজ একটু হবে টবে না কি?" একসময়কার সুদর্শন জয়হিন্দ হেসে বললো, "এ এমন কি, আজই চল তোকে খাওয়াচ্ছি। তোর সঙ্গে অনেক দিন বসা হয়নি।" তারপর তার পাশে দাঁড়ানো তার সাকরেদ সোনাকে টাকা দিল দেশি বাংলা মদের বোতল ও কষা মাংস নিয়ে আসতে। টাকা দিয়ে রঞ্জাকে বললো, "চল বে।" রঞ্জার তখন জিবে জল এসে গেছে। সেই জল টানতে টানতে রঞ্জা চললো জয়হিন্দের পেছন পেছন। তারা এসে উঠলো জয়হিন্দের সন্ধ্যের মজলিসি ঘরে।

সোনার বেশিক্ষণ দেরি হল না? নাটা শংকরের দোকান থেকে মদের বোতল ও কষা মাংস আনতে। সে বোতল ও মাংসের ভাড় নামিয়ে রাখলো রঞ্জাদের সামনে। শুরু হলো তাদের কষা মাংস সহযোগে মদ্যপান ও পুরানো দিনের "মস্তানীর গৌরবগাথা" নিয়ে আলোচনা ও আড্ডা। তাদের অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় সোনাও মাঝে মধ্যে যোগ দিল। এইভাবে খোশমেজাজে আড্ডা মারতে মারতে কখন যে ঘড়ির কাঁটা এগোতে এগোতে রাত বেড়ে গেল কেউ খেয়াল করলো না। ইতিমধ্যে বোতলের পর বোতল উড়ে যেতে লাগলো। ঢুলুঢুলু চোখে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ জয়হিন্দ পকেট থেকে একটা মাঝারি মাপের চকচকে ছুরি বার করে মিটিমিটি হাসতে হাসতে একটা পাথরে ঘষে ঘষে সেটা আরও ধারালো করতে লাগলো।

রঞ্জার তখন বেশ নেশা ধরেছে, সে মনোযোগ দিয়ে তার প্রিয় বন্ধুর ছুরিতে শান দেওয়া দেখতে লাগলো। হঠাৎ জয়হিন্দ কথা বলতে বলতে ছুরির ডগাটা রঞ্জার বাঁ গালের উপরের দিকে বসিয়ে দিয়ে মারলো নিচের দিকে এক টান। পুরো গাল জুড়ে বেগৎখানিক হাঁ, আর সেই কাটা গাল দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো ঝরঝর করে। রঞ্জার তখন নেশা উবে গেছে। দু'হাত দিয়ে গাল চেপে ছুটতে ছুটতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ওর ছোটা দেখে জয়হিন্দ হো হো করে হেসে উঠে বলতে লাগলো, "কি রে রঞ্জা, খেলি তো আমার মদ, আবার আসিস, আবার খাওয়াবো।" নিষ্ঠুরতায় জয়হিন্দ পশুদেরও হার মানাতো।

ফরিয়াপুকুরে জয়হিন্দের সাকরেদ নাটা শংকর দেশি বাংলা মদের বেআইনী ব্যবসা করতো। সেই পাড়াতেই থাকতো পাখি নামের একটা ছেলে। তার পিঠে ছিল একটা বিরাট কুব্জ। শুধু তার নয়, তার অন্য দুই ভাইয়ের প্রত্যেকের পিঠেই ছিল কুব্জ। তারা কুঁজো হয়েই হাটতো। তাদের একটা ঘুঁড়ির দোকান ছিল, তাতেই ওরা কোনরকমে চলতো। পাখিদের ওই অঞ্চলে সবাই চিনতো। পাখি সবার সঙ্গে হাসি তামাশা করতো। প্রতিবন্ধি হয়েও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে নিজেকে মগ্ন রাখার চেষ্টা করতো। সে জানতো, তার মস্করা কেউ অন্যরূপে নেবে না, তাই কেউ ওর গায়ে হাত দেবে না। তামাশাটা তামাশার গণ্ডির মধ্যেই রাখবে, "ইঁদুর যতই হাতির পেছনে লাগুক হাতি ইঁদুরের কথায় কখনও আমল দেয় না", এই মানসিকতা নিয়ে পাখি জয়হিন্দ ও তার দলের লোকজনের সঙ্গে ঠাট্টা, রঙ্গ করতো। একদিন সন্ধ্যেবেলায় পাখি হিন্দী সিনেমার নায়কের ভঙ্গিতে বাঁ পা টা একটা কাঠের টুলের ওপর রেখে শংকরের মদের দোকানে গিয়ে বললো, "শংকর, আজ আমাকে দামে দামে পাঁইট দিতে হবে।" শংকর ওর দিকে একবার দেখে বললো, "যা ভাগ এখান থেকে।" কুঁজো পাখিও গলা চড়িয়ে নায়কোচিত ভাবে গেয়ে উঠলো, "যাবো বলে তো আসিনি।" শংকর পাখির দিকে তাচ্ছিল্য সহকারে তাকিয়ে অন্য খদ্দেরের দিকে মন দিল। পাখি গর্জে উঠে বলল, "কি রে শংকর আমাকে দামে দামে মাল দিবি না?" শংকর খেঁকিয়ে উত্তর দিল, "এটা কি তোর বাপের মাল, যে দামে দামে দেবো? আবগারিকে, পুলিশকে, জয়হিন্দকে টাকা দিয়ে আমার আর কত থাকে রে?" 'পাখি' তবু বন্ধুর খাতির নিয়ে শংকরকে একই অনুরোধ করল। ঠিক এই সময়ে সেখানে বাবুয়াকে সঙ্গে নিয়ে জয়হিন্দের প্রবেশ। জয়হিন্দ ঢুকেই শংকরকে প্রশ্ন করলো, "কি হয়েছে?" শংকর পাখিকে দেখিয়ে উত্তরদিল, "এই শালা দামে দামে মাল চাইছে।" জয়হিন্দ বললো, "দিয়ে দে। আজ ওর থেকে পয়সা নিস না, আমি দেবো।" শংকর পাখিকে একটা দেশি মদের পাঁইট দিতে পাখি সেটা হাতে নিয়ে শংকরকে বললো, "দেখলি তো আমার ঠাঁট, জয়হিন্দও আমায় ভয় করে!" পাখি নিজের মজাতেই

হাসতে হাসতে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই জয়হিন্দ বলে উঠলো, "কোথায় যাচ্ছিস পাখি, আজ এখানে বসেই খা, আমরাও খাচ্ছি।" পাখি জয়হিন্দের আমন্ত্রণে সেখানেই পাঁইট খুলে একটা গ্লাসে ঢকঢক করে গলায় ঢালতে লাগলো। জয়হিন্দরা এমনিতেই মদ খেয়েছিল, তার ওপর আরও বোতল নিয়ে শংকর সমেত সবাই খেতে লাগলো। রাত দশটা নাগাদ জয়হিন্দ শংকরকে বললো, "দোকানে ঝাঁপ দে, চল ঘুরে আসি।" পাখিও ততক্ষণে ওদের সঙ্গে খেতে খেতে দু'তিনটে পাঁইট শেষ করে ফেলেছে। শংকর দোকান বন্দ করতে জয়হিন্দ, বাবুয়া, নাটা শংকর পাখিকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে ওই অঞ্চলেরই পরিচিত হিরুয়ার ট্যাক্সি দেখতে পেল। তারা তাড়াতাড়ি এসে হিরুয়ার ট্যাক্সির পেছনের সিটে চারজনেই চেপে বসলো, ট্যাক্সির ডান দিকের জানালার ধারে বাবুয়া, তার পাশে নাটা শংকর, মাঝখানে পাখি ও বাঁ দিকের জানালার পাশে জয়হিন্দ। জয়হিন্দ হিরুয়াকে বললে 'চল'।

ট্যাক্সি শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় ছড়িয়ে বাঁ দিকে এগিয়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পেরিয়ে মহাত্মা গান্ধী রোডে পড়তেই জয়হিন্দ ও শংকর পাখিকে মারতে শুরু করলো। কুঁজো পাখি ওদের ব্যবহারে হতবাক হয়ে বলে উঠলো, "একি করছিস, এ কি করছিস তোরা।" মার খেতে খেতে তার তখন মদের ঘোর অনেকটা কমে গেলেও জয়হিন্দদের নেশা তখন মাথায় চড়চড়িয়ে চড়ে গেছে। পাখির কথা তখন শুনতে যাবে কেন? পাখির "হেঁয়ালি আওয়াজে" জয়হিন্দ, নাটা শংকরের অপমান হয়নি বুঝি? তাকে উচিত শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ে কি করে? ট্যাক্সি তখন হু হু করে চলছে হাওড়ার দিকে। ব্রীজ ছাড়িয়ে যেতেই জয়হিন্দ পাখির গলা টিপে ধরলো, শংকর আর বাবুয়া পাখির মুখ, হাত ও ছটফট করতে থাকায় পা চেপে ধরে আছে। একটা গোঁ গোঁ শব্দ খালি পাখির গলা থেকে বার হতে থাকলো, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, জিব ঝুলছে। মুখ দিয়ে মদ মেশানো গাঁজলা বার হতে হতে পাখি নেতিয়ে পড়লো, ওর মুখ থেকে আর কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। পাকা খুনি পায়ের নিচে ফেলে দিল। ট্যাক্সি ড্রাইভার হিরুয়া বুঝলো জয়হিন্দরা পাখিকে খুন করে ফেলেছে। সে ভয় পেয়ে গেল। কারণ সে জানে, জয়হিন্দরা এবার প্রত্যক্ষ সাক্ষীকে লোপাট করার জন্য তাকে খুন করতে পারে। সে গাড়ি আরও জোরে ছুটিয়ে দিল। জয়হিন্দ একবার তাকে বললো, "কি রে হিরুয়া এত জোরে চালাচ্ছিস কেন?" হিরুয়া উত্তর দিল, "মালটা ঠিক জায়গায় চালান করতে হবে না?" হিরুয়ার উত্তর শুনে জয়হিন্দের পছন্দ হল, সে বললো, "ঠিক হ্যায়, চালাও।" জয়হিন্দ একটা পা নিচে 'পাখির শরীরের ওপর রেখে সিটে গা এলিয়ে দিল। হিরুয়া দ্রুত ট্যাক্সি চালিয়ে সোজা হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার ভেতর ঢুকে চট করে থানার

বারান্দার সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে "খুন, খুন" বলে চিৎকার করতে শুরু করলো। থানার সামনে দাঁড়ানো কনস্টেবলরা এই রকম নাটকীয় পরিস্থিতির জন্য তৈরি ছিল না। তাঁরা প্রথমে থতমত খেয়ে কি করবে ভাবার আগেই দেখতে পেল ট্যাক্সির পেছনের দু'টো দরজা পটাপট করে খুলে তিনটে ছেলে থানার বাইরে ছুটে পালাচ্ছে। এবার থানার কনস্টেবলরা সামান্য ধাতস্থ হয়ে ওই তিনজনের পেছনে ছুটতে লাগলো। নেশায় আচ্ছন্ন জয়হিন্দরা কতদূর আর ছুটবে? তারা তিনজনেই গোলাবাড়ি থানার কনস্টেবলদের হাতে ধরা পড়ে গেল। জয়হিন্দ, নাটা শংকর, বাবুয়া ঢুকে গেল গোলাবাড়ি থানার লকআপে।

প্রতিবন্ধি পাখি হত্যা মামলায় তাদের তিনজনেরই যাবজ্জীবন জেল হয়ে গেল। জয়হিন্দরা আবার চলে গেল প্রেসিডেন্সি জেলে। তাতে অবশ্য জয়হিন্দের কিছু যায় আসে না। কারণ জয়হিন্দের জীবন দর্শন হল, "আসল পুরুষেরা আবার জেলের বাইরে থাকে নাকি? তাদের সঠিক জায়গা হল জেল। আসল পুরুষেরা যখন যা ইচ্ছে তাই-ই করবে, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, পকেটমারি, ধর্ষণ যখন যা খুশি। আর সেই কাজ করাটাই আসল পুরুষের ধর্ম। আর নকল পুরুষেরা থাকে জেলের বাইরে, যারা জেলে যেতে ভয় পায়।" "আসল পুরুষ জয়হিন্দ"। তাই বুক ফুলিয়ে জেলের ভেতর তার অর্ধেকের বেশি বছর কাটিয়ে দিতে কোনও মানসিক যন্ত্রণাই পায় না। সে তাই ছাড়া পেয়েই নতুন ভাবে শুরু করে জেলে যাওয়ার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এক একজনের এক একরকম। আর এ ব্যাপারে শ্যামপুকুর অঞ্চলে জয়হিন্দকেও সাময়িক ভাবে টেক্কা দিয়েছিল ক্ষুর গোপাল। সে জয়হিন্দের অনেক পার্শ্বচরকে মারে কিন্তু জয়হিন্দ ক্ষুর গোপালের কিছু করতে পারেনি।

কে এই 'ক্ষুর গোপাল'? তার আসল পরিচয় হচ্ছে, তার নাম 'গোপাল যাদব'। নেপাল ও নন্দ তার ছোট দুই ভাই। তারা উত্তরা সিনেমার পাশে রামধন মিত্র লেনের ভেতর একটা বস্তিতে থাকতো। তাদের সেখানে একটা খাটাল ছিল। সে তাদের অঞ্চলের নকশাল ভুতোর চেলা ছিল। ভুতোর ফাই-ফরমাশ খাটতো। শখ ছিল পায়রা উড়াবার। তাই মাঝেমাঝে হাতিবাগানের পাখির হাট থেকে পায়রা কিনে সেগুলো উড়িয়ে দিত। ওর মামা সামুয়া থাকতো শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ছয় নম্বর বস্তিতে। সেই সামুয়ার সঙ্গে নকশাল সমীর ও বাবলুর গণ্ডগোল বাঁধলো গোপালদের খাটাল নিয়ে। গোপাল এবার পায়রা উড়ানোর বদলে হাতে তুলে নিল বোমা। সে একদিন সন্ধ্যেবেলায় বোমা নিয়ে বাবলুদের ওপর চড়াও হল। কিন্তু অপরিপক্ক হাতে অতিরিক্ত উত্তেজনায় তার বোমা নিশানায় স্থির রইলো না। ফলে সমীর ও বাবলুরা তাদের দল নিয়ে পালিয়ে বেঁচে গেল। এরপর শুরু হল প্রতিদিন সমীরদের সঙ্গে গোপালের বোমাযুদ্ধ, উত্তরা ও রাধা সিনেমার আশপাশ জুড়ে তান্ডব। সমীররা

গোপালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাহিনী সংগঠিত করলো। গোপাল পালিয়ে গেল কলাবাগানে। কলাবাগানের গুণ্ডা মনসুর আলির আস্তানায় তার পরিচয় হল জঙ্গুলু ক্ষেত্রী ও রহমনের সঙ্গে। এখানে থাকতে থাকতে সে অপরাধ জগতের আঁটঘাট সব চিনতে শুরু করলো। মাঝেমধ্যে সে তার ওস্তাদের সঙ্গে মদ খেলেও গোপাল চা-ই বেশি খেত।

ইতিমধ্যে সে নিজস্ব একটা ছোটখাট বাহিনী করে নিয়েছে। মানিকতলার 'দয়া', জয়রাম, 'উমা' ও হরতকিবাগানের 'শিবু' ছিল তার দলে। এবার সে শুরু করলো সমীরদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। আর তার হাতিয়ার হল ক্ষুর। চাঁদনিচক থেকে গোপাল একসঙ্গে পাঁচটা ক্ষুর কিনে নিয়ে আসলো। আর সেই ক্ষুর কোমরের চারদিকে গুঁজে একজনকে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে সে চলে যেত শ্যামপুকুর এলাকায় দিন, দুপুর, সন্ধেবেলার যে কোনও সময়। আর সমীরদের পরিচিত, আধা পরিচিত যাকে সামনে পেত, তাকেই খোলা ক্ষুর হাতে আক্রমণ করতো। প্রথমেই সে মুখের ওপর চালিয়ে দিত ক্ষুর। আক্রান্ত ব্যক্তি বিভ্রান্ত হয়ে কাটা জায়গায় হাত দিলেই মূহুর্তের মধ্যে সে পরপর ক্ষুর দিয়ে কাটতে থাকতো। গাল, হাত, পেট, শরীরের যেখানে যেমন সুযোগ পেত সেখানেই ক্ষুর দিয়ে টেনে টেনে ক্ষতবিক্ষত করে পুরো শরীরে চিরে চিরে একটা রক্তাক্ত মানচিত্র এঁকে ছাড়তো। টানের চোটে কোনও ক্ষুর ভেঙ্গে গেলে বা বেঁকে গেলে চট করে সেটা সঙ্গীর হাতে দিয়ে আর একটা ক্ষুর কোমর থেকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো তার নিশানার ওপর। এ যেন একটা তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে তো কি হয়েছে, আর একটা তীর তূণ থেকে বার করে লক্ষ্যভেদ কর। এইভাবে সমীরদের বেশ কিছু পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গোপাল ক্ষুর মেরে আহত করলো। গোপালের এই ক্ষুর চালনার জন্যই তার নাম হয়ে গেল ক্ষুর গোপাল। তার ইচ্ছা ছিল সমীর ও বাবলুকে খুন করার। সে জন্য সে ওই অঞ্চলে যেত কিন্তু সেখানে গিয়েই সামনে যাকেই পেত তাকেই আক্রমণ করে বসতো। ক্ষুরের সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যে তার আর একটা হাতিয়ার সঙ্গী হয়ে গেল। কলাবাগানে মনসুর আলির কাছে থাকতে থাকতে সে রহমানের কাছে সিগারেট বোমা বানানো শিখে গেল। সিগরেট বোমা হচ্ছে সিগারেট প্যাকেটের মাপের এক ধরনের শক্তিশালী বোমা। সিগারেট বোমাটা রাখতো সে নিজের আত্মরক্ষার জন্য। যখন কাউকে সে ক্ষুর মারছে, সেই সময় অন্য লোক প্রতিরোধ করতে আসলে সে সিগারেট বোমা ছুঁড়ে সে দিনের মত রণে ভঙ্গ দিয়ে উধাও হয়ে যেত। তার চরিত্র ছিল ছুঁচোর মত, কখন যে সে তার শত্রু শিবিরে হানা দিয়ে কাকে আক্রমণ করে ক্ষুরে সারা শরীরে আঁচড় টেনে কোন দিক দিয়ে পালাবে তা আগে থেকে কেউ আন্দাজ করতে পারতো না।

ক্ষুর গোপালের সাহস ও অত্যাচার দিন দিন বাড়তেই থাকে। সে এবার উত্তরা সিনেমার গলির ভেতর শীতলা পূজোর প্যাণ্ডেলে গিয়ে সরাসরি সেখানে উপস্থিত পুজো কমিটির লোকেদের কাছে তার নজরানা চায়। তাঁরা তার অপ্রাসঙ্গিক আবদারে কর্ণপাত না করলে সে তাঁদের জবাব দিতে চট করে একটা ধারালো চকচকে নতুন ক্ষুর কোমর থেকে টেনে বার করে যাকে সামনে পায় তার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথারি চালাতে থাকে। ক্ষুর গোপালের এই আচমকা বর্বরীয় ধরণের আক্রমণের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। ফলে ভয়ে যে যার পালাতে থাকে, আর সে ছুটে ছুটে একজনের পর একজনের ওপর ক্ষুর চালাতে থাকে। সেদিনের সেই আক্রমণে আহত হয় রতন, কাবুল, দুলু, প্রসূন। এদের কারও চোখ চলে যায়, কারও হাত, কারও বা চিরদিনের জন্য গাল কেটে দগদগে দাগ হয়ে যায়।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে হঠাৎই শ্যামপুকুর থানার অফিসার প্রাণতোষবাবুর হাতে ক্ষুর গোপাল ধরা পড়ে। ধরা পড়ে চালান হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। জেলে শুরু হয় আর এক অধ্যায়। সেখানে তার যোগাযোগ হতে থাকলো কলকাতা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন ধরণের গুণ্ডা, মস্তানদের সঙ্গে।

সমাজবিরোধীদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও পরিচয় হওয়ার দু'টো খুব ভাল রাস্তা হচ্ছে প্রথমতঃ যেখানে দিনের পর দিন একই সঙ্গে থেকে তাদের অন্তরঙ্গতা গভীর থেকে গভীরতর হয় এবং নতুন নতুন কায়দাকানুন একে অন্যেকে শেখানোর অনেক সময় পেয়ে যায়। অন্য আর একটা রাস্তা তাদের আত্মগোপনের সময়। সমাজবিরোধীদের আত্মগোপন করতে তো আর কোনও সাধু তার মন্দির কিংবা মসজিদের দরজা খুলে দেবেন না। তাদের জায়গা নিতে হয় অন্য আরেক দুষ্কৃতির ঘরে, আর সেখানে থাকতে থাকতেই নতুন করে পরিচয় ও যোগাযোগ হয় তাদের নয়া দোস্তের সঙ্গে। অন্ধকার অপরাধ জগতের সেতু ও শেকল এইভাবেই তৈরী হয়। এই বাঁধনের মাঝে ফাটল খুলে পুলিশকে খুঁজে নিতে হয় তাদের গুপ্তচর। এই ফাটল যে যত খুলতে পারবে সেই পুলিশেরই হবে তত বেশি সোর্স ও খবরও তার কাছেই আসবে বেশি। সোর্স তৈরি করার আর দ্বিতীয় কোনও পন্থা নেই। সোজা কথা, সমাজবিরোধীর মধ্যে থেকে সমাজবিরোধীকেই বানাতে হবে গুপ্তচর।

ক্ষুর গোপাল বেশিদিন জেলখানায় রইলো না। সে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে সে প্রাণতোষের ঠেলায় অনেকটা শান্ত হয়ে গেল। নিজের বস্তিতে সে মানিব্যাগ বানানোর একটা ছোট কারখানা খুলে বসলো। গোপাল শান্ত হয়ে গেল। যাদের সে আগে ক্ষুর দিয়ে অঙ্গহানি করেছে তারাও আর তার ওপর প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে নিজের মত চলতে দিল।

মানিকতলার কাছে একদিন এক ঘটনায় ক্ষুর গোপালের নাম জড়িয়ে গেল। সেখানে দু'দল সমাজবিরোধীদের মারপিটে একজন ক্ষুরে আক্রান্ত হয়েছিল। তারই সূত্রে গোপালকে গ্রেফতার করতে গেল শ্যামপুকুর থানার এক সার্জেন্ট। সে গোপালের মানিব্যাগ কারখানায় গিয়ে তাকে না পেয়ে সেখানে অতিরিক্ত উৎসাহে তল্লাশি চালাতে গিয়ে গোপালের ছোট কারখানাটা একেবারে তছনছ করে দেয়। তল্লাশি চালিয়ে সার্জেন্ট চলে যাওয়ার পর গোপাল সেখানে এসে দেখে তার কারখানার অবস্থা। সে রেগে যায় এবং তার ফেলে আসা মূর্তি আবার ধারণ করে। গোপাল বস্তি থেকে বেরিয়ে এসে শ্যামপুকুর থানার তখনকার অফিসার-ইন-চার্জ এস আর দেবনাথ বাবুকে সরাসরি ফোন করে বলে, "আমার কারখানার যা অবস্থা করেছেন তার জন্য আমি আপনার রাতের ঘুম কেড়ে নেবো।" দেবনাথবাবু উত্তরে কিছু বলার আগেই ক্ষুর গোপাল ফোন নামিয়ে রেখে এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

পঁচিশ বছরের গোপাল চলে যায় জঙ্গলু ক্ষেত্রীর কাছে। ইতিমধ্যে রহমান ও ক্ষেত্রীর মধ্যে গণ্ডগোল হওয়াতে, দু'জনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। রহমান কলাবাগানে সানোয়াজ, কাঁচসজ্জাদ, সাজ্জাদদের নিয়ে দল গড়ে আর ক্ষেত্রী জহর সিনেমার কাছে রমেশ জয়সোয়ালের কাছে সেখানে কেশব সেন স্ট্রীটের মুচিয়া ক্ষেত্রীর সঙ্গে জোট বাঁধে। আর তাদের সঙ্গে জুটে যায় ক্ষুর গোপাল। সৎকার সমিতির পেছনে ডাবপট্টিতে এক ডাবওয়ালার কাছে বিনা পয়সায় মুচিয়া ডাব খাওয়ানোর দাবি করলে সেই ডাবওয়ালা মুচিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে। সেদিন রাত্রিবেলা ক্ষেত্রী, মুচিয়া আর ক্ষুর গোপাল ডাবওয়ালাকে খুন করে।

তারপর ক্ষুর গোপালের দু'টো কাজ প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এক জঙ্গলুর সঙ্গে মিশে তার কথামত মানিকতলা ও তার আশেপাশের কালোয়ারদের মেরে তোলা আদায় করা এবং নিলামে গিয়ে মস্তান সেলামী আদায় করে নিয়ে আসা। আর দুই হচ্ছে দেবনাথবাবুকে ফোনে যে কথা দিয়েছে তা কার্যকরী করা। সেটা করতে সে শ্যামপুকুর অঞ্চলে যখন তখন ক্ষুর হাতে চলে যেত এবং যাকে সামনে পেত তাকেই ক্ষুর চালিয়ে চোখ, মুখ, নাক কেটে দিয়ে ফুরুৎ করে উবে যেত। প্রতিদিন ক্ষুর গোপালের ক্ষুরে আহত সেইসব ব্যক্তি নালিশ জানাতে শ্যামপুকুর থানায় দেবনাথ বাবুর কাছে আসত। দেবনাথবাবু ক্ষুর গোপালের এই সন্ত্রাস সৃষ্টির জ্বালায় একেবারে অস্থির হয়ে উঠে শ্যামপুকুর থানা থেকে অন্যখানে বদলি চাইলেন কিন্তু পেলেন না। ক্ষুর গোপাল সত্যি সত্যি দেবনাথবাবুর রাতের ঘুম কেড়ে নিল।

ক্ষুর গোপাল শ্যামপুকুর এলাকায় গিয়ে সন্ত্রাস চালালেও সে সারাদিন থাকতো কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে। কলেজ স্ট্রিট এলাকায় আড্ডা মারতে মারতে যখনই ওর খেয়াল হত কাউকে ক্ষুর চালাবার, সে চট করে একটা বাস ধরে চলে যেত

হাতিবাগানে। আর বাস থেকে নেমে তার শত্রু শিবিরের গন্ধ লাগা যাকেই দেখতে পেত সঙ্গে সঙ্গে হাতের ক্ষুর নামিয়ে দিত তার শরীরে। অর্থাৎ দেবনাথবাবুকে জানান দিত যে সে আছে। ক্ষুর না চালিয়ে সে কোনওদিন থাকতে পারতো না। দিনের শেষে সে যদি দেখতো, "আজ মানুষের রক্ত দেখতে পাইনি, তবে সে সামনে কুকুর, বেড়াল যা পেতো তার ওপরেই ক্ষুর চালিয়ে নিজে রক্ত দেখার নেশা মেটাতো। ক্ষুরকে সে কোনদিন অভুক্ত রাখতো না, রক্তে স্নান করাতোই। ক্ষুর চালানোর জন্য সে ছোক্ছোক্ করতো এমনই যে যেচে যেচে কারণ খুঁজে নিত।

তার এক সিনেমার টিকিটের কালোবাজারী বন্ধুর সঙ্গে মিত্রা সিনেমার টিকিটের কালোবাজারী নিয়ে জয়হিন্দদের লোকেদের গণ্ডগোল হল এবং নিজেরা মিটিয়েও নিল। সেটা কানে গেল ক্ষুর গোপালের। ব্যাস, সে ক্ষুর চালনার একটা কারণ পেয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে মিত্রা আর দর্পণা সিনেমার সামনে জয়হিন্দের দলের যাকে পেল তার ওপরেই ক্ষুর চালাতে লাগলো।

তার সেই কালোবাজারী বন্ধুর সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লক পার্টির নেতা নলিনী গুহর সহকারী কানুর এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিরোধ বাঁধলো এবং দু'একদিনের মধ্যে কানুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ক্ষুর গোপালের সেই বন্ধুটি তা মিটিয়ে ফেললো। ক্ষুর গোপালের কাছে সব খবরই গেল। সে সন্তর্পণে সেটা নিজের মনে রেখে দিল।

দিন চারেক পর দুর্গাপুজার সপ্তমীর দিন। ক্ষুর গোপাল তার "শত্রু শিবিরে" রাত্রিবেলায় অভিযানে নেমেছে। সঙ্গে আরও তিনজন সহকারী। তারা সব ক্ষুর গোপালের দেহরক্ষী, তিনজনের মধ্যে কালোবাজারী বন্ধুটিও রয়েছে। ক্ষুর গোপাল হাতে ক্ষুর নিয়ে সামনে চলেছে, দেহরক্ষীরা তার পেছনে। পুজোর সময় রাস্তায় রাতেও অনেক লোক। ক্ষুর গোপালের ক্ষুধার্ত ছোখ চারিদিকে ঘুরছে। এ গলি ও গলি করে গোপাল কদম কদম এগিয়ে চলেছে, কিন্তু শত্রুর গন্ধমাখা কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। সে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। আজ কি তবে শ্যামপুকুর থানার দারোগাবাবু নিশ্চিন্তে ঘুমাবে? আজ মহাসপ্তমীর দিন কী তার ক্ষুর রক্ত না খেয়ে অভুক্ত নিদ্রা যাবে? সে নিজে কী দেখতে পাবে না মানুষের রক্ত ঝরা যন্ত্রণা কাতর ছটফটানি, শত্রু শিবিরের ভয়ার্ত দৌড়? ডানহাতে ধরা ক্ষুর। মুঠো আরও শক্ত হয়ে গেল। রাত বাড়ছে আর তার উত্তেজনাও বাড়ছে। সঙ্গীরা নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে চলেছে, কেউ গোপালের একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথাও বলতে ভয় পাচ্ছে। বিরোধীতা করার অর্থ গোপালের কাছে শত্রু হয়ে গিয়ে ক্ষুরের টানে টানে নিজেকে মৃত্যুর মুখে ফেলা। সেই সম্ভাবনা যেখানে একশ ভাগ সেখানে তার অনুগামীরা তা নিতে যাবে কেন?

উত্তরা সিনেমার গলিতে ক্ষুর গোপাল ঢুকলো। এক জায়গায় আলো-আঁধারির

মধ্যে হঠাৎ চমক। কানু, ক্ষুর গোপালের নয়া শত্রু। হিংস্র নেকড়ে ক্ষুর গোপালের এক লাফ। তার কালোবাজারী বন্ধুটি একবার বলে উঠলো। "আমার সঙ্গে ওর ঝামেলা মিটে গেছে।" কে কার কথা শোনে, ঝটিতি বিদ্যুৎ ঝলকের মতো গোপালের খোলা ক্ষুর নেমে এল কানুর গলা লক্ষ্য করে। কানু "মা" বলার সুযোগ পেল না। কণ্ঠনালী দু'ফাঁক। গলগল করে তাজা রক্ত ওর বুক পেট ভিজিয়ে দিয়েছে। জীবনীশক্তি আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে পা। পড়ে গেল রাস্তায়। গোপাল উবু হয়ে বসে কানুর গলায় চেপে ধরা ডান হাতটা এক লহমায় সরিয়ে দিয়ে কণ্ঠনালীতে ক্ষুর দিয়ে মারলো আর এক গভীর টান। কানুর পা দু'টো একবার আস্তে নড়ে উঠে একেবারে স্থির।

গোপাল উঠে দাঁড়ালো। মুখে তৃপ্তির হাসি। অবশেষে সপ্তমীর দিন শত্রু শিবিরে মোক্ষম আঘাত দিতে পারার জন্য বাসনার পূর্ণতার স্বাদ তার চোখে মুখে। সে শান্ত গলায় বন্ধুদের নির্দেশ দিল, "তোরা যে যার মতো কেটে পড়। আমি চলে যাবো।" তার অনুগত তিনজন, ততক্ষণে ভয় পেয়ে গেছে কারণ তারা জানে কানুকে খুন করার পরিণতি অনেকদূর পর্যন্ত যাবে। ফরোয়ার্ড ব্লক পার্টি তোলপাড় করবেই। তাই গোপালের আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা উত্তরার গলি থেকে যে যার মতো নিমেশে ফেরার হয়ে গেল।

গোপালের মধ্যে কিন্তু কোনও তাড়া নেই। সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসলো গলি থেকে। তারপর একটা টিউবয়েলের সামনে গিয়ে ক্ষুরে লাগা কানুর রক্ত আস্তে আস্তে ধুয়ে ফেললো। তখনও ক্ষুরে লাগা রক্ত বেশ গরম আছে, তা ভেবে গোপাল নিজে নিজেই একবার হেসে নিল। ক্ষুর পরিষ্কার করে, কোমরে গুঁজে নিয়ে হাত ও মুখে ছিটকে আসা কানুর রক্ত ধুয়ে ফেললো।

পুজোর দিন, রাস্তায় রাতেও অনেক বাস চলছে। গোপাল একটা বাসে উঠে পড়লো। নির্বিঘ্নে চললো তার রাতের বেলার গোপন আস্তানায়, রানী রোডে, ভুতোর বাড়িতে।

একদিকে কানুর খুন নিয়ে হইচই পড়ে গেল। অন্যদিকে উত্তরা গলি, আনন্দ লেন, রাধার গলিতে পুজোর সময় নেমে এল শোকের ছায়া। কানু ওরফে কিরণ ওই অঞ্চলের খুবই পরিচিত ও জনপ্রিয় ছেলে ছিল। তাই ওই গলিগুলোর সব যুবকরা একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল যে, এবার থেকে তারা একসঙ্গে এলাকায় টহল দেবে এবং ক্ষুর গোপালকে দেখতে পেলেই তাকে সবাই মিলে পিটিয়ে মেরে ফেলবে।

সেইখবর পেয়ে ক্ষুর গোপাল আরও সতর্ক হয়ে গেল। সে তারপর মাছরাঙ্গা পাখির মতো চোঁ করে ছুটে এসে শিকার করে তড়িৎগতিতে পালিয়ে যেত। পকেটে টাকা নেই? কি আছে? হীরু হাজরার সাট্টার আড্ডায় হানা দিল, সব টাকাপয়সা নিয়ে উড়ে চলে গেল।

একদিন তেমনই উড়তে উড়তে বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে গোপাল পেয়ে গেল জয়হিন্দের দলের সোনাকে। তার পুরনো শত্রু। বহুদিন খুঁজছিল। সোনা সতর্ক হওয়ার আগেই গোপাল চালিয়ে দিল ক্ষুর। সোনা ক্ষুরের পোঁছ খেয়ে কোনমতে ছুটে এ গলি সে গলি ঢুকে গোপালকে ধন্ধে ফেলে পালিয়ে গেল।

এর ঠিক দু'দিন পরে কলেজ স্ট্রিটের মেডিক্যাল কলেজের সামনের বাস স্টপেজ থেকে রাত দশটা নাগাদ চৌত্রিশ নম্বর সরকারী বাসের পেছনের দরজা দিয়ে গোপাল রানী রোডে যাওয়ার জন্য উঠে বাঁ দিকে চাকার ওপর সিটে বসলো। বাসে তখন মাত্র আট ন'জন যাত্রী রয়েছেন। তাঁরা দেখলেন, শ্যামলা, দোহারা চেহারার অল্পবয়সী ছেলে বাসে উঠে বসলো। তাঁরা ভাবতে পারছেন না, এই ছেলেটাই সারা উত্তর কলকাতার পুলিশের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এক সময়ের দুঁদে গোয়েন্দা অফিসার দেবনাথবাবু এই ছেলেটার জন্যই শ্যামপুকুর থানা থেকে অন্যত্র চলে যেতে চাইছেন। বাস চলেছে শ্যামবাজারের দিকে। স্টপেজে দাঁড়াচ্ছে, যাত্রীরা উঠছেন, নামছেন। রাধা সিনেমার সামনে বাস থামালো, তিনটে ছেলে, তারাও পেছনের দরজা দিয়ে বাসে উঠলো। বসলো গোপালের উল্টো দিকে। বসেই তারা গোপালকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। গোপালও দেখলো তার চিরশত্রু কাবুল, প্রদীপ ও আর একটা ছেলে উঠেছে। আচমকা বাসের ভেতর তারা যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বির মুখোমুখি হয়ে যাবে তারজন্য কোনপক্ষেই প্রস্তুত ছিল না।

গোপাল সময় নেয় না। সে জানে প্রতিপক্ষে তিনজন। তারা যদি একসঙ্গে তার ওপর আক্রমণ করে তবে তার এই বসে থাকা অবস্থায় সে কিছুই করতে পারবে না। সে তাই চট করে উঠে দাঁড়ালো, কোমর থেকে টেনে বার করে ডান হাতে খুলে নিল ক্ষুর, বাঁ হাতে পকেট থেকে ব্যর করে সামনে ধরলো একটি সিগারেট বোমা। কাবুলদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "একদম নড়বি না, তা হলে বোম মেরে বাস উড়িয়ে দেবো।" কাবুলরা ক্ষুর গোপালকে চেনে, সে যে কোনও কাজ করতে পারে তা তারা বিশ্বাস করে। প্রদীপ কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "তোর সঙ্গে আমাদের তো কোনও ঝামেলা নেই। তুই আমাদের মারবি কেন?" গোপাল দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো, "চুপ কর, তোদের নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেবো ঝামেলা আছে কী নেই।" কাবুল জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় নিয়ে যাবি।" "আমার যেখানে খুশি।" গোপালের কর্কশ উত্তর। কাবুলরা ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। অন্য যাত্রীরাও এই যমদূতের হুমকিতে ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেল। অন্যদিকে বাস তখন স্টপেজ না দিয়ে হু হু করে ছুটছে। পেছনের কন্ডাক্টর সামনের কন্ডাক্টরকে ইশারা করে জানিয়ে দিয়েছেন বাসের গতি না থামিয়ে কাশীপুর থানার ভেতর ঢুকিয়ে দিতে। সামনের কন্ডাক্টর সেটা ড্রাইভারের কানে পৌঁছে দিতে তিনি বাস আরও দ্রুত গতিতে ছুটিয়েছেন। টালা ব্রীজ ছাড়িয়ে

চলে গেল। বাস এবার চুনীবাবুর বাজারের স্টপেজ ছাড়াতেই গোপাল বিপদের গন্ধ পেল, কারণ সে যেখানে তার শত্রুদের নিয়ে নামতো তা ছাড়িয়ে তো গেলই, তার ওপর কোন স্টপেজ না দেওয়াতে সে বুঝলো বাস ড্রাইভারের অভিসন্ধি তার অনুকূল নয়। সে ড্রাইভারকে গলা চড়িয়ে হুমকি দিল, "বাস থামা, নয়তো বোম মেরে উড়িয়ে দেবো।" শত্রুদের থেকে চোখ সরিয়ে গোপাল ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে হুমকি দেওয়ার সময় চকিতে কাবুল বাঁচার লক্ষ্যে বেপরোয়া ভাবে গোপালের বোমা ধরা বাঁ হাতের ওপর ঝাঁপ দিতেই বিকট আওয়াজে সব তোলপাড়। ড্রাইভার স্টিয়ারিং এদিক ওদিক হয়ে যেতেই ব্রেক কষে কোনমতে সামাল দিলেন। বাসের ভেতরটায় শুধু ধোঁয়া আর অন্ধকার ভেদ করে আসছে আর্তনাদ। ড্রাইভার সে সব কিছুই আমল না দিয়ে সোজা বাস ছোটালেন কাশীপুর থানার দিকে।

কাশীপুর থানার ভেতরে বাস থামালে দেখা গেল, ক্ষুর গোপাল পড়ে আছে, তার গলার কাছটা পুরো হাঁ। সেখানে এক খাবলা মাংস উড়ে গিয়ে একটা রক্তাক্ত পুকুর। কাবুলের ডান হাতটা বাসের অন্যদিকে চলে গেছে, প্রদীপের একটা চোখের ভেতর স্প্রিন্টার ঢুকে অন্ধকার। তারপর অপর সঙ্গী রক্তাক্ত দেহে সিটের ধারে শুয়ে আছে। অন্য আরও যাত্রীদের, কারও গায়ে, কারও বা হাত কিংবা পিঠে বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত।

কাশীপুর থানার কর্মীরা আহত সবাইকে ভর্তি করিয়ে দিল আর জি কর হাসপাতালে। তখনও তাঁরা জানেন না, আহত ছেলেগুলো কারা। পরদিন ক্ষুর গোপাল হাসপাতালে মারা গেল। কাশীপুর থানার অনুরোধে শ্যামপুকুর থানা থেকে ওদের দেখতে গিয়ে থানার অফিসার তো অবাক! আরে এ যে ক্ষুর গোপাল! যে তাঁদের দিনরাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, শুধু দেবনাথবাবুর মতো দুঁদে পুলিশ অফিসারই নয় উত্তর কলকাতার অন্য থানার দারোগা বাবুরাও তার অত্যাচারে সরে যেতে চেয়েছিল অন্য এলাকায়। ক্ষুর গোপাল সত্যিই সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সবার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। তাই তার এমন মৃত্যুতে কারও মনে শোকের বিন্দুমাত্র রেখা দেখা যায়নি। অন্যদিকে অনেক যন্ত্রণা সয়ে কাবুলরা প্রাণে বেঁচে গেল।

প্রদীপ, কাবুল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে দেবেন্দ্রনাথবাবু কাবুলকে তার দুঃসাহসিক কাজের জন্য নিজের থেকে কিছু টাকা দিলেন যাতে কাবুল কোন ছোট ব্যবসা করে পরবর্তী জীবনটা অতিবাহিত করতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে আফযোশের বিষয় কাবুলও একদিন অতিরিক্ত লোভের বশবর্তী হয়ে সমাজবিরোধীদের খাতায় নাম লিখে নিজের কুকর্মের জন্য জেলের ভেতর চলে গেল।

পশ্চিমবঙ্গের দুষ্কৃতীরা শুধু নিজেরাই খুন, জখম, ডাকাতি করে না, প্রয়োজনে তারা অন্য প্রদেশের খুনি, ডাকাত ভাড়া করে এখানে নিয়ে আসে তারপর তাদের

দিয়ে দুষ্কর্ম করিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। সেইসব খুনি, ডাকাতকে তারা বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকেই বেশি আনে। এমনই এক খুনি ভোলা সর্দারকে জে পি সিং কলকাতায় নিয়ে এসে রাখলো বড়বাজার ঝুগড়াকুঠিতে।

এই ভোলা সর্দার ছিল বেনারসের লালু সিংহের দলের লোক। লালু ছিল আবার উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা কমলাপতি ত্রিপাটির প্রচণ্ড ঘনিষ্ঠ ও কাছের লোক। সে সময় গোরক্ষপুরের হরিশংকর তেওয়ারি, গাজীপুরের মকুন সিং ও বেনারসের লালুর নাম ডাকাত, খুনি হিসাবে সারা ভারতের পুলিশের খাতায় জ্বলজ্বল করতো। লালুর দল বেনারস ও তার আশেপাশে কত ডাকাতি ও খুন যে করেছে তা তারা নিজেরাও সঠিকভাবে বলতে পারবে কি না সন্দেহ। আমরা যারা মৎস্যভোজী তারা কি বলতে পারবো সারা জীবন কটা মাছ খেয়েছি। ঠিক তেমনই লালু ও তার দলের শিবু সর্দার, নাঙ্গে সর্দার ও ভোলা সর্দাররা বলতে পারবে না তাদের অপরাধের প্রকৃত পরিসংখ্যান।

ভোলা কলকাতায় আসার আগে নাঙ্গে ও শিবু সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে বেনারস শহরের জনবহুল রাস্তায় দুপুরবেলা ভোজালী দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ও রিভলবরের গুলি করে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ বাহিণীর এক হেড কনস্টবলকে খুন করলো। শিবু ও ভোলা ফেরার হয়ে গেল। নাঙ্গে ধরা পড়লো। সে আবার জেল থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশের গাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করলে, পুলিশের রাইফেলের গুলিতে মারা গেল।

জে পি সিং ভোলাকে নিয়ে এসে রাকেশ নামে আর এক দুষ্কৃতির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ভোলার বিরাট দশাসই চেহারা, লম্বা, চম্বলের ডাকাতদের মতো পাকানো গোঁফ, রাক্ষুসে চোখ দেখেই রাকেশের তাকে পছন্দ হয়ে গেল। কারণ রাকেশের সঙ্গে রহমনের তখন তোলা আদায় নিয়ে বিশাল ঝগড়া। জোড়াসাঁকো, বড়বাজার, হেয়ার স্ট্রিট থানা অঞ্চলে রহমনের দলের সঙ্গে রাকেশরা মস্তানী করে পেরে উঠছিল না। রাকেশের মস্তানী করার উদ্দেশ্যটাই ছিল দাদাগিরি করে রোজগার করা, তাই রাকেশ এবার ভোলাকে সঙ্গী করে রহমনদের উচ্ছেদ করে একাই আধিপত্য বিস্তার করে একক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার কাজে নামলো। কিন্তু রহমনই বা কেন বিনা যুদ্ধে রাকেশ ও ভোলাকে জায়গা ছেড়ে দেবে? সে কি কিছুতে তাদের চেয়ে কম আছে নাকি? ততদিনে ভোলা সর্দারের চেহারা ও রাকেশের নির্দেশে একে ধরে মার, ওকে ধরে উচ্ছেদের জন্য তার নাম হয়ে গিয়েছে ভোলা পালোয়ান। বড়বাজারে আসার অল্পদিনের মধ্যেই ভোলার নাম দাবানলের মতো ওই অঞ্চলে ব্যবসায়ী ও সমাজবিরোধীদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। তার মারের ভয়ে তাকে সবাই সমীহ করতে শুরু করলো। ফলে ভোলাকে আর বিশেষ মারধোর করতে হয় না,

যে কোন গদির সামনে দাঁড়ানো মানেই তাকে টাকার ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা করা।

রাকেশ ও ভোলার একচেটিয়া এলাকা দখল বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে রহমনের ক্ষমতা খর্ব হওয়া। সে তাই উপায় না দেখে সানোয়াজ, সাজ্জাদদের নিয়ে ভোলাদের প্রতিরোধ করতে লাগলো। তাই বোমা ও গুলিগোলার যুদ্ধ অবধারিত হলো। এবং প্রতিদিন তা দেখতে লাগলো ওইসব অঞ্চলের বাসিন্দারা। রাকেশের আবার এসব পছন্দ হয় না বেশি দিন, কারণ এই যুদ্ধে মেতে থাকলে তোলা আদায়ের ব্যবসাটা ভালভাবে দেখা যায় না, তখন তার ব্যবসাতে লোকসান যায়। সে তাই ভোলার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলো, রহমনকে যুদ্ধ ভূমি থেকে চিরতরে বিদায় দিয়ে দিতে হবে।

সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাকেশ রহমনের দলের একটা ছেলেকে টাকা দিয়ে কিনে নিল। তার কাজ খালি রহমনের গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর রাকেশকে যোগান দেওয়া। রহমনের ডেরায় রাকেশের গুপ্তচর রোজই রহমানের খবর রাকেশকে পাঠাতে লাগলো। রহমান কোথায় কোনদিক থেকে রাকেশদের নির্দেশ করার জন্য কখন যাবে তা রাকেশ আগের থেকেই জানতে পারত। ভোলারা প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন ভাবে নামতো যে রহমনরা শত্রুদের কিছুই করতে না পেরে পিছু হঠে পালিয়ে যেত। একদিন রাকেশের গুপ্তচর সকালবেলা খবর পাঠালো রহমন সেদিন দুপুরবেলা একা মেহেতা বিল্ডিংয়ে যাবে তোলা তুলতে। খবর পেয়েই রাকেশ ছুটলো ভোলার আস্তানায়। ভোলা তখন স্নান করতে যাওয়ার জন্য সারা শরীরে তেল মেখে বসে পাকানো গোঁফে তেল দিয়ে চকচক করছিল। সে রাকেশের কাছ থেকে রহমানের খবরটা পেয়ে নেচে উঠল। বলল, "তুম যাও, টাইম মে কাম হো যায়েগা। তুম এক রিভালবার লেকে থোরা দূর সে গার্ড মে রহেগা।"

রাকেশ ভোলার নির্দেশ পেয়ে চলে গেল। যথাসময় রহমান মেহেতা বিল্ডিংয়ের নীচে হাজির। রাকেশ দূর থেকে তা দেখে তার গুপ্তচরকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল। অন্যদিক থেকে ভোলা ও তার সঙ্গী জাফর দেখে নিয়েছে রহমানের আগমন। ভোলার পরণে একটা ধুতি ভাঁজ করে লুঙ্গির মত পরা, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, কোমরে কিছু জিনিস গোঁজা আছে তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সঙ্গী জাফরের পরণে প্যান্টসার্ট, তার কাছে কিছু আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ভোলা আর জাফর আড়াল থেকে বেরিয়ে দ্রুত মেহেতা বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের দেখে ভয়ে চটপট করে সরে যাচ্ছে আশেপাশের দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন। তাদের আতঙ্কিত ছোটাছুটি দেখে প্রথমে রহমান ভাবলো তাকে দেখেই বোধহয় ভীরু লোকগুলো পালাচ্ছে। তার বেশ আত্মতৃপ্তি হচ্ছিল, সে হাসতে হাসতে ভাবলো, যাক তাকে

দেখে যে লোকেরা পালাচ্ছে এটা ভাল লক্ষণ। এতে তার তোলা আদায়টা জোরদার হবে।

হঠাৎ তার মনে হল, তাকে দেখে নয়, তার পেছেনে কাউকে দেখে সরে যাচ্ছে। সে ঝট করে পেছন ফিরে দেখতে গেলো কাকে ওই লোকগুলো দেখে ভয় পাচ্ছে। দেখেই বুঝে গল তার বিপদ। ততক্ষণে ভোলা ও জাফর তার থেকে মাত্র হাত দশেক দূরত্বে। সে পালানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু ভোলা তার কোমরে গোঁজা রিভলবার ইতিমধ্যে বার করে নিয়ে নিপুণ নিশানায় পরপর দু'টি গুলি চালিয়ে দিয়েছে রহমানের বুক লক্ষ্য করে। রহমান তবু বুক চেপে তাদের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতেই, জাফর তার শার্টটা খুলে প্যান্টে গোঁজা চপারটা টেনে নিয়ে রহমানের গলায় বসিয়ে দিয়েছে এক মারাত্মক কোপ। রহমানের আর বিন্দুমাত্রও নড়বার ক্ষমতা নেই। সে ধপাস করে চিৎ হয়ে পড়ে যায় মেহেতা বিল্ডিংয়ের সামনের মেঝেতে। ভোলা ও জাফর খোলা চপার দিয়ে রহমানের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য আরও কটা কোপ মারলো তার পেটে। পেট থেকে বেরিয়ে আসলো নাড়িভূড়ি। দূর থেকে রাকেশ দেখলো তার শত্রুর পতন। চোখ তার আনন্দে নাচতে রইলো। ভোলা ও জাফর রক্ত লাগা চপারটা রহমানের প্যান্টে ঘষে মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সোঁজা হাঁটতে লাগলো এমন বীরদর্পে যে হাঁটার ঢঙেই বুঝিয়ে দিল এরপরও কি এই এলাকার কেউ আছে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার?

দু'জনে নিজেদের আস্তানায় এসে জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে রাকেশের থেকে টাকাপয়সা নিয়ে কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দেওয়ার জন্য এলাকা ছাড়লো। ভোলা চলে গেল লন্ডন প্রবাসী মুম্বাইয়ের কুখ্যাত মাফিয়া ইকবাল মিরচির অনুচর রাজকুমার রাইয়ের মুম্বাইয়ের প্রাসাদে। গাজীপুরে তৈরী করা হেরোইনের ব্যবসায় তখন রাজকুমারের বিরাট সাম্রাজ্য। ভোলা তার সঙ্গে হেরোইনের ব্যবসায় হাত লাগলো। কয়েক দিনের মধ্যে দু-দু'টো ফ্ল্যাট কিনে ফেললো। কিন্তু ব্যবসা বেশিদিন করতে পারলো না। পুলিশের হাতে দু'জনেই ধরা পড়লো এবং অন্ধকার রাস্তায় প্রচুর পরিমাণ টাকা এদিক ওদিক ছিটিয়ে তারা দু'জনেই বেরিয়ে আসলো, কিন্তু তাদের মুম্বই ছাড়তে হলো। রাজকুমার তার বেনারসের বাড়ি গেল কিন্তু ভোলা উত্তরপ্রদেশে যেতে পারলো না কারণ তার বিরুদ্ধে সেখানে আদালতে আদালতে জমে আছে খুন ও ডাকাতির বহু মামলা। একবার ধরা পড়লেই এই জীবনে আর জেল থেকে বেরিয়ে বাইরের পৃথিবীর মুখ দেখতে পাবে কিনা তাতে সে নিশ্চিন্ত নয়। তাই সে আবার ফিরে এলো কলকাতায়। অন্যদিকে রাজকুমারের বেনারসের বাড়িতে ইন্টারপোল থেকে হানা দিল, রাজকুমার গুলি চালিয়ে পালিয়ে চলে এলো তার চিত্তরঞ্জন এভিনিয়ুর বাড়িতে।

মুম্বাইতে থাকার সময়ই দাউদ ইব্রাহিমের ভাড়াটে খুনি সুভাষ ঠাকুরের (যাকে আত্মগোপন করার সুযোগ করে দেওয়ার অভিযোগে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কল্পনাথ রাইয়ের টাডা আদালত অভিযুক্ত করে সাজা দেয়।) সঙ্গে ভোলার পরিচয় হয়। ভোলার কলকাতার গোপন আস্তানায় সুভাষ এসে প্রায় দু'মাস থেকে যায়। সুভাষ কলকাতা ছাড়ার পর আমার সোর্স সেই খবর দেয়। সেই তাদের এত ভয় পেত যে আমাদের খবর দিতে সাহস পায়নি। আত্মগোপনের সময়ই ভোলা একদিন হাওড়া থেকে তুলে আনে "সাধু" নামে আরেক দুষ্কৃতী, যে আবার বিহার, উত্তরপ্রদেশের সবরকম অপরাধীদের পশ্চিমবঙ্গের এজেন্ট। সাধু তখন একটা বাচ্চা ছেলেকে খুন করে নিজেই পলাতক। দুই পলাতকের মধ্যে প্রথম দ্বন্দ্ব লাগলো একটা রিভালবার নিয়ে, তারপর লাগলো বাচ্চা ছেলের খুন নিয়ে। কিন্তু সাধুকে কিছু মারধোর করা ছাড়া ভোলা আর কিছু করতে পারলো না।

এবার ভোলা ধরা পড়ালো। রাকেশ আগেই ধরা পড়েছিল। নিম্ন আদালতে তাদের দু'জনের যাবজ্জীবন সশ্রম দণ্ড হলেও, হাইকোর্ট থেকে তারা দু'জনেই খালাস হয়ে গেল। বিজয়ীর হাসি হাসতে হাসতে দু'জনে জেল থেকে বেরিয়ে এলো।

ছাড়া পেয়ে বড়বাজারে আবার একচ্ছত্রপতি হওয়ার কাজে নেমে পড়লো রাকেশ ও ভোলা। তাদের কাজ হয়ে দাঁড়াল তোলা আদায় করা ও টাকা নিয়ে ভাড়াটে হিসাবে খুন করা। টাকা আসতে লাগলো দু'হাত ভরে। সেই টাকা উড়াতে লাগলো ফূর্তির বাজারে। রাকেশের আর আনন্দ ধরে না। সে তখন আর শুধু বড়বাজার এলাকাতে নিজের গণ্ডি করে রাখলো না, ছড়িয়ে দিল আরও ব্যাপকভাবে। টাকা নেয় এবং দল নিয়ে হানা দিয়ে আসে নির্দেশ অনুসারে।

ক্যামাক স্ট্রিট অঞ্চলে একটা ট্রাভেল কোম্পানিতে তখন দুই অংশীদারের মধ্যে কোম্পানির পরিচালনা ও টাকাপয়সা নিয়ে বাঁধলো এক বিরোধ। বিরোধ এমন জায়গায় পৌঁছলো যে এক অংশীদার তার বড়বাজারের এক বন্ধুকে ধরে আনলো রাকেশের কাছে। রাকেশের খুনের ব্যবসায় কথা বলতে আসতে হলে পরিচিত দালাল ধরে আসতে হবে। উঠকো লোককে রাকেশ পাত্তাই দেয়না। কে কখন "ফাঁসিয়ে" দেবে তাই এই সাবধানতা। গোলকধাঁধার পথে ঘুরতে ঘুরতে সেই কেম্পানীর অংশীদার রাকেশের কাছে তার বন্ধুটিকে নিয়ে হাজির। সময় দেওয়া ছিল, রাকেশ তার চেম্বারে এক সাকরেদকে নিয়ে তাদের আসার অপেক্ষা করছিল। তারা আসতেই রাকেশ তাদের আপ্যায়ন করে বসালো। নাস্তা, কফি খেতে দিয়ে ব্যবসার কথা পাড়লো, অংশীদার বললো, "দাদা, আমাকে উদ্ধার করুন।" রাকেশ হেসে বললো, "আরে ভাই উদ্ধার করার জন্যই তো আমি এখানে বসে আছি।

আমার ব্যবসাটাই তো মানুষের সেবা করা, যার যা সমস্যা আছে, আমি তার থেকে উদ্ধার করে দিই, আর আমার ভাত-সবজির জন্য তার থেকে কিছু পারিশ্রমিক নিই, এটা কি কোনও অন্যায় করি?" অংশীদার লোকটি বিগলিত চিত্তে বলে উঠলো, "না, না দাদা, আপনাকেও তো চলতে হবে।" রাকেশ বেশ রেগে বললো, "এটাই লোকে বোঝে না, বলে আমি গুন্ডা, মস্তান।" একটু চুপ থেকে রাকেশ তাকে বললো, "চলুন, আপনার সমস্যাটা বুঝে নিই।" সে অংশীদারটিকে নিয়ে তার এ্যান্টি-চেম্বারে চলে গেল।

সেখানে রাকেশ অংশীদারের সব সমস্যার কথা শুনে টাকা পয়সা লেনদেনের ব্যবস্থা পাকা করে নিল। অংশীদার রাকেশকে 'কাজের' জন্য বায়না করে এ্যান্টি-চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলে চেম্বারে অপেক্ষমান বন্ধুটি উঠে দাঁড়ালো। তারা রাকেশের থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল।

এর সপ্তাহ খানেক পর একটা গাড়ি এসে থামলো ট্রাভেল কোম্পানির কিছুটা দূরে। গাড়ি থেকে নামলো, ভোলাসহ অন্য দু'জন। প্রত্যেকেরই গায়ে দামী জামাপ্যাণ্ট, চোখে রোদ-চশমা। হাঁটার ধরণে গ্লামার ঝরে ঝরে পড়ছে। তারা পায়ে পায়ে হেঁটে চললো ট্রাভেল কোম্পানীর দিকে। ঢুকে গেল অফিসের ভেতর। তারপর ভোলা ও একজন ঢুকে গেল যার সঙ্গে তারা দেখা করতে এসেছে তার চেম্বারে। অন্যজন দাঁড়িয়ে রইলো বাইরে। তাদের সামনে ট্রাভেল কোম্পানির অন্য অংশীদার ছেলেটি। সে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, "আপনারা?" ভোলাদের হাতে তখন বেরিয়ে পড়েছে উদ্যত রিভালবার। পরপর দু'টো গুলি সঠিক নিশানায় ঢুকে গেল সেই ছেলেটির বুকে। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তার টেবিলের সামনে। চেম্বারের অন্য দিকে বসে ছিলো তার ভাই, সে ভোলাদের কান্ড দেখে বাধা দিতে এগিয়ে আসতেই বুকে খেল দাদার মত একই ধরণের দু'টো গুলি। একটা আর্তনাদ, তারপর সব শেষ। সে পড়ে গেল নীচে।

তারা বেরিয়ে আসলো। কাজ শেষ। যার থেকে টাকা নিয়েছে তার অংশীদারকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়ে দিয়েছে, উপরি পাওনা হিসাবে তার ভাইকেও দিয়েছে বিদায়। খোলা রিভালবারটা অফিসের শেষ দরজায় এসে তারা পকেটে ঢুকিয়ে নিল। অফিসের কোনও কর্মচারীরই সাহস হলো না ওদের কোনরকম বাধা দেওয়ার। এরা কারা সোজা এসে মালিককে গুলি করে চলে গেল? তারা বুঝতেই পারলো না। হতচকিত হয়ে ভয়ে কুকঁড়ে গিয়ে যে যার জায়গায় গিয়ে বসে রইলো। তার সোজা গিয়ে উঠলো তাদের গাড়িতে, কোন তাড়া নেই। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়ি ছুটলো কলকাতার দক্ষিণ দিকে। এত দ্রুত ও নির্ভুল পরিকল্পনা যে তাদের কোন চিহ্নই তারা ছেড়ে গেল না।

যথাসময়ে রাকেশের চেম্বারে পৌঁছে গেল চুক্তির বাকি টাকা, সঙ্গে কিছু বোনাস, শত্রুর ভাইকেও হত্যা করার ইনাম হিসাবে। জোড়া হত্যা মামলায় পুলিশ তদন্ত করে কিছুই করতে পারলো না।

বড়বাজার এলাকায় ভোলা ও রাকেশের অত্যাচার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। বড়াবাজারের এক ব্যবসায়ী শ্যাম কেডিয়া বড়বাজারেই অন্য এক মস্তান ছেদিকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করলো। সে সোজা তাকে বলে দিল, "আমি ভোলাকে টাকা দিই, তোকে দিব না, তুই যা ইচ্ছে কর।" ছেদি তখন উঠতি মস্তান, সে চিনিপট্টিতে শ্যামকে ধরে বেধড়ক মার মেরে তার আদেশ শোনেনি বলে শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিল। শ্যাম সেই মারের প্রতিশোধ নিতে ভোলাকে ধরলো। শ্যাম ও তার ছেলে ভোলাকে বললো, "যত ইচ্ছা টাকা নাও, কিন্তু ছেদিকে ভাগাও।" ভোলা শ্যামের আবদার শুনে একটু হেসে বললো, "ঠিক হ্যায়, রুপিয়া দেও, হাম ও শালা ছেদিয়াকে দেখ লেতা হ্যায়।" শ্যাম তো এটাই চাইছিল। সে পরদিনই ভোলাকে তার চাহিদা মত টাকা দিয়ে চলে গেল।

ভোলা এবার কাজে নেমে পড়লো। সে খবর নিতে লাগল চিনিপট্টিতে কখন কখন ছেদি আসে। কারণ ভোলাকে চিনিপট্টিতে ছেদিকে মারতে হবে, তেমনই হুকুম তাকে যে ভাড়া করেছে সেই শ্যাম কেডিয়া ও তার ছেলের। কারণ যেখানে ছেদি তাকে মেরে অপমান করেছে সেই জায়গাতেই ছেদিকে মেরে শ্যাম তার প্রতিশোধের ইচ্ছা পূরণ করতে চায়। ভোলা ছিয়ানব্বই সালের মার্চ মাসের একদিন সকালে খবর পেল সেদিন ছেদি চিনিপট্টিতে দুপুরবেলা আসবে।

খবর পেয়ে ভোলা তৈরি হয়ে নিল। যথসময়ে ভোজালী ও চপার কোমরে গুঁজে চলল চিনিপট্টিতে। যখন সে পৌঁছলো চিনিপট্টিতে তার কিছুক্ষণ আগেই ছেদি সেখানে হাজির। শ্যাম কেডিয়া ভোলার নির্দেশ মত ছেদিকে আটকে রাখার অছিলায় ইচ্ছে করে তার সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। যাতে ভোলা আসার দেরি হলেও ছেদিকে এসে চিনিপট্টিতে পেয়ে যায়। ভোলা দূর থেকে দেখতে পেল শ্যাম ও তার ছেলে ছেদির সঙ্গে ঝগড়া করে চলেছে। ছেদিকে এমনভাবে আটকে দিয়েছে যাতে ছেদির মন ঝগড়াতেই আটকে থাকে, অন্যদিকে না যায়।

ভোলা লম্বা লম্বা পা ফেলে ছেদির পেছন থেকে গিয়ে বাঁ হাতে চুলের মুঠি ধরে মারলো একটান। ডানহাতে কোমর থেকে চপার বার করে নিয়ে ছেদি কিছু বলার আগেই গলায় বসিয়ে দিল এক কোপ। কোপের চোটে ছেদির পা টালমাটাল হয়ে পড়ে যেতে চাইলো। কিন্তু না, ভোলা পড়তে দিল না। সে ছেদির চুলের মুঠি ধরে তাকে ধরে রেখে প্রথম কোপের হাঁ হয়ে যাওয়া জায়গায় চপার দিয়ে মারলো প্রচণ্ড জোরে আরও একটা কোপ। সেই কোপের চোটে ছেদির ধড়টা ধপাস করে পড়ে

যায় আর ভোলার বাঁহাতে ঝুলতে থাকে ছেদির কাটা মণ্ডুটা। সে সেটা ধরে চিনিপট্টির অন্য ব্যবসায়ীদের দেখানোর জন্য চারদিক ঘুরে দেখাতে গিয়ে দেখলো, সব ফাঁকা। সব লোকেরা ভয়ে কে কোন ঘুপ্‌চিতে ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে? ভোলার সামনে শুধু শ্যাম। সেও ভয় পেয়ে গেছে। এবার ভোলা হেসে ছেদির চোখখোলা কাটা মণ্ডুটা ধড়ের পাশে নামিয়ে রাখলো। ছেদির খেলা শেষ করে সে পেছন ফিরে খোলা চপার হাতেই হাঁটতে লাগলো। তার এখন অন্য কাজ আছে। সে পাকা খুনি, জানে, পুলিশের কাছে ঠিকই তার নাম পৌঁছে যাবে। তাই কিছুদিন এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

ভোলা তার ঘরে এসে গুছিয়ে নিল স্যুটকেশ আর শ্যামের টাকা। ছেদিকে খুন করার সময় তার গায়ে যে জামাকাপড় ছিল সেগুলো নিয়ে একটা অন্য প্যাকেট করে নিল, কারণ তাতে ছেদির রক্ত ছিটকে ছিটকে এসে লেগেছে। রক্তমাখা চপারটাও আর কাজে লাগবে না এখন। সেটাও সে ওই প্যাকেটে ঢুকিয়ে দিল। প্যাকেটটা এমন জায়গায় ফেলতে হবে যাতে পুলিশ কখনও না পায়। এবার ভোলা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার বাঁ হাতের বগলের তলায় প্যাকেটটা। ডান হাতে একটা স্যুটকেশ। ধোপদুরস্ত জামাপ্যাণ্ট। দেখে মনে হচ্ছে, কোন জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছে।

ভোলা রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি ধরে সেদিনের মতো কলকাতা ছেড়ে পালালো। বেশিদিন ভোলা পালিয়ে থাকতে পারে নি। ধরা পড়লো। শ্যাম ও তার ছেলেও গ্রেফতার হলো। তাদের বিরুদ্ধে ছেদি হত্যা মামলা শুরু হল, কিন্তু চিহ্নিত করার পরীক্ষায় অর্থাৎ টেস্ট আইডেনটিফিকেশন প্যারেডে চিনিপট্টির কোন সাক্ষীই তাদের ছেদি হত্যার জন্য চিহ্নিত না করাতে তারা ছাড়া পেয়ে গেল।

ভোলা বেরিয়ে আসলো। এখন সে বড়বাজারের যমুনালাল বাজাজ স্ট্রিটের একটা বাড়িতে ঘর দখল করে থাকে, আর পুরানো সাট্টার কারবারী মহাবীর চৌধুরীর দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করে আর যেখানে যেমন পায় টাকা আদায় করে পরম সুখেই দিন কাটায়।

হ্যাঁ, পরম সুখেই চরম আনন্দে আমিরি ঢঙে আমির হামজা থাকতো রাজাবাজারের কসাইবাগান বস্তিতে। কসাইবাগানের ভেতরে থাকে পাঁচ ছ'শ পরিবার। একটা আধটা ছোট ছোট ঘুপচি ঘরে। বস্তির ভেতর সরু সরু গলি, তস্যগলি। যাদের অনেকগুলো ঘর একহাতও চওড়া হবে না। যেখানে দিনের প্রখর আলোও কোনদিন প্রবেশাধিকার পায়নি। সেই বস্তির মধ্যে আছে ছোট ছোট হস্তশিল্পের কারখানা। তার মধ্যে কেউ করে চুমকি বসানোর কাজ, কেউ করে জরির কাজ, কেউ লেফাফা বা বিভিন্ন রকমের খাম তৈরি করে। কারও আছে ছোটখাটো ব্যাগ তৈরি বা সেলায়ের কারখানা। এই কুটির শিল্পই তাদের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম।

আর এই কসাইবাগানের একচ্ছত্র নায়ক ছিল হামজা। তার চেহারাটা ছিল ঠিক আমরা ছোটবেলায় চোখ বন্ধ করে জল্লাদের যে চেহারাটা কল্পনা করতাম হুবহু তার মতো। ভুষো কালির মতো গায়ের রঙ, ভুঁড়ি বার করা মোটা মাঝারি উচ্চতায় সারা শরীরে জাম্বুবানের মতো বড় বড় লোম, ঘাড়, গলা এক। দাঁতে কালো কালির পোঁচ। ছোট ছোট দু'চোখের কোণে রক্ত জমা। মুখে অজস্র কাটা চেঁড়া ব্রণোর দাগ। কসাইবাগানের ভেতর কসাইয়ের মতো তাকিয়ে যাকে যা আদেশ করবে সেটা শুনেই শ্রোতার রক্ত হীম হয়ে যেত। তার অন্যাথা করার সে কোনও পথই খুঁজতো না।

হামজা কসাইবাগানের সবচেয়ে বেশি জায়গা নিয়ে চারটে ঘর দখল করে থাকতো। সেই ঘরগুলোতে তার সঙ্গে থাকতো তার পাঁচজন স্ত্রী। আর সেইসব স্ত্রীর ঘরে ঘরে কারও দু'টো কারও তিনটে করে সন্তান। এই বিশজনের সংসার চালাতো বস্তির সামনের বাজারের থেকে তোলা আদায় করা ছাড়াও অন্য এক বিশেষ কায়দায় বিশেষ ধরণের ব্যবসা করে।

বস্তির পুব দিক দিয়ে বহে চলেছে বেলেঘাটা খাল। সেই খালের জলের মধ্যে ভেসে যায় মরা গরু, ছাগল, ভেড়া। খালের পাশে লম্বা লম্বা আঁকশি নিয়ে সারা দিন রাত বসে থাকে হামজাদের লোকেরা। আর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে কখন আসবে মরা জন্তু। দিনের বেলা বেশির ভাগ সময়ই তারা দূর থেকে বুঝে যেত আসছে একটা কাঙ্খিত জন্তু। কারণ ভেসে থাকা জন্তুর গায়ে ঠুকরোতো কাক ও শকুন। তারা ফাতনার কাজ করতো। তারপর কাছে এলে হামজার লোকেরা ভেসে যাওয়া জন্তুগুলোকে আঁকশি দিয়ে টেনে টেনে খাল পারে নিয়ে আসে। তারপর

তারা সেই মরা জন্তুর পচা শরীর থেকে কেটে নিত চামড়া। চামড়া কাটা হলে খালেরই পারে ফেলে রাখতো জন্তুগুলোকে। সারাদিন সেই জন্তুর কাটা পচাগলা শরীরের ওপর শকুন বসে তাদের মাংস, নাড়িভুড়ি খেত আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিত। একদিন দু'দিনের মধ্যেই মাংস খেয়ে পরিষ্কার করার পর পড়ে থাকতো শুধু হাড়। এবার সেই হাড়গুলো কুড়িয়ে নিয়ে যেত হামজার লোকেরা তাদের কর্তার গুদামে। খালের ধারে ফেলে রাখা চামড়া শুকিয়ে গেলে তারা তুলে নিয়ে ভাঁজ করে গুদামের একদিকে জমা করতো, তারপর একদিন চলে যেত ট্যাংরার ট্যানারিতে আর হাড়গুলো যেত সার কারখানায়। হামজার এই কারবারের জন্য কসাইবাগানের পরিবেশ সবসময়ই দুর্গন্ধে ম-ম করতো কিন্তু হামজার ভয়ে তাকে কেউ কিছু বলতে পারতো না।

হামজার এই একাধিপত্য একদিনে আসেনি। আট দশ বছর ধরে বহু দাঙ্গা হাঙ্গামা, মারপিট, ছুরি চালিয়ে সে বিস্তার করেছে তার ক্ষমতা। আর এই দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে করতেই সে বানিয়ে নিয়েছে নিজস্ব এক সন্ত্রাস বাহিনী। যারা একমাত্র তার কথা মতই তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতো ও বস্তির লোকজনকে মারধোর করতো।

ক্ষমতা যখন চূড়ান্ত হয়ে গিয়ে সম্রাট হয়ে বসলো, তখন সে বস্তির সব বিবাহযোগ্যা মেয়েদের একটা তালিকা মনে মনে তৈরী করে অনুচরদের জানিয়ে দিল কার কখন বিয়ে ঠিক হচ্ছে তার আগাম খবর যেন তাকে জানানো হয়। ইতিমধ্যে সে স্ত্রী হিসাবে তিনজনকে ঘরে এনে তুলেছে। তিনজনই সেই বস্তির বা তার আশপাশের মেয়ে। যাকেই যখন তার পছন্দ হয়েছে তাকেই সে তুলে নিয়ে এসেছে তার হারেমে। তাকে কেউ বাধা দিতে পারেনি। তার এরকম কাজের জন্য সে বস্তির ভেতর হাঁটলেই মেয়েরা লুকিয়ে পড়তো।

বিবাহযোগ্যা মেয়েদের তালিকা দেওয়ার ক'দিন পর হঠাৎ বস্তির মধ্যে চৌদ্দ পনেরো বছরের বালিকাকে দেখে তার মন নেচে উঠলো। সঙ্গী অনুচর সামসুদিয়াকে প্রশ্ন করলো, "এ কিস্‌কা লেড়কি?"

অনুচর জানালো বস্তির কোন ঘরের বাসিন্দা সেই বালিকাটি। অনুচরকে নিয়ে হামজা সোজা চললো সেই ঘরের দিকে। ঘরের মধ্যে বালিকাটির বাবা চুমকি বসানো কাজ করছিল। হামজা সোজা সেই লোকটিকে বললো, "মিঁয়া তৈহার লেড়কি সে কাল হাম শাদী করহ, সামকে আহিব।" লোকটা হামজার আদেশ শুনে প্রথমে ভ্যাবাচেকা খেয়ে তারপর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে কোনমতে সাহস নিয়ে বললো, "ও তো আভি ছোটা ভা আমির ভাই।" হামজা দাঁত বার করে ইঙ্গিতপূর্ণ হেসে বললো, "ছোট না ভা, হাম দেখলে হাই।" চুমকির ওস্তাদজী তবু

কাঁপা গলায় বললো, "তোঁহার তিন বিবি বা।" হামজা এত কথা শুনতে অভ্যস্থ নয়, মুখটা একবার কঠিন করে তারপর স্বাভাবিক নিয়ে এসে লোহার মত শক্ত বাঁ হাতটা তার হবু শ্বশুরের কাঁধে রেখে বরফ ঠাণ্ডা গলায় বললো, "তো ক্যা ভই, ও চৌথা হই।" তারপর সেই লোকটার কথার কোন উত্তর আর শোনার প্রয়োজন মনে না করে বললো, "হাম গোস্ত আউর মিঠাৎ দুকান মে কহ দেইব, তোঁহারা পয়সা না দেবেকে পরি।" হামজা আর দাঁড়ালো না, কাঁধ থেকে হাতটা নামিয়ে সামসুদিয়াকে নিয়ে ফিরে চললো নিজের কাজে। কাজ আজ তার বেড়ে গেছে, আগামীকাল বিয়ে তাই দোস্তদের খবর দিতে হবে। সব দোকানদারকে বলে দিতে হবে মেয়ের বাবাকে সব জিনিসপত্তর দিয়ে দিতে। সে তাই বাজারের দিকে চললো।

পরদিন বিয়াল্লিশ বছরের হামজা নতুন কোর্তা পায়জামা পরে ইয়ারদোস্তকে নিয়ে চললো বস্তির অন্যপ্রান্তে পনেরো বছরের এক বালিকাকে বিয়ে করতে। যাওয়ার আগে ইয়ারদের সঙ্গে খেয়ে নিল এক বোতল দেশি বাংলা মদ। পেট খালি রেখে আবার বিয়ে করতে যাওয়া যায় নাকি? আজ আবার কখন ছুটি পাবে মদ খাওয়ার, তাই প্রস্তুত হয়ে নিল।

পান চিবোতে চিবোতে, ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে পারিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে হামজা চলেছে বিয়ে করতে। বস্তির সবঘর থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে সবাই সেই অভিযানের দৃশ্য দেখতে লাগলো। হামজার ঘরে তার আগের তিন বিবি হামজার গতিপথের দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে ভাবছে, আর একটা তাদের মতো দুঃখিনীকে হামজার অত্যাচার সইতে তাদের সতীন হতে হামজা আনতে যাচ্ছে। তারা জানে ওই মেয়েটাকে নিয়ে হামজা খুব জোর মাসখানেক ফূর্তি করবে তারপর তাদের মত পেছনের ঘরের গুদামে ফেলে দেবে এবং খেয়াল খুশি মতো ব্যবহার করবে।

চতুর্থ বিয়ে হওয়ার পর বস্তিতে রটিয়ে দিল তাকে আগে থেকে না জানিয়ে যেন কসাইবাগানের কোনও মেয়েকে বিয়ে দেওয়া না হয়। ঘোষণা করার দিন পনেরো পরে এক বৃদ্ধ সন্ধ্যেবেলায় হামজাকে বলতে এল তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে যেন বিয়ের দিন তার ঘরে উপস্থিত থাকে। হামজা বৃদ্ধের দিকে তার হুকুম করা দৃষ্টি দিয়ে বললো, "তোঁহার লেড়কি কে শাদী ঠিক হো গায়ি, তু খুশি কি বাত বা, লেকিন শাদী কী দো রোজ পহেলে রাতকে হামারা লগে ভেঁজ দি হ।" হামজার প্রস্তাবে বৃদ্ধ একটু থমমত খেয়ে প্রশ্ন করে বসলো, "কাঁহে?" হামজা একই ভঙ্গীতে বললো, "উঁ রাত তোঁহার লেড়কি হামার সাথ রহি, উকার নথ হাম তুরব। শুভা উঠ কর চল যাহি, তু ওঁকর শাদীকর দি।" বৃদ্ধ হামজার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললো, "হামার লেড়কি তোঁহার লেড়কি কা সমান বা আমির ভাই।" হামজা বৃদ্ধের কথার

কোনও উত্তর না দিয়ে আগের মত কঠিন গলাতেই বললো, "তুহাঁরা বস্তি মে রহে কী বা? আউর লেড়কিকে শাদী করে কে দিল বা কি না? বৃদ্ধ কাঁদো কাঁদো ভাবে মাথা নেড়ে জানালো সে দু'টোই চায়। হামজা বললো, "তবে ঠিক বা, ভেজ দিহ্।"

বৃদ্ধ বিড়বিড় করতে করতে হামজার কাছ থেকে ফিরে চললো, সে ভালভাবে জানে হামজার হুকুম না মানলে তাকে এই বস্তিতে সে থাকতে দেবে না, মেয়েরাও বিয়ে দিতে দেবে না। তাই সে ঠিক করলো হামজার নির্দেশ সে তামিল করবে।

যথা দিনে যথা সময়ে হামজা অনুচরদের সঙ্গে মদ টদ খেয়ে নিজের ঘরে প্রতীক্ষা করছে, সেই বৃদ্ধটির আগমণের আশায়। সে তার মেয়েকে নিয়ে আসবে হামজার কাছে। হামজা সাকরেদদের তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দিয়েছে। ওদের কাজ শেষ।

বৃদ্ধ মেয়েকে নিয়ে আসলো। হামজার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। হামজা মেয়েটার দিকে একবার তাকিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর পাশের ঘর থেকে হামজার চারটে বিবি সারারাত ধরে শুনতে পেল মেয়েটার চিৎকার। বুঝলো হামজা একটা মহৎ কাজে ব্যস্ত, সে একটা কুমারী মেয়ের নথ ভাঙ্গছে। পরের দিন সকালবেলা মেয়েটা কোনমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি চলে গেল।

এরপর থেকে হামজার চরেরা কসাইবাগানের কোন মেয়ের বিয়ে ঠিক হচ্ছে, সেই খবর আগাম হামজার কাছে পৌঁছে দিত। সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ের বাবা মা-র কাছে পৌঁছে যেত হামজার বার্তা। আর সেই বার্তা মানে আদেশ। তার নড়চড় হওয়ার কোনও রাস্তা নেই। বিয়ের দু'দিন আগে সেই মেয়েরা হামজার ঘরে রাত্রি বেলা পৌঁছে যেত। হামজা তাদের নিয়ে রাত কাটানোর দু'দিন পরে তাদের "নিশ্চিন্তে" বিয়ে হলে তাঁরা বরের সঙ্গে চলে যেত নতুন সংসারে।

দশ বারোটা মেয়ের ওপর এইভাবে অত্যাচার করার পর হঠাৎ একটা মেয়ে সাহস দেখিয়ে বেঁকে বসলো। সে কিছুতেই তার বিয়ের দু'দিন আগে হামজার কাছে আসতে চাইলো না। খবর পৌঁছে গেল হামজার কাছে। হামজাতো মেয়েটার আস্পর্ধা দেখে রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। সে অনুচরদের ডেকে পাঠালো, অনুচররা জানে এবার কি করতে হবে। তারা ছুটলো সেই মেয়েটার বাড়ি। তারা তার দরজা ভেঙ্গে মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো হামজার বাড়ির দিকে। বস্তির কোন লোক তাদের কাজের প্রতিবাদ করলো না। এমন কি পুলিশকেও কোন খবর দিতে সাহস পেল না, হামজাদের ভয়ে নিজেদের মধ্যেও এ বিষয়ে আলোচনা করলো না। মেয়েটাকে নিয়ে এসে তারা হামজার পায়ের কাছে ফেলে দিল। হামজা মেয়েটাকে কটা গালাগালি দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। অনুচররা ঘরের বাইরে সারারাত ধরে পাহারা দিতে দিতে শুনলো মেয়েটার আর্তনাদ যা কিনা মহান

দায়িত্বে থাকা মাতাল হামজা দু'তিন বছর ধরে বস্তিতে পালন করে আসছে তারই অনুষঙ্গ হিসাবে। ভোর হয়ে আসলে হামজা সেই বিধ্বস্ত, লাঞ্ছিত, অপমানিত মেয়েটাকে বললো, "যা, চল জো। কাল তুঁহার শাদী মে আহিব।" মেয়েটা জেদি গলায় বলে উঠলো, "হাম না জাহিব।" হামজা তার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললে, "তু না জাহিব তো, কা করবে?" জবাবে মেয়েটি বললো, "হাম ইহাঁই রহব।" তার বাড়িতে থাকবে শুনে হামজা বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলো, "ইঁহা, হামরে সাথ, হামরে ঘর মে?" মেয়েটা দৃঢ়ভাবে বললো, "হ্যাঁ, কাল শাদী হাম না করব। হামার শাদী কাল রাত মে তুঁহারা সাথ হো গেহি।" মেয়েটা হামজার পঞ্চম বাঁদী হয়ে সেই থেকে হামজার বাড়িতে থেকে গেল।

হামজার এইসব কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করতে একটা ছেলে এগিয়ে আসলো। সে ওই বস্তির বাসিন্দা ছিল না। সে থাকতো নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোডে, কিন্তু তার বিবাহিতা দিদি থাকতো হামজার পাশের বাড়িতে। তার কাছ থেকেই সে হামজার অত্যাচারের কাহিনী শোনে। সে ছিল ডাক ও তার বিভাগের কর্মী, জিপিওতে কর্মরত এবং প্রকৃত সমাজসেবী, সে চুপিসারে কসাইবাগানে এসে বস্তির লোকেদের হামজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে লাগলো। সে এবার নিজের উদ্যোগে বস্তির একটা মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে, সেই খবর হামজা ও তার অনুচরদের কানে পৌঁছানোর আগেই তাকে বস্তির বাইরে নিয়ে গিয়ে তার "নিকা" করিয়ে দিল। খবর চাপা রইলো না, হামজার কানে পৌঁছে যেতে হামজা সেই সমাজসেবী ছেলেটির ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে প্রস্তুত হয়ে রইলো। হামজার হুংকার সেই ছেলেটির কানেও পৌঁছালে, কিন্তু তাতে সে একটুও দমলো না, সে যথারীতি তার কাজ গোপনে চালিয়ে যেতে লাগলো।

ভেতরে ভেতরে একটা টানটান উত্তেজনার স্রোত বইতে লাগলো। সেসময় একদিন ছেলেটির দিদি নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোডে ছেলেটির বাড়ি বেড়াতে গেছে। সেখানে গল্প করতে করতে তার প্রায় ন'টা বেজে যায়। সে কসাইবাগানে তার বাড়িতে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হলে ছেলেটি তার দিদিকে বললো, "রাত হয়ে গেছে, চল তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।" সে দিদিকে কসাইবাগান বস্তিতে নিয়ে আসলো। খবর পৌঁছে গেল হামজার কাছে। সে যেন এই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করছে! সে ভেবেই পাচ্ছে না কিসের জোরে ছেলেটি তার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে ফেলার সাহস দেখাচ্ছে। অন্যদিকে ছেলেটি তার দিদিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফেরার সময়ই হামজা তার দলবল নিয়ে ছেলেটিকে ঘিরে ধরলো। হামজার সবাই মদ খেয়ে ভরপুর মাতাল। হাতে হাতে ছুরি, ভোজালি।

অন্ধকার গলির ভেতর হামজা দাঁত বার করে ছেলেটিকে প্রশ্ন করলো, "কেয়া

রে তুঁহার কোন বাপ অ্যাপ তুকে বাচাই?” ছেলেটি চরম বিপদ বুঝে হামজার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হামজার একটা চেলাকে ঠেলে ফেলে ছুটতে শুরু করলো। শিকার পালাচ্ছে দেখে হামজারাও তার পেছনে পেছনে হায়নার মতো ছুটতে লাগলো। ছেলেটি সামনের এক বিড়ির গুদাম দেখে তার মধ্যে ঢুকে গেল। হামজা, সামসুদিয়াও খোলা ভোজালি, চপার, ছুরি নিয়ে গুদামে ঢুকে গেল। তারপর আর কোন কথা না বলে প্রথমে হামজা ছেলেটির পেটে ঢুকিয়ে দিল ইঞ্চি দশেক মাপের একটা ধারালো ছুরি। ছেলেটা মুখ দিয়ে “আঃ” শব্দ বার করে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার মূহুর্তে সামসুদিয়া ভোজালি দিয়ে মারলো তার ঘাড়ে। রক্তে ভেসে যেতে লাগলো তার সারা শরীর। সে পড়ে গেল বিড়ির গুদামের মেঝেতে। এবার হামজার দলের সবাই মিলে তাকে পেটে, পিঠে, কোমরে, গলায় চপার আর ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে লাগলো। মিনিট পাঁচেক খোঁচাখুঁচির পর সামসুদিয়া ছেলেটির বাঁ হাতের নাড়ি টিপে দে'খে হামজাকে বললো, “ওস্তাদ, শালা খতম হো গইল। ওস্তাদ আমির হামজার তখনও রাগ কমেনি। জ্বলন্ত চোখ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, “হামার পিছে লাগল র হ?” তারপর ডান পা দিয়ে অসীম ঘৃণায় হামজা সমাজসেবী ছেলেটির মুখে পরপর দু'টো লাথি মেরে চেলা চামুণ্ডাদের বললো, “চল।”

খুন হওয়ার কথা রটে যেতে হামজারা বস্তি ছেড়ে পাললো। বেশিদিন হামজা পালিয়ে থাকতে পারলো না। হাওড়া জেলার ব্যাঁটরা থানা অঞ্চলের এক বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হলো। খুনের মামলাটা হয়েছিল নারকেলডাঙ্গা থানায়। সেখানে তাকে রাখা হল। চার পাঁচ দিন পর আমাদের লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরে খবর এলো, নারকেলডাঙ্গা থানার ভেতর সে একেবারে “বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অতিথির” মতো বহাল তবিয়তে আছে, একে একে দুই, দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে বুঝে ফেলা যায় কি হতে যাচ্ছে।

সোজা বলা যায়, যাদের জন্য হামজা “বিশেষ অতিতির সম্মান” পাচ্ছে থানা লকআপে, তারা সেই খুনের তদন্তে ও মামলাটিতে “বিশেষ অতিথির” স্বার্থ দেখেই করবে। অর্থাৎ হামজার কিছুই হবে না, আদালত তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। তাই উদ্যোগ নিয়ে শিয়ালদহ কোর্টের আদেশ বলে মামলাটার তদন্তের দায়িত্ব উল্টোডাঙ্গা থানা থেকে আমাদের দফতরে নিয়ে আসা হল। হামজাকেও উল্টোডাঙ্গা থানার লকআপ থেকে লালবাজারের সেন্ট্রাল লক্‌আপে এনে পুরে দেওয়া হল।

হামজা ধরা পড়লেও, তার সঙ্গীদের তখনও ধরা যায়নি। কসাইবাগানের বস্তিতে আমাদের সোর্সদের লাগিয়ে দেওয়া হলো সেই সূত্র বার করার জন্য। দিন দুই পর খবর পাওয়া গেল, হামজার খুনি অনুচররা সবাই মুম্বাই চলে গেছে। খবর আসলো

তারা খুব সম্ভবত মুম্বাইয়ের লেফাফা বানানোর মহল্লাতে আস্থানা গেড়েছে। আমাদের দক্ষ অফিসার স্বদেশ রায় চৌধুরী একজন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে দেবীবাবুর অনুমতিতে চলে গেলেন মুম্বাই। তারপর সেখানে মুম্বাই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে একটা জীপ ও ক'জন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে একক প্রচেষ্টায় তিনি সামসুদিয়া ও অন্যাদের এক এক করে গ্রেফতার করলেন কুল্লা কসাই মহল্লা, যোগেশ্বরী ঝুপড়ি ও তাজ হোটেলের সামনের এক চায়ের দোকানের থেকে।

তিয়াত্তর সালে হমাজা, সামসুদিয়া সহ আরও দু'জনের সেই খুনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এতে কি আর কোনদিনও ভরাট হবে খালি হয়ে যাওয়া দিদির বুক কিংবা অপমানিতা, লাঞ্ছিতা সেইসব মহিলারা, যারা হামজার ধর্ষিতা হয়েছিলেন। তাদের মন কি কোনওদিন শান্ত হবে?

কসাইবাগানের মতো ততটা ঘিঞ্জি না হলেও ইসমাইল স্ট্রিটে যেখানে থাকতো ইয়াসিন সেটাও একটা অতিরিক্ত ঘন বসতিতে ভারাক্রান্ত একটা পরিবেশে ঘেরা দুর্গন্ধযুক্ত এলাকা। ইয়াসিন ছিল সাট্টার কারবারি, সত্তরের দশকে তার উত্থান। পার্কসার্কাস, বেনিয়াপুকুর, মল্লিকবাজার ও তার আশেপাশের অঞ্চলে তার সাট্টার কারবার একক ভাবে চলতো, অন্য সাট্টার কারবারিরা ওই সব এলাকায় ঢুকতে পারতো না। ইসমাইল স্টিটে নিজের বড় বাড়িতে বসে ইয়াসিন কমপিউটারের ভঙ্গিতে সব চালাতো । পুলিশ যদি তাকে ধরতে যেত, তার চারদিকে ছিটিয়ে থাকা চর মারফৎ সঙ্গে সঙ্গে ইয়াসিন খবর পেয়ে যেত এবং ইয়াসিন পালাতো। তার যন্ত্র সবসময়ই সক্রিয় ও সজীব থাকতো। তার যন্ত্রের মূল অংশ ছিল ঔরঙ্গজেব।

ট্রাম কোম্পানির কর্মচারী, এ আই টি ইউ সি ইউনিয়নের এক সদস্যের ছেলে ঔরঙ্গজেব থাকতো বেনিয়াপুকুরের ক্যানটোফার লেনে। সে ইয়াসিনের সাট্টার কারবারে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিল। ইয়াসিনের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বুকিরা অর্থাৎ যাদের অধীনে পেনসিলাররা সাট্টার প্যাড্ হাতে খেলা চালাতো এবং যাদের কাছে খেলার টাকা এসে জমা হতো, তারা যদি কোন রকম উল্টোপাল্টা করতো তবে দ্রুত সেখানে পৌছে যেত। ঔরঙ্গজেবের নেতৃত্বে ইয়াসিনের প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং তারা সাট্টার দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নকারীকে ঝটপট মেরে উদ্যত বিষ দাঁত ভেঙ্গে চলে আসতো ইসমাইল স্ট্রিটে ইয়াসিনের সদর দফতরে, তাদের কাজের বিবরণের বর্ণনা দিত। এদের দৌলতে ইয়াসিনের ব্যবসা তৈলাক্ত যন্ত্রের মতো মসৃণ ভাবে ভালই চলছিল। ইয়াসিনের সাট্টার রাজত্বে একদিকে রয়েছে শত্রুর আক্রমণ সংবাদ আগাম পাওয়ার জন্য রাজত্বের চারদিকে নিজস্ব দূতের দ্বারা সজাগ সিগন্যাল বাহিনী, অন্যদিকে ক্ষমতা প্রয়োগ করার পেশীশক্তি। সাট্টার পথ ধরে ইয়াসিনের কাছে আসতে থাকলো লক্ষ লক্ষ টাকা, আর সেই টাকার কিছু অংশ সে ঔরঙ্গজেবদের ছিটিয়ে দিত।

অল্প টাকা হাতে পেলে ঔরঙ্গজেবের পোষাতো না। কারণ তার অনেক খরচ! চারদিকে রয়েছে ভোগ বিলাসের উপকরণ, সেই উপকরণ ভালভাবে ভোগ করতে হলে চাই প্রতিদিন মুঠো মুঠো টাকা। যে টাকা ইয়াসিন তাদের সামনে রেখে উপার্জন করছে। সেই টাকারই একটা অতি অল্প অংশ সে কেন ইয়াসিনের কাছ থেকে হাত পেতে নেবে? তাই আশির দশকের প্রথমেই সে মুন্না, তালিফ, জাহিদদের নিয়ে ইয়াসিনের দল থেকে বেরিয়ে এসে নিজেই একটা দল তৈরী করে শুরু

করলো ওই অঞ্চলের ছোট ছোট ব্যবসায়ী থেকে তোলা আদায় করা। ইয়াসিনের বুকিদের মারধোর, হুমকি দিয়ে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া। ঔরঙ্গজেব শুধু ব্যবসায়ীদের ঘরেই ত্রাস পৌঁছে দিল না, প্রতিদিন ইয়াসিনের বুকিদের থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ফলে ইয়াসিনের কারবার, বুকি ও পেন্সিলারদের রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে। ইয়াসিন তার পুরানো চেলা ঔরঙ্গজেবের বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে পাল্টা আঘাত দিতে লাগলো। ফলে শুরু হয়ে গেল ইয়াসিন বনাম ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ। ঔরঙ্গজেব ইতিমধ্যে বুঝে গেছে তাকে এই যুদ্ধে জিততে হলে দরকার আছে একটা রাজনৈতিক আশ্রয়। সেই জন্য সে পেয়ে গেল ইনটাকের দুই বড় মাপের নেতাকে। একজন সর্বভারতীয় অন্যজন বর্তমানে প্রয়াত, তৎকালীন ইনটাকের রেলওয়ে শ্রমিক নেতা। শুধু পেয়ে গেল বললে ভুল হবে তাদের অতি নিকটে বুকের কাছে চলে গিয়ে উষ্ণ ঘনিষ্ঠ হয়ে একান্ত আপন হয়ে গেল। রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার পর ঔরঙ্গজেব একে একে সব গুটি সাজাতে লাগলো যাতে ইয়াসিনকে উচ্ছেদ করে তার রাজত্বটা নিজের আয়ত্তে আনা যায়। এই গুটি সাজাতে গিয়ে সে বুঝে গেল ইয়াসিনকে অল্প প্রয়াসে উদ্বাস্তু করা যাবে না। তাকে বাস্তুহারা করতে হলে একেবারে পৃথিবী ছাড়া করতে হবে। ঔরঙ্গজেব সেই চেষ্টাই চালিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু ধূর্ত ইয়াসিন তার পুরনো ছাত্রের থেকে অনেক বুদ্ধি রাখে। সে কেন ঔরঙ্গজেবদের ফাঁদে পা দিয়ে নিজের সাজানো বাগান তার হাতে তুলে দিয়ে যাবে? ইয়াসিন ও ঔরঙ্গজেবের দলের রাজত্ব দখলের সংঘর্ষের জন্য এলাকার ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের ওপর চললো অশান্তির দিনযাপন। তাতে তাদের কি? নতুন জননেতা ঔরঙ্গজেবের চাই অন্ধকার ও আলোর দু'টো জগতই। আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের যা একমাত্র আদর্শ ও কাঙ্খিত চাহিদা। একদিকে আলোর পথে উদ্ভাষিত জনগণের কণ্ঠে তার জয়জয়কার ধ্বনি ও জয়গান, অন্যদিকে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে কোটি কোটি টাকা পকেটে এনে দৌদ্দপুরুষের সুখের পরম রাস্তা প্রশস্ত ও পরিষ্কার রাখা। ঔরঙ্গজেব সেই স্বপ্নে বিভোর কিন্তু সেই চরম প্রাপ্তির পথে বাধা হচ্ছে ইয়াসিন।

সে ভাবলো, সম্রাট হতে গিয়ে ঔরঙ্গজেব কি নিজের ভাই দারা, সুজাদের খুন করে পিতা সাজাহানকে কারাগারের অন্ধকার কুঠরিতে নিক্ষেপ করে স্বপ্ন সফল করে নিজেকে ইতিহাসের পাতায় তুলে রেখে যায়নি? আর সে আধুনিককালের বেনিয়াপুকুরের ঔরঙ্গজেব নিজের রাজত্ব গড়তে একটা সাট্টার কারবারী ইয়াসিনকে খুন করতে পারবে না? পারবে, তাকে পারতেই হবে। আর সে খুন করে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকতে পারলে তার রাজনৈতিক আশ্রয়দাতারা মামলা হজম করে দিতে পারবে। সেই বিশ্বাস তার আছে।

ইয়াসিনকে খুন করার শপথ নেওয়ার পর মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে, কিন্তু ঔরঙ্গজেব কিছুই করতে পারছে না। ফলে তার ভেতরে হতাশার থেকে ক্রমে ক্রমে জন্মাচ্ছে চরম অধৈর্য্য।

সে সময় একদিন সকালবেলা ঔরঙ্গজেব তার দলের হায়দার, তালিফ, মুন্না ও জাহিদকে সঙ্গে নিয়ে তোলা আদায় করতে বেরিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলো ইয়াসিনের ভাইপো, চৌদ্দ বছর বয়েসের আকবরকে। সে স্কুলে যাওয়ার আগে একটা পাঁউরুটি কেনার জন্য একটা দোকানে এসেছে। ঔরঙ্গজেব ইয়াসিনকে খুন করার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে। সে আকবরকে দেখে ইয়াসিনের বদলে তাকে হাতে পেয়েই ঠিক করে নিল আকবরকেই খুন করবে। যেমন চিন্তা, তেমনি কাজ। ঔরঙ্গজেবের ইঙ্গিতে সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে আকবরের ওপর ঔরঙ্গজেব ঝটিকা আক্রমণ করে তাকে একেবারে পাঁজা করে তুলে নিয়ে চললো বড় রাস্তার দিকে। বাচ্চা ছেলে আকবর নিজেকে ওদের পাঁচজনের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। কিন্তু সে ওই পাঁচজনের শক্তির সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? তারা আকবরকে নিয়ে এসে ফেললো নর্দমার ধারে এবং দ্রুত ঔরঙ্গজেব পকেট থেকে বের করলো একটা ছুরি আর সোজা চালিয়ে দিল আকবরের পেটে। চিৎকার করে আকবর পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। মুন্না মারলো এক ভোজালীর কোপ, নর্দমার পাশে পড়ে ছিল ক'টা ইঁট। জাহিদরা সেগুলো তুলে নিয়ে তা দিয়ে মারতে লাগলো আকবরের মুখে। গলগল করে পড়তে থাকলো রক্ত। চোখের মণি দু'টো বেরিয়ে আসলো, অন্যদিকে ঔরঙ্গজেব ইয়াসিনের ওপর তার সমস্ত রাগ এক করে হাতের ছুরিটা ক্রমাগত গফ্‌গফ্ করে চালিয়ে যেতে রইলো তার পেটে।

সাত আট মিনিট পর ঔরাঙ্গজেব তার দল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবং আকবরকে নর্দমার পাশে রক্তমাখা একটা মাংস পিন্ডের মতো করে ফেলে রেখে চলে গেল। ইয়াসিনের দুর্গে একটা কঠিন আঘাত হানতে পারার জন্য ওদের মুখে একটা তৃপ্তির হাসি। সেই হাসিতে যোগ দিতে পারেনি এতক্ষণ ওদের হিংস্রতা দেখতে থাকা পাশের এক মুদিখানার দোকানদার। সে এবার ছুটে এলো আকবরের কাছে। তাড়াতাড়ি তার রক্তমাখা শরীরটা তুলে নিয়ে ছুটতে লাগলো, তখনও আকবরের হাতে ধরা ছিল স্কুলে টিফিনে খাওয়ার জন্য পাউরুটিটা। সেই পাউরুটিটাও রক্তে ভিজে গেছে। দোকানদারের ছোটার ফলে আকবরের নেতিয়ে পড়া হাত থেকে টুপ ক'রে পড়ে গেল পাউরুটিটা। অল্প যাওয়ার পর দোকানদার একটা রিক্সা পেতে রিক্সাওয়ালাকে বললো, "চল, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।" রিক্সাওয়ালাও এতক্ষণ ঔরাঙ্গজেবদের কীর্ত্তি দেখছিল। সে তাড়াতাড়ি দোকানদারকে রিক্সায় তুলে রিক্সা নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে লাগলো। দোকানদারের কোলে শুয়ে আছে আকবর

তখনও তার প্রাণ দেহ ছেড়ে পালায়নি। তাকে তাই বাঁচিয়ে তোলার জন্য দোকানদার ও রিক্সাওয়ালার প্রাণপন প্রয়াস। রিক্সা কিছুটা চলার পর হঠাৎ ওরা দেখতে পেল আরোহীহীন ট্যাক্সি। ওরা ড্রাইভারকে অনুরোধ করতে ড্রাইভার ওদের তুলে নিল। রিক্সাওয়ালা তার রিক্সাটা রাস্তার পাশে ফেলে রেখে দোকানদারের সঙ্গে আকবরের মৃতপ্রায় শরীরটা নিয়ে পেছনের সিটে বসে পড়তে, ট্যাক্সি ছুটলো নীলরতন হাসপাতালের দিকে। না, ডাক্তারদের শত চেষ্টাতেও আকবরকে বাঁচানো যাইনি। তবে, মৃত্যুর আগে সে ক্ষীণ গলায় জবাববন্দিতে অতিকষ্টে বলে যায় তার খুনিদের নাম।

আকবরকে খুন করে ঔরঙ্গজেবরা আত্মগোপন করলো। তাদের গোপন সব জায়গাতে আমাদের বাহিনী হানা দিলেও তাদের পাওয়া গেল না। আমাদের গুপ্তচরেরাও তাদের গতিবিধি ও গোপন আস্তানার খবর সরবরাহ করতে ব্যর্থ হচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ খবর এলো ঔরঙ্গজেবেরা চারজন সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোডের ওপর এলিট সিনেমাতে নাইট শোতে সিনেমা দেখতে এসেছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাদা পোশাকের বাহিনী দিয়ে এলিট সিনেমার সমস্ত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওদের বার হওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে সিনেমা হলের মধ্যে আটদশ জন অফিসার ও কনস্টেবল ঢুকে গেল। হলের ম্যানেজারকে অনুরোধ করে শো চলাকালিনই হল লাইট ফেলে দিয়ে ঔরঙ্গজেবদের নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতার করা হল। সেখান থেকে সোজা লালবাজারে সেন্ট্রাল লকআপ।

আকবর খুনের মামলা শুরু হল। আর আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, ঔরঙ্গজেবকে ছাড়ানোর জন্য ইনটাকের সেই কংগ্রেসী সভাপতি ও তাদের রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা তদ্বির শুরু করেছেন। মাঝেমধ্যেই শুনানীর সময় আদালতেও হাজির থাকছেন। ভাবতে অবাক লাগে, ঔরঙ্গজেবের মত একটা একশভাগ সমাজবিরোধী কোন শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে যে তার মুক্তির ব্যবস্থা করতে তাদের মত পরিচিত নেতাদেরও লজ্জার ঘোমটা খুলে ফেলে একেবারে সরাসরি মাঠে নেমে পড়তে হয়? না, তাদের সেই চেষ্টায় কোনও ফল হয়নি, উল্টে আদালতে তাদের উপস্থিতিতেই ঔরঙ্গজেবদের যাবজ্জীবন সাজা হয়ে যায়। সাজা হওয়ার পর তাদের মহল্লায় মহল্লায় ছোট ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার ও সাধারণ বাসিন্দারা আনন্দে দরগায় দরগায় সিন্নি চড়ায়। বোধহয়, তাঁরা "মানত-টানত" করেছিলেন এবং তাঁরা দেখেছিলেন সাক্ষীদের ভয় দেখিয়ে তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে ঔরঙ্গজেব তার দলের অন্য সদস্যদের পাঠিয়ে হুমকি দিয়ে এবং ঘরছাড়া করে মামলাকে নিজেদের অনুকুলে নিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমাদের গোয়েন্দা

দফতরের দক্ষ অফিসাররা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে ঔরঙ্গজেবের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আদালতে সমস্ত সাক্ষী হাজির করিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে ; আকবরকে ঔরঙ্গজেবেরাই খুন করে, সেই খুশিতেই ঔরঙ্গজেবের হাতে নিগৃহীত মানুষ সিন্নি চড়িয়ে ছিলেন।

ঔরঙ্গজেবেরা জেলে চলে গেলেও তারা কিন্তু ইয়াসিনকে হত্যার পরিকল্পনা ত্যাগ করলো না। সেই প্রচেষ্টা তারা জেলে বসেও অব্যাহত রাখলো। আর তাদের বাইরের সদস্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে থাকলো কিভাবে ইয়াসিনকে শেষ করা যায়। অন্যদিকে ইয়াসিন তার খুনি শত্রু ঔরঙ্গজেব জেলে চলে যাওয়াতে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। সে তার অন্ধকার রাজত্বের রাজার সঙ্গী হিসাবে, যেসব চেলাদের দেহরক্ষী হিসাবে নিয়ে চলাফেরা করতো তাদের অনেক সময় বিশ্রাম দিয়ে একা একাই ঘুরতে শুরু করলো। এটা জেলে বসা ঔরঙ্গজেবকে উৎসাহিত করলো। একদিন সকাল এগারোটা নাগাদ ইয়াসিন কোনও এক কাজ থেকে তার গাড়ি চড়ে ফিরছিল। গাড়িতে শুধু তার ড্রাইভার, সে রাজার ভঙ্গিতে পিছনের সিটে গা ছেড়ে দিয়ে বসেছিল। গাড়ি পার্কসার্কাসের সাত রাস্তার সংযোগ স্থলে আসতেই তার গাড়ি ঘিরে ফেললো ঔরঙ্গজেবের "সমাজসেবক ফৌজ"। এবং মুহূর্তের মধ্যে ইয়াসিনকে লক্ষ্য করে মারতে শুরু করলো বোমা ও ছুঁড়তে লাগল রিভলভার ও পিস্তল থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি। বোমা ও গুলি বর্ষণের পর তারা স্থান ত্যাগ করে পালালো। ইয়াসিনের ছিন্ন দেহ সিটের ওপর তখন লুটিয়ে আছে।

খুনের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অফিসাররা হাজির। তারা গিয়ে দেখল, ইয়াসিনের কাছেও একটা রিভালবার ছিল, কিন্তু সেটা সে ব্যবহার করার সুযোগ পায়নি। পরে দেখা গেল, ইয়াসিনের রিভলবারটা আইন মাফিক। অর্থাৎ লাইসেন্সড্ রিভলবার। তাতে প্রমাণ হল, আমাদের দেশে টাকা থাকলে সাট্টাবাজ ও সমাজবিরোধীরাও লাইসেন্স আগ্নেয়াস্ত্র পেতে পারে।

ইয়াসিনের হত্যাকারীরা অল্প ক'দিনের মধ্যে ধরা পড়লেও আদালত থেকে তাদের সাজা হল না। আকবর হত্যা মামলায় ঔরঙ্গজেবেরা যে চেষ্টা করে সাক্ষীদের নিজেদের পক্ষে আনতে ব্যর্থ হয়েছিল এখানে তা সফল হলো এবং তাই ইয়াসিন হত্যা মামলায় কারও সাজা হলো না। কিন্তু তারপরেও আমাদের জন্য আরও চমক অপেক্ষা করছিল। যা দেখার জন্য কলকাতা পুলিশের কোনও কর্মচারী প্রস্তুত ছিল না।

যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদিকে সাজা পাওয়ার একদিন পরেই সরকারী সুপারিশে রাজ্যপালের ক্ষমা প্রর্দশনের মাধ্যমে মুক্তি পেতে পারে। আবার কোনও দিন সরকার নাও ছাড়তে পারে। যখনই তাদের ছাড়া হয় তা ক্ষমা করার মাধ্যমেই।

ঔরঙ্গজেবকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বামপন্থী এক প্রভাবশালী নেত্রী লালবাজারে এসে তখনকার কমিশনার সাহেবকে তদ্বির এবং অনুরোধ করলেও সেটা খুব কার্য্যকর হয়নি। কিন্তু পর্দার আড়াল থেকে প্রচণ্ড প্রভাবশালী বামপন্থী সাংসদ ও পরবর্তীকালের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সোজাসুজি অনুরোধে ঔরঙ্গজেবকে সরকার জেল খাটার অল্প কয়েক বছর পর ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে ছেড়ে দিলো। ইনটাকের নেতারা ঔরঙ্গজেবকে জেলে যাওয়া আটকাতে না পারলেও তাদের বিপরীত রাজনৈতিক দলের নেতার দৌলতে সে একা জেল থেকে বেরিয়ে আসলো। জেল থেকে বেরিয়ে সে হয়ে গেল এক নম্বর বামপন্থী! সে কিছুদিন পর কতটা বামপন্থী হয়েছে তা প্রমাণ করতে সেই ইনটাক নেতাদের পার্টির এক কমিশনারকে প্রকাশ্য রাস্তায় মারলো। রাজনৈতিক লুডু খেলার যারা খবরাখবর রাখে তারা কিন্তু এ ব্যাপারে অবাক হলো না। তারপর থেকে তার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার বাড়ির অঞ্চলে প্রমোটারদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা। এবং মাথার পাতলা চুলকে হিপির মতো করে কনটেসা গাড়িতে চড়ে চেলা চামুণ্ডাসহ সারা কলকাতা দাপিয়ে বেড়ানো। তখন ফর্সা, লম্বা চেহারার ঔরঙ্গজেবকে দেখে মনে হয় সত্যিই বোধহয় সে দিল্লীর মসনদে বসে আছে!

মসনদ কারও টেকে, কারও টেকে না। কেউ সাম্রাজ্য গড়তে পারে, কেউ পারে না। সাম্রাজ্য গড়ার পথেই হারিয়ে যায়। এ যেন অনেকটা সামন্ততন্ত্র ছোট ছোট রাজায় রাজায় যুদ্ধ। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইতিহাসের পাতায় বিলীন হয়ে যাওয়া। অন্ধকার মস্তানীর জগতে টিকে থাকতে হলে শুধু নিজের পরিধিতে নিজের শিবির টিকিয়ে রাখলেই চলবে না। সদাসতর্ক জাগ্রত থাকতে হবে যে কোন রকম শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য। সে শত্রুতা এমন কি আসতে পারে সৈন্য বিদ্রোহের মতো নিজের পার্শ্বচরের কাছ থেকে বা সন্ধি পাতানো অপর রাজার কাছ থেকে। নিয়ত এই টানটান টানাপোড়েনের মধ্যে বেঁচে থাকার কলাকৌশল যে আয়ত্ব করতে পারে, সেই পারে বেশি দিন মসনদে বিরাজ করতে। আর সেই বিরাজ করার জন্য প্রয়োজন আইনী ক্ষমতার মদত। যা কিনা অকাতরে টাকা পয়সা খরচ করে অনায়াসে করায়ত্ত করা যায়। যে টাকার উৎস অবশ্যই অন্ধকার গুহার পথ।

যে গুহার পথ ধরে টাকা রোজগার ও ক্ষমতার মদত জোগাড় করে সাম্রাজ্য করার পথে নেমে পড়েছিল খিদিরপুরের সতেরো নম্বর রমানাথ পাল রোডের সনৎ কুমার মাইতি। অবশ্য এই নামে খিদিরপুর অঞ্চলের ক'জন লোক ওকে চিনবে? খুব সামান্যই। অথচ ওর ডাকনাম বা যে নামে সে পরিচিত হয়ে উঠেছিল সেই নামে ওকে চিনতো না এমন লোক খিদিরপুরে প্রায় নেই। হিন্দু পরিবারের ছেলে সনৎ মুসলিম সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্যাঁজা গলিতে তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিশতে মিশতে তাদের আচার আচরণ ও পোষাক আষাক অনুকরণ করতে করতে তাতেই অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল এবং নুরুশ নামে খ্যাত হয়ে গিয়েছিল।

কিশোর নুরুশ প্রথমে নকশাল আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। এবং সে রমানাথ পাল রোড, রামকমল স্ট্রিট, গ্যাঁজা গলির দেওয়ালে দেওয়ালে মাও-জে-দঙের টেনসিল করা ছবি রঙ দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিল। তার তখনকার নেতা ছিল বেহালার গাবতলা অঞ্চলের একসময়কার উঠতি মস্তান ও পরে নকশাল হয়ে যাওয়া নীল বা অনিল চক্রবর্তী। কিন্তু নীলের রাজনৈতিক শিক্ষাদীক্ষা এমন ছিল না যে সে অন্য ছেলেদের সঠিকপথে নিয়ে যেতে পারবে। তার মধ্যে "অ্যাকশনটাই" প্রাধান্য পেতো, যে মতবাদ পরবর্তীকালে সমগ্র নকশাল আন্দোলনের মূল পথ হয়ে আন্দোলনকেই গ্রাস করে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। নীলের ওই মস্তানী রাজনীতির স্রোত নুরুশের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে গেঁথে গিয়েছিল। সে তাই সত্তর সালের প্রথমদিকে একদিন হাইড রোড ইনস্টিটিউট হলে হিন্দু সভার পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়নের মিটিং চলাকালীন তাঁদের নেতা মাখন চট্টোপাধ্যায়কে মঞ্চে উঠে চড় মেরে বসলো, এ নিয়ে বিরাট হইচই হলো এবং নুরুশ ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া রুলে গ্রেফতার হয়ে জেলে চলে গেল।

মাখনবাবু থাকতেন ফ্যান্সী মার্কেটের সংলগ্ন গলিতে। নুরুশের বাড়ির কাছেই। সেখানে নুরুশের মা প্রায় প্রতিদিন যেতেন, ছেলেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কান্নাকাটি করে মাখনবাবুকে অনুরোধ করতেন। মাখনবাবু নুরুশের মা'র অনুরোধ রক্ষা করে নুরুশকে মাস কয়েকের মধ্যে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তারসঙ্গে আবার যোগাযোগ হলো তার রাজনৈতিক গুরু নীলের। এবং নীলের সঙ্গে সে বেহালা অঞ্চলে ছোটখাট সংঘর্ষে ভূমিকা নিতো।

একাত্তরের প্রথমদিকে কংগ্রেসের প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী সভা করতে এলেন তখনকার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী সৎপতি খিদিরপুরের কবিতীর্থ পার্কে। নীল ও নুরুশরা ষড়যন্ত্র করলো ওই সভায় হানা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে হত্যা করার।

পার্কে সভা চলাকালীন সভামঞ্চ ঘিরে রেখেছে আমাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাদা পোশাকের পুলিশরা। নন্দিনীদেবী বক্তৃতা দিচ্ছেন। অন্যদিকে নুরুশ এলাকার ছেলে হওয়ার সুযোগ নিয়ে নীল সমেত অন্য ক'জন নকশাল ছেলেকে সঙ্গে করে মঞ্চের একেবারে কাছাকাছি চলে গেলেন। প্রত্যেকের কাছেই রয়েছে বোমা ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র। শীতকাল, নুরুশের পেছনেই ছিল চাদরে আর্ধেক মুখ ঢাকা নীল। আমাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার রঞ্জিতবাবু তবু নীলকে চিনতে পেরে যায় এবং আসন্ন বড়মাপের সংঘাত এড়াতে তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে নীলকে ইশারায় জানিয়ে দেয় সেখান থেকে চলে যেতে। নীলও বোঝে যে তারা স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাদা পোশাকের পুলিশের দ্বারা প্রায় পরিবেষ্ঠিত, সুতরাং সেখানে তাদের কর্মসূচী পালন করার অর্থ নিজেদেরও সবাইকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশের রিভলবারের

গুলিতে ঝাঁঝরা হতে দেওয়া। নীল তার দলবল নিয়ে পশ্চাদাপসরণ করলো। রঞ্জিতবাবু তাদের গ্রেফতার করার চেষ্টা করলো না, কারণ তিনি ভাবলেন গ্রেফতার এড়াতে নুরুশরা বোমা, গুলি ছুঁড়তে পারে। এবং তখন চরম বিপদও ঘটতে পারে, যা তখন একেবারে কাম্য নয়। যুদ্ধের পরিস্থিতি অনুযায়ী দু'পক্ষই রণকৌশলের একই পথ নিয়ে বেঁচে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিন পর ওয়াটগঞ্জ থানার সাব-ইন্সেপেক্টর বাসুদেব দে সকালবেলায় তার টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে অফিসে আসার পথে নকশালদের হাতে তরোয়ালের কোপে ও রিভলবারের গুলির আঘাতে খুন হয়ে গেল। সেই খুনের সূত্রে নুরুশকে গ্রেফতার করা হল, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ না থাকায় সে ছাড়া পেয়ে গেল।

জেল থেকে বেরিয়ে সে নকশাল রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে মস্তানী আর দাদাগিরিতে মেতে গেল। আর সেই দাদাগিরি করার পথে তাকে থামানের চেষ্টা করলো আরেক উঠতি "দাদা" সঞ্জয়। সে নুরুশের পেটে ছুরি মারলো। কিন্তু নুরুশ বেঁচে গেল। সুস্থ হয়ে উঠে নুরুশ দেখলো কেওড়াপাড়ার ছেলে সঞ্জয়কে না খতম করতে পারলে সে দাদাগিরি চালাতে পারবে না। সে তখন আরেক উঠতি "দাদা" ওয়াটারপোলো খেলোয়াড় হেম্‌চন্দ্র স্ট্রিটের দেবাশিষ ওরফে টোটনের সঙ্গে মিলে দু'জনেরই সাধারণ শত্রু সঞ্জয়কে সরিয়ে ফেলার মতলবে গোপনভাবে সিদ্ধান্ত নিল।

সঞ্জয় চাকরি করতো গোপাল ডাক্তার রোডের মাদার প্লেট নামে এক কোম্পানীতে। সে তার চাকরিস্থল থেকে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ ফিরছিল। নুরুশ, টোটন ও তাদের অন্য ক'জন সঙ্গী সঞ্জয়কে রামকমল স্ট্রিটের ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের সামনে ঘিরে ধরে পলক পড়ার আগেই নুরুশ আর টোটন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পেটে ছুরি চালিয়ে দিল। "দাদা" সঞ্জয় নুরুশদের এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই কোনরকম প্রতিরোধ করার আগেই ছুরির লকলকে ফলা তার সারা শরীরে ছোবল মেরে মেরে তাকে নিশ্চল করে রামকমল স্ট্রিটের ওপর রাস্তায় শুইয়ে দিল। নুরুশরা রামকমল স্ট্রিট ছাড়ার আগে সঞ্জয়ের পড়ে থাকা শরীর লক্ষ্য করে বোমা মেরে চলে গেল।

টোটন এর আগেই লক্ষ্মী বসুর এন এল সি সিতে ঢুকে পড়েছিল এবং এন এল সি সির হয়ে ডক অঞ্চলে মস্তানী করতো। নুরুশও রাজনৈতিক আশ্রয় নিল এবং রাম পিয়ারী রামের হয়ে ইনটাকের মস্তান কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করলো। এন এল সি সির তখন রমরমা বাজার। শ্রমিক ইউনিয়নের বদলে মস্তান ইউনিয়ন হিসাবে তাঁদের পরিচিতি বেশি। আর তাদের রুখবার জন্য ইনটাকের দরকার হয়ে পড়লো পাল্টা মস্তান শক্তি। ডক অঞ্চলে শুরু হলো টোটন বনাম নুরুশের লড়াই। ইতিমধ্যে বাহাত্তর সালে নুরুশ বিয়ে করলো।

নুরুশ এদিকে ডক অঞ্চলের চায়ের গুদামগুলিতে মস্তানী করে তোলা তুলতে শুরু করেছে। সেটাই তার একমাত্র আয়। টোটন বা পিছিয়ে থাকবে কেন? সেও তোলা তুলতে নেমে পড়লো। তোলা তোলার প্রতিযোগিতায় নুরুশের থেকে পিছিয়ে যাওয়াতে সেটা টোটন সহ্য করতে পারলো না। সে একদিন রতনকে সঙ্গে নিয়ে নুরুশকে রিভলবার নিয়ে বি এন আরে তাড়া করলো, এবং নুরুশকে লক্ষ্য করে গুলি করলো, কিন্তু নুরুশের শরীরে সেই গুলি লাগলো না। সে পালালো। নুরুশ বেঁচে গেল এবং সে সোজা চলে গেল তার পুরানো নকশাল বন্ধু এবং বর্তমানে "কংশাল" কালা সাহার কাছে। কালা তখন ইনটাকের নেতা শিয়ালদহের প্রদীপ ঘোষের আশ্রয়ে। এই কালা সাহার থেকে বেলেঘাটার কংগ্রেস নেতা প্রদীপ সরকারের বাড়ি থেকে লুঠ হওয়া রাইফেল উদ্ধার করেছিলাম। সেই কালার কাছে এসে নুরুশ এন এল সি সির টোটোনের "উদ্ধ্যত অপরাধের" জবাব দেওয়ার জন্য সাহায্য চাইলো। কালা ও নুরুশ সারারাত ধরে তাদের অন্ধকার পথে প্রচুর পরিমাণ সকেট বোমা ও রিভলবার, পিস্তল জোগাড় করে পরদিন সকাল সাতটার সময় সঙ্গে উড়িয়া গোপাল ও আরও ক'জনকে নিয়ে হেমচন্দ্র স্ট্রিটে টোটনের দোতালা বাড়িতে হানা দিল। বাড়ির সদর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই টোটনের বাবা চিৎকার করে বলে উঠলেন, "টোটন বাড়ি নেই।" নুরুশ অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে দেখলো, টোটনের মা একতলায় তাদের রান্নাঘরে জলখাবার বানাচ্ছে। সে টোটনকে না পেয়ে এতই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল যে রান্নাঘরে ঢুকে টোটনের মা-র চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বাইরে এনে ফেলে দিল।

টোটনের মাকে চূড়ান্ত অপমান করে নুরুশরা টোটনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে উন্মত্ত নুরুশ রাগে গজরাতে গজরাতে চিৎকার করে বললো, "মার, শালার বাড়ি উড়িয়ে দে।" সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো টোটনের বাড়ি লক্ষ্য করে "সকেট বোমা" বর্ষণ। সকালবেলার খিদিরপুর সকেট বোমার আওয়াজে কেঁপে উঠে দিন শুরুর বার্তা গ্রহণ করলো। টোটনের বাড়ির নীচে সে সময় কলকাতা কর্পোরেশনের এক ঝাড়ুদার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করছিল। নুরুশদের ছোঁড়া একটা সকেট বোমা তার পিঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর্তনাদ করে রাস্তায় পড়ে গেল। তার আর্তনাদ সকেট বোমার আওয়াজে চাপা পড়ে বেশিদূর গেলো না। সকেট বোমার ধোঁয়া সরে গেলে দেখাগেল ঝাড়ুদার তার শরীরের রক্তের নদীতে ভেসে যাচ্ছে। তার পিঠ ও কোমরের পুরো অংশ শরীর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে এদিক ওদিক ছিটকে রাস্তায় ও টোটনদের বাড়ির দেওয়ালে আটকে আছে। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, সকেট বোমা তার শরীরের পেছনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণের চিহ্ন ধোঁয়ার সঙ্গে উড়ে গেছে।

টোটনের "গুরুর" তৈরী করা দল ট্যারা বাপির নেতৃত্বে আরও ক'টা সকেট বোমা নুরুশের পড়ে থাকা শরীরের উপর ছুঁড়ে দৌড়ে পালালো। নুরুশ ছিন্নছিন্ন হয়ে শুয়ে রইলো তার মটরবাইকের পাশে। মটরবাইকের ইঞ্জিন তখনও চললেও, তার ইনি্ঞ্জন চলছে কি না বোঝা যাচ্ছে না, সে পড়ে আছে কালা সাহা বানানো সমঝোতার প্রতীক হিসাবে তারই হাতে করে টোটনকে দেওয়া সকেট বোমার আঘাতে। কেউ সাহস করে এগিয়ে গিয়ে দেখছে না নুরুশ কি অবস্থায় আছে। মিনিট দশেক পর তার দলের ছেলেরা তাকে তুলে নিয়ে গেল কলকাতা মেডিক্যাল হসপিটালে। বেকার তাদের প্রচেষ্টা। পরিণতি তার আগেই যা হবার হয়ে গেছে, যা বেশির ভাগ সমাজবিরোধীর জীবনে নেমে আসে, এক সমাজবিরোধীর হাতে অন্য সমাজবিরোধীর মৃত্যু!

ওয়াটগঞ্জ থানা নুরুশের খুনিদের গ্রেফতার করে আদালতে চার্জসিট দেওয়ার পর থানার তখনকার ওসি পি. কে. লাহিড়ী দেখলেন, আদালতে আসামীদের উকিল সাহেব পেশ করলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিষ্ণুপুর থানার একটি সার্টিফিকেট, যাতে লেখা আছে, টোটনরা নুরুশ খুনের আগের দিন রাতের থেকে বিষ্ণুপুর থানার লকআপে একটা চুরির মামলায় বন্দ আছে। আদালত আসামীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

বোঝা গেল, টোটনের গুরু টোটনকে যে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, "বাকি কাজ আমার।" সেটা বিষ্ণুপুর থানার লকাপে গিয়ে শেষ হয়েছে। এটা আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতা, কিছু পুলিশ অফিসার ও সমাজবিরোধী আঁতাতের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

নুরুশের মৃত্যুর পর টোটনও বেশি দিন বাঁচেনি। সে মদ খেয়ে খেয়ে গুরুবিদায়ের ক'দিন পর পৃথিবীর থেকে বিদায় নিল, যে পৃথিবীতে তারা এসেছিল শুধু সাধারণ মানুষের ঘুম কেড়ে নিতে।

ঘুম কাড়া অপরাধী শুধু কলকাতাতেই জন্মায়নি কলকাতার আশেপাশের জেলাগুলোতে তাদের বিচরন আরও অবাধ। তারা অনেক সময় কলকাতায় অপরাধ করে চলে যায় নিজেদের জেলাগুলোতে। আবার সেইসব জায়গায় অপরাধ করে চলে আসে তাদের হৃদয়ের কলকাতার বন্ধুদের আস্তানায়। তাছাড়া ফুর্তির বাজার তো কলকাতাতেই। ফুর্তির টানে তাই আসতেই হয় কলকাতাতে। সেই ফুর্তির টানে কাঁকিনাড়ার বাবু মিত্র তার সঙ্গী তোতলা সুবলকে নিয়ে আসলো কলকাতায়। সুবল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। একদিকে দেহরক্ষী, অন্যদিকে যোগাযোগ, তথ্য, গোপন লেনদেনের সমস্ত মন্ত্রনালয় সেই সামলায়। আশির দশক শুরুর আগে থেকেই কাঁকিনাড়ার লোকজনের কাছে বাবু মিত্র পরিচিত হয়ে যায়। সে তার দলের অন্তা, যোগীন্দার সিং, বাদল বিশ্বাস, জাহিরা, জলিলদের নিয়ে তার খাস জমিদারী তালুকে

"খাজনা" তুলে বেড়ায়। তার জমিদারী কাঁকিনাড়া থেকে বেলঘড়িয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাকে "খাজনা" দিতে হয় কাঁকিনাড়া বাজারের দোকানদারদের, সাট্টার বুকিদের, ওয়াগন ব্রেকারদের, ব্যাটারী ও অন্যান্য কারখানার মালিকদের এবং আসেপাশের সব ইটভাটার লোকেদের। তাছাড়া তার রোজগারের অন্য পথ ছিল ছোটখাট ডাকাতি। সেই ডাকাতি ও "খাজনা" তোলার জন্য সে বসিরহাটের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর গজানন গুপ্তের মাধ্যমে পেয়েছিল ষ্টেনগান, কার্ববাইনের মতো আগ্নেয়াস্ত্র। অন্য সূত্রে যোগড় করেছিল, "বাংলাদেশ যুদ্ধের" সময় লুঠ হওয়া তিনটি পাকিস্থানি রাইফেল, বিদেশী গ্রেনেড ও প্রয়োজনীয় কয়েক বস্তা বুলেট। দেহরক্ষীর কাছে থাকতো পয়েন্ট ফোর ফাইভ রিভলবার। কার কত "খাজনা" তাকে দিতে হবে তার "খাস তালুকে" থাকতে গেলে সে তা "বেঁধে" দিয়েছিল। সকালবেলা সে বাজারের সামনে একটা চায়ের দোকানে তার "অফিসে" বসতো। দিন তারিখ অনুযায়ী বেশিরভাগ খাজনা সেখানেই এসে পৌঁছে যেত। সকালে সাধারণ অফিস যাত্রীরা তার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে সেলাম ঠুকে যেত। কেউ সেলাম না দিলেই সে ভ্রু কুচকে সঙ্গীদের ইশারা করে দিত। সঙ্গীরা সন্ধ্যেবেলায় সেই আফিস ফেরৎ লোকটাকে ধরে "তার হিসাব চুক্তি" করে দিত যাতে আর "ভুল" না হয়। পরে একসময় এমন হলো যে প্রত্যেক মানুষেই ওই চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাতায়াত করার সময় অজান্তেই নমষ্কার করতো। যেন কোনও মন্দিরের সামনে দিয়ে তারা হাঁটছে, তাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ভক্তি প্রদর্শন করে যাওয়া।

"খাজনা" আদায় করে সে সুবলকে নিয়ে চলে যেত ফুর্তির সন্ধানে। পকেটে ফোকটের টাকা, মনে ফুর্তির জোয়ারতো আসবেই। বাবু মিত্রের ফুর্তির জোগানদারী দালাল ছিল অনেক। তারাই সব বন্দোবস্ত করে সুবলকে জানিয়ে দিত। সুবল ঠিক সময়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বাবু মিত্রকে নিয়ে পৌঁছে যেত নির্দিষ্ট জায়গায়। বেশির ভাগ দিন কলকাতাতেই আসতো। সে দিনও এসেছিল কলকাতার সদর স্ট্রিটের এক হোটেলে। সন্ধ্যেবেলা হেটেলের ঘর ভাড়া করে বাবু মিত্র মদ খাওয়া শুরু করলো। সুবল নিয়ে আসবে ফূর্তির জন্য এক নারী। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সুবল নিয়ে আসলো তাদের রাতের সঙ্গীকে। সুবল দেরি না করে পটাপট কয়েক পেগ মদ ঢেলে দিল পেটে। নারী সঙ্গ তারা দারুণভাবে অভ্যস্থ। তাদের কোনও তাড়াহুড়ো নেই। হঠাৎ বাবুমিত্র মহিলাকে দেখিয়ে সুবলকে জিজ্ঞসা করলো, "এঁকে কতো দিতে হবে?" সুবল উত্তরে জানালো, "পাঁচশো টাকা।" বাবুমিত্র এবার মহিলার দিকে তাকিয়ে মুখ বেকিয়ে বলে উঠলো, "এই খানকির পাঁচশো টাকা?"মহিলা তার প্রতি বাবু মিত্রের তাচ্ছিল্যভাব দেখে রেগে গিয়ে বললো, খানকির ছেলে না হলে কেউ খানকির কাছে আসে না!" মহিলার মন্তব্যে আঁতে ঘা পড়লো দুই মাতালের!

তাদের আত্মসম্মান, মর্য্যাদা নিয়ে টানাটানি করছে কি না এক "রাস্তার মেয়েছেলে" যাকে দেখে কাঁকিনাড়ার লোকেরা ঈশ্বরের মতো ভক্তি করে, তাকে হজম করতে হবে এত বড় অপমান। না, এ সহ্য করা যায় না। বাবু মিত্র রাগে মদের গ্লাস ছুঁড়ে মারার সঙ্গে সঙ্গে সুবল তার কোমরে গুজে রাখা রিভলবার এক টানে বার করে মহিলার দিকে তাক করে চালিয়ে দিল পরপর দু'টো গুলি। একটা আর্তনাদ। মহিলা লুটিয়ে পড়লো হোটেলের খাটে। গুলি তার বুকে লেগে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে প্রাণশক্তি নিয়ে।

সে সময় হোটেলের সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল সদ্য আমাদের গোয়েন্দা দফতর থেকে পার্কস্ট্রিট থানায় বদলি হওয়া হেড কনস্টবল জগদীশ। সে হোটেল থেকে গুলির আওয়াজ ও আর্তনাদ শুনতে পেয়ে সোজা ছুটে ঢুকে যায় হোটেলে, তারপর যেদিক থেকে সে শুনেছে গুলির শব্দ সেদিকে যায়। ঠিক সেই সময় বাবু মিত্র ও সুবল হেটেলের ঘর খুলে বেরিয়ে আসতে যায়। জগদীশ সেখানে গিয়ে খাটের ওপর রক্তাক্ত মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে হোটেলের লোকেরা ছুটে আসে এবং তাদের সাহায্যে জগদীশ ধরে ফেলে বাবুমিত্র ও তোতলা সুবলকে।

পার্কস্ট্রিট থানায় খবর যায়। থানা থেকে ভ্যান নিয়ে আসে অন্য অফিসার ও কনস্টবলেরা। ওই দু'জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় থানায়। খুনের মামলায় দু'জনেরই যাবজ্জীবন সাজা হয়ে যায়।

বাবু মিত্র জেলে ঢুকে গেলে আরেক জনের জীবনে আসলো পৌষ মাস। তার নাম বাবু কুন্ডু। বাবু কুন্ডুর বাড়ি ছিল কৃষ্ণনগরে। গরীব ঘরের ছেলে। চেহারার মধ্যে কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট নেই। ফর্সা, রোগা, বেঁটেখাঁটো ছেলে বাবু কুন্ডু। সে জীবিকার সন্ধানে কৃষ্ণনগর ছেড়ে কাঁকিনাড়াতে তার মাসির বাড়িতে এসে উঠলো। তারপর এঁকে ওকে ধরে কাঁকিনাড়া বাজারের ভেতর চালের দোকানের সারিতে একটা জায়গা জোগাড় করে, একটা চালের দোকান খুলে বসলো। চাল বিক্রি করতে করতে তার পরিচয় হল বাবুমিত্র ও তার দলের ছেলেদের সঙ্গে। বাবু কুন্ডুর বাবু মিত্রকে ভাল লেগে গেল। সে তার একেবারে একনিষ্ঠ শিষ্য হয়ে গেল। সে চালের দোকান বন্ধ করে সোজা চলে আসতো তার কাছে, তারপর সে বাবু মিত্রের কাছে বসে তার কর্মকান্ডের গল্প শুনে রোমাঞ্চিত হত। আর গল্প শোনার ফাঁকে ফাঁকে সে বাবু মিত্রের ফাই ফরমাস খাটতো। আর ফাইফরমাস খাটার মধ্যে সে স্বপ্ন দেখতো সেও একদিন বাবু মিত্রের মতো দিন গড়বে। সে তাই বাবু মিত্রের আঁটঘাঁট, কৌশল, আস্তানা, বাইরের বন্ধুবান্ধব, সোর্স চিনতে বুঝতে লাগলো। আস্তে আস্তে সে বাবু মিত্রের এত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল যে বাবু মিত্র তাকে অনেক কাজ দিতে শুরু করলো।

দলের যে সব ছেলে ধরা পড়তো বাবু মিত্রের হয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতো। সে মিত্রের এত বিশ্বস্ত হয়ে উঠলো যে কোথায় কোন অস্ত্র আছে তা কুন্ডুর গোচরে চলে আসলো। এবং মিত্রের দলের সঙ্গে কয়েকটা ছিনতাই, রাহাজানিতেও সে অংশ নিল। তার প্রখর বুদ্ধি, মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কথা বলার ধরন দেখে বাবু মিত্র তার দলের অন্য ছেলেদের থেকে আলাদাভাবে দেখতে লাগলো। এবং বাবু মিত্রের অনুপস্থিতিতে কোন সমস্যা দেখা দিলে কুন্ডুই সামাল দিতো। এইভাবে সে মিত্রের ছেলেদের কাছে দ্বিতীয় নেতা হয়ে গেল। এই নেতা হওয়ার পথ তার আরও মসৃণ হয়েছিল কারণ সে সি পি আই (এম) পার্টির হয়ে কাজ করতো এবং তাদের হয়ে মারপিট করতো। শাসক পার্টির ছত্রছায়ায় থেকে দুষ্কর্ম চালাতে পারলে যে অনেক অনেক সুবিধা হয়, তা দুধের বাচ্চাও বোঝে তো বাবুমিত্রের লোকেরা বুঝবে না?

বাবু মিত্র জেলে চলে গেলে দলের নেতা হয়ে গেল বাবু কুন্ডু। বাবু মিত্রও তার দলের অন্য ছেলেদের বলে দিলো কুন্ডুকেই মানতে। অন্যদিকে কুন্ডু জেলে মিত্রের সঙ্গে সঙ্গে দেখা করে রফা করে এলো যে, যেখান যেখান থেকে সে তোলা তুলবে তার একটা বড় অংশ সে মিত্রের জন্য জমা রাখবে এবং সে মিত্রের কথা মত সেই টাকা যথাস্থানে পৌঁছে দেবে।

বাবু কুন্ডু যখন বাবু মিত্রের হয়ে তোলা আদায় করতে শুরু করলো কাঁকিনাড়া বাজারে, বিভিন্ন কারখানায় ও ইটভাটাগুলোতে, তখন ঝামেলা লাগলো আরেক মস্তান নাসির খানের সঙ্গে। এবং সেই ঝামেলা অবধারিত রূপে সংকটের চেহারা নিল। যখন তখন বোমাযুদ্ধের মোকাবিলা করতে হতো দু'পক্ষকেই। একদিন তেমনই এক সংঘর্ষে কুণ্ডুর দলের ছেলে রাণাঘাটের বরেন নাসির খানের হাতে খুন হয়ে গেল। খুনের পরে জগদ্দল থানা থেকে বিভিন্ন জায়গায় হানা দিতে কুন্ডুর কিছু আগ্নেয়াস্ত্র পুলিশের হাতে চলে গেল। তাতে কুন্ডু দমলো না, সে শক্ত হাতে দল পরিচালনা করতে লাগলো। ইতিমধ্যে সে দু'একটা ছোট ডাকাতিও করে ফেলেছে। কিন্তু কোনটাই তার মনপূতঃ হয়নি। সে তাই একটা বড় ডাকাতির পরিকল্পনা করলো। সেই ডাকাতির পরিকল্পনা অনুযায়ী সে শ্রীরামপুরের ওদিক থেকে একটা গাড়ি ছিনতাই করে নিয়ে এসে নিজেদের গোপন জায়গায় রাখলো। জাহিরা গাড়ি চালাতে পারতো, তাই জাহিরার ওপরেই গাড়ির দেখাশুনার ভার দিল। দু'দিন পর ডাকাতি, তাই গাড়ি লুকিয়ে রাখার কাজটা ভালভাবে করতে হবে। জাহিরা গাড়িটা রেখে চলে গেল এক জুয়ার আড্ডায়। শুরু করলো জুয়া খেলতে, তাস তার জমছে না। হারতে শুরু করলো, হারতে হারতে পকেটে যা টাকা ছিল সবশেষ হয়ে গেল। সে জুয়ার বোর্ড ছেড়ে চলে গেল না। জুয়াড়ীদের যা হয়, একবার হেরে গেল আরও খেলে হারানো টাকা উদ্ধার করার জন্য যা আছে তাই-ই বাজিতে লাগিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রচন্ড নেশা হয়ে যায়। জাহিরা পকেটে হাত দিয়ে যখন দেখলো ছিনতাই করা গাড়ির চাবিটা ছাড়া আর কিছু নেই সে তখন সেই গাড়িটাই অন্য জুয়াড়ীদের কাছে পাঁচ হাজার টাকায় বন্ধক দিয়ে আবার খেলতে শুরু করলো। এবং পুরো টাকাটাই হারলো। যার কাছে জাহিরা গাড়ি বন্ধক রেখেছিল সে চাবি নিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল গাড়ির পুরানো যন্ত্রাংশ বিক্রির বাজারে, সেখানে গাড়ি গেলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার শরীরের সবকিছু খাবলে খাবলে খুলে পুরো নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

জাহিরা যে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে ছিনতাই করে আনা গাড়িটা বন্দক দিয়ে টাকা নিয়ে জুয়াতে সেই টাকা ও গাড়ি বেহাত করে দিয়েছে সেই খবর যায় কুন্ডুর কাছে। খবর পেয়ে কুন্ডু রাগে গজরাতে থাকে। ভেবে পায় না কী করে ডাকাতি করবে। অন্যদিকে তার এখনই কিছু রিভলবার, পিস্তল, বোমার মশলা কেনার দরকার, জগদ্দল থানা বেশ কিছু তলল্লাশি করে নিয়ে গেছে।

বন্ধক দেওয়ার পরের দিন সন্ধ্যেবেলা কুন্ডু নিজের বাড়িতে জাহিরাকে ডেকে পাঠালো। তারপর একটা ঘরে অন্তা, বাদল, জলিল, জাহিরা ও নিজে ডাকাতির নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। সঙ্গে খেতে লাগলো দেশি বাংলা মদ ও আলুর দম। দু'বোতল মদ শেষ হয়ে গেল। আরও আছে, আরও চলবে। হঠাৎ কুন্ডু বলে উঠলো, "আমার মাথায় একটা প্ল্যান অনেকদিন ধরে ঘুরছে, চল আজই সেটা করি।" জলিল জানতে চাইলো, "কী প্ল্যান?" কুন্ডু হেসে উঠে জানালো, "ডাকাতির। একটা বাড়িতে ভাল মাল পাওয়া যাবে, সব খবর নিয়ে রেখেছি। "জলিল বলে উঠলো," তবে আর দেরি কেন? করে ফেলি।" একটা খাটের ওপর বসে ছিল কুন্ডু, সে ঝট করে খাট থেকে নেমে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বললো, "হ্যাঁ, চল, আজ রাতেই অপারেশনটা করি।" খাট থেকে নেমেই নিজের আলনার থেকে একটা লুঙ্গি নিয়ে নিজে পরে নিল। আর একটা লুঙ্গি জাহিরাকে দিয়ে বললো, "জামা প্যান্ট খুলে এটা পরে নে।" জাহিরা গাড়ি বেহাত করে দিতে এমনিতেই দলের কাছে লজ্জিত ছিল। সে কোনও কথা না বলে জামা প্যান্ট খুলে শুধু লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে নিল। অন্যেরা সবাই লুঙ্গি পরে আছে। তারা জানে, গ্রামের দিকে ডাকাতি করার সময় লুঙ্গির সাজই সবচেয়ে ভাল কারণ গ্রামের পথে হেঁটে যাওয়ার সময় কেউ দেখে নিলে অন্য কোনও রকম সন্দেহ করবে না। ভাববে গ্রামেরই লোক।

কুন্ডু চট করে একটা ক্ষুর বার করে সেটা তার পিঠের দিকে কোমরে গুজে নিল। তারপর জাহিরার জামাপ্যান্ট সব আলনায় তুলে রাখলো। এমন সময় কুন্ডুর বাড়ির কাছের এক ক্ষৌরকার ঘরের দরজা ঠেলে উঁকি মারতে তাকে কুন্ডু প্রশ্ন করলো,

"কী ব্যাপার নিত্যদা?" নিত্য কুন্ডুকে বললো, "তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।" কুন্ডু দরজার সামনে এগিয়ে গেল নিত্যর কথা শোনার জন্য। কুন্ডু সামনে যেতে নিত্য তাকে ফিসফিসিয়ে বললো, "জাহিরার জামা, প্যান্ট, জুতো আমি নেবো।" কুন্ডু দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, "এখন যাও নিত্যদা, সকালে এসো।" নিত্য চলে যেতে কুন্ডু খাটের তলা থেকে দু'টো কিট ব্যাগ বার করলো। একটা দিল জলিলকে, একটা রাখলো নিজে। সবাই জানে কিট ব্যাগগুলোর মধ্যে তাদের অস্ত্রশস্ত্র আছে। ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে এগুলো কিটব্যাগ খুলে হাতে হাতে নিয়ে নেবে।

রাত দশটা নাগাদ সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। কুন্ডুর নির্দেশে চলছে। আশ্বিন মাস, বর্ষা শেষ হয়েছে। পথঘাটের অবস্থা খুবই কাহিল। তারা প্রথমে যাবে কাঁকিনাড়া ইটভাটার কাছে পাট বনে। সেখানে ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে আরেক প্রস্থ মদ খাওয়া হবে। জাহিরার হাতে তাই আরও দু'টো মদের বোতল একটা প্লাস্টিক থলিতে বেশ কটা মাটির ভাঁড়, যেগুলো পাটবনে মদ খাওয়ার গ্লাসের কাজ করবে। সারি করে চলেছে। সবার পেছনে অনেকটা ব্যবধান রেখে হেঁটে আসছে অন্তা, তার হাতে একটা কোদাল। প্রায় আধ ঘণ্টা হাঁটার পর কুন্ডু পাঠক্ষেতের আলের পাশে একটা ছোট মাঠে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার খুব জোরালো নয়, খুব সম্ভবত পূর্ণিমা ক'দিন আগেই হয়ে গেছে, তারই রেশ এখনও পাটক্ষেতের ওপর ছড়িয়ে আছে। অল্প আলোয় তাই দেখা যাচ্ছে হাওয়ায় হাওয়ায় পাট গাছের মৃদু মৃদু দোলন। মাঝে মাঝে পাটক্ষেতের জমা জলের ভেতর থেকে ব্যাঙের ডাক ও ঝিঁঝির ক্রমাগত গান বাংলার গ্রামের বর্ষা শেষের রূপ ও পরিবেশ মূর্চ্ছনার এক প্রতীক হয়ে বিরাজ করছে।

অন্তা ছাড়া দলের বাকি সবাই কুন্ডুর কাছে এলে কুন্ডু বললো, "এখানে একটু বোস।" কুন্ডু তার হাতের কিট ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে বসে পড়লো। তারপর একে একে জলিল, রঞ্জন, যোগীন্দর, জাহিরা, বাদল গোল হয়ে বসলে কুন্ডু জাহিরাকে বললো, "মাল ঢাল।" জাহিরার পেছন দিকে বসেছে বাদল। জলিল জাহিরার পাশে। জলিল জাহির হাত থেকে বোতল নিয়ে ভাঁড়ে ঢলে ঢেলে সবাইকে দিতে লাগলো। অনতা ছোট মাঠের একপাশে কোদালটা রেখে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। মাঠের পাশে কাশগাছের সাদা বাগানের মধ্যে কোদালটা শুয়ে রইলো আকাশের দিকে তাকিয়ে।

দু'ভাড় করে মদ পেটে যাওয়ার পর জাহিরা কুণ্ডুর কাছে জানতে চাইলো, "বাবু, অপারেশনটা কোথায় হবে? কুণ্ডু দূরে ইটভাটার দিকে একটা বাড়ি দেখিয়ে বললো, "ওই বাড়িতে।" তারপর আবার চুপ।

রাত এগারোটা বেজে গেছে। মদও প্রায় শেষ। জাহিরার কেমন সন্দেহ হলো।

কুন্ডু বা অন্য কেউ ডাকাতি নিয়ে কোনও কথাই বলছে না। কীভাবে যাওয়া হবে, বা কে আগে যাবে, কার হাতে কী থাকবে, এসব নিয়ে কেউ আলোচনা করছে না। তাছাড়া ওই বাড়িতে কটা ঘর, ঘরে ক'জন লোক থাকে। তারমধ্যে ক'জন মহিলা, ক'জন পুরুষ, ঘরে কোথায় টাকা, সোনাদানা আছে তাও কেউ কুন্ডুর কাছে জানতে চাইছে না। অথচ ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে এসব জানা একান্ত জরুরী। সবাই যেন কেমন গুম মেরে আছে, কুন্ডুর বাড়িতে সে আসার আগেই সবাই বসেছিল। কথাবার্তা বলছিল, তাকে দেখেই সবাই চট করে চুপ করে যায়। একমাত্র বাবু কুন্ডুই তার সঙ্গে যা কিছু কথা বলেছে।

জাহিরা বাবুকুন্ডুকে ভালই চেনে, সে যখন তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। সন্দেহ যখন একবার জাহিরার মনে ঢুকেছে, সে আর কুন্ডুর হাতের পুতুল হয়ে থাকতে চাইলো না। সে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে পেছনে বসা বাদলকে টপকে গন্ডি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কুন্ডু দেখলো বাদল জাহিরাকে কিছু না বলে ছেড়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কুন্ডু জাহিরাকে ধরবার জন্য এক লাফ দিল। জাহিরাও প্রস্তুত ছিল, সে বুঝে নিয়েছে, তাকে খুন করার ছক কসেই কুন্ডু এখানে নিয়ে এসেছে। সে দেখে নিয়েছিল তাকে আড়াল করে কুন্ডু একটা ক্ষুর কোমরের পেছন দিকে গুঁজে নিয়েছে। কুন্ডু লাফ দিয়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে জাহিরা কুন্ডুর পিঠের দিকে হাত দিয়ে ক্ষুরটা বার করে নিয়ে ছিটকে সরে গিয়ে সেটা খুলে এলোপাতাড়ি চালাতে লাগলো। জাহিরা যে তার পরিকল্পনাটা শেষ মূহুর্তে বুঝে হঠাৎ ওকেই আক্রমণ করে বসবে, সেটা কুন্ডু বুঝতে পারেনি। সে থতমত খেয়ে পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে জাহিরাকে মারতে গেল। জাহিরা তখন যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই ক্ষুর দিয়ে চিরে দিচ্ছে। বাদল, জলিল, কুন্ডুকে ক্ষুর মেরে কেটে জাহিরা ইটভাটার দিকে দৌঁড়াল। কুন্ডুদের তখন কারও হাত কেটে গেছে, কারও পিঠ, কারও বুক। তারা আর জাহিরার পিছনে না দৌঁড়ে নিজেদের আস্তানার দিকে দৌড়াল।

জাহিরার শরীরেরও বহু জায়গায় কেটে ছিঁড়ে গেছে। সে ইটভাটা অঞ্চলে গিয়ে বাবুকুন্ডুর পরম শত্রু নাসির খানের সঙ্গে সেই রাতেই যোগাযোগ করলো। নাসির পরম আদরে জাহিরাকে নিজের দলে নিয়ে তাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিল।

জাহিরার এলোপাথাড়ি ক্ষুর চালানোতে কুন্ডুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটে তাদের ডেরায় এসে দেখলো, তারা তাদের অস্ত্রগুলো পাটক্ষেতে ফেলে এসেছে। অন্তত ফেলে এসেছে কোদাল, যা দিয়ে জাহিরাকে খুন করার পর মাটি খুঁড়ে সেখানে জাহিরাকে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য নেওয়া হয়েছিল। কুন্ডু দেখলো, একমাত্র যোগীন্দার ছাড়া সবারই কিছু না কিছু চোট আঘাত হয়েছে। সে যোগীন্দারকে পাঠক্ষেতে পাঠাল কিট ব্যাগ দু'টো ও কোদালটা নিয়ে আসতে। যোগীন্দার যখন কিট ব্যাগ ও

কোদাল নিয়ে ফিরলো তখন রাত দুটো। দেখলো, কুন্তু হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে শুয়ে আছে তার খাটে, জলিল ছাড়া অন্যেরা সবাই চলে গেছে।

কুন্তু এবার তোলা আদায়ে আরও নির্মম হয়ে গেল। বাবুমিত্রের নির্ধারিত মাসকাবারী প্রত্যেকের কাছে আরও বাড়িয়ে দিল এবং তোলা আদায় করে বেশি টাকা সে আত্মসাৎ করতে লাগলো।

অন্তা ছিল বাবু মিত্রের আপনজন। সে জেলে গিয়ে মিত্রকে কুন্তুর সব খবরাখবর দিয়ে আসতো। কার থেকে কত তোলা আদায় করছে অথচ মিত্রকে আদায় কম দেখাচ্ছে যাতে ভাগ কম দিতে হয় তার বিস্তারিত বিবরণ অন্তা, মিত্রকে জানিয়ে আসতো। তোলা আদায়ের টাকা থেকে কুন্তু কৃষ্ণনগরে নিজের বাড়ি বানাচ্ছে সেই খবরও মিত্র অন্তা মারফৎ পেয়ে গেল। কুন্তু মিত্রের সঙ্গে জেলখানায় দেখা করতে গেলে মিত্র কুন্তুর কাছে তার কাজের কৈফিয়ৎ চাইলো। কুন্তু মাথা ঠান্ডা রেখে মিত্রকে বুঝিয়ে চলে আসলো। সে জেনেগেছে কিভাবে মিত্র সব খবর পেয়েছে। কুন্তু কাঁকিনাড়া ফিরে এসে জলিলের সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসে গেল। বৈঠক শেষে জলিল চলে গেলে অন্তার বাড়ি। সেখান থেকে অন্তাকে ডেকে নিয়ে আসলো। আসার সময় দোকান থেকে কিনে আনলো দু'বোতল মদ। কুন্তু অন্তাকে দেখে বললো, "আজ গুরুর সাথে জেলে দেখা করেছি, সে একটা প্ল্যান দিয়েছে, চল আলোচনা করি।" মিত্রের কথা শুনে অন্তা লাফিয়ে উঠে বললো, "কী বলেছে গুরু?" অন্তার চোখ মুখের অভিব্যক্তি দেখে কুন্তু ভেতরে ভেতরে রাগে গিরগির করতে লাগলো। মুখে স্বাভাবিকতা রেখে বললো, "সেই বলবো বলেই তো তোদের ডেকে নিয়ে এসেছি।" কুন্তু যোগীন্দার, জলিল ও অন্তাকে নিয়ে চললো রথতলার দিকে। যেতে যেতে অন্তাকে বললো "জাহিরার ব্যপারটা বড্ড জানাজানি হয়ে গেছে, নাসির ব্যাটা আমাদের পেছনে লেগে গেছে, পুলিশকে তাতাচ্ছে যাতে আমাদের

পুরে দেয়। ও বলেছে, আমাদের জেলে পুরে দিলে সে দ্বিগুণ মাসোহারা পাবে।" অন্তা চুপ করে শুনে যেতে লাগলো।

কাঁকিনাড়ার রথতলাতে একটি পুকুরপাড়ে কুন্তুরা রাত ন'টা নাগাদ বসলো। জলিল বোতল থেকে মদ ঢেলে ঢেলে দিতে লাগলো। চারজন একটা বোতল কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করে দিলো। অন্তা কুন্তুকে প্রশ্ন করলো, "গুরু কী প্ল্যান দিয়েছে?" কুন্তু বললো, "ব্যাঙ্ক ডাকাতির। গুরু বললো, এসব ছোটখাট ডাকাতি করে আর তোলা তুলে বেশি দিন চলবে না। বড় দাঁও মারতে হবে। আমি ক'টা ব্যাঙ্কের খবর নিতে লোক লাগিয়েছি, তোরাও খবর নে, কোন ব্যাঙ্কে কত টাকা থাকে, ক'টা গার্ড থাকে, কোন সময়টা অপারেশন করলে ভাল।" অন্তা বললো, "কিন্তু পরশুদিন আমি যখন গুরুর সঙ্গে জেলে দেখা করলাম তখন তো গুরু এসব

আমায় কিছু বললো না, বরং বললো, এখন সাবধানে থাকবি, যা করছিস সেটাই চালিয়ে যা। দেখলিতো এত করেও আমি জেলে ঢুকে গেলাম।" কুন্ডু অন্তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, "তোকে কী বলবে? তুই কী বুঝবি? দল চালাতে গেলে যে হ্যাঁপা পোয়াতে হয় তাতে গুরুজন তাই আমাকেই বলেছে।" জলিল মদ দিয়েই চলেছে, অন্তাকে বেশি বেশি করে দিচ্ছে। মদের ক্রিয়া সবার মধ্যেই অল্পবিস্তর শুরু হয়ে গেছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দু'বোতল শেষ, আড্ডাও জমে উঠেছে। পুকুরপাড়ের অন্যদিকে অনেকগুলো বাড়ি আছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা বাড়িতে আলো নিভে যাচ্ছে। অর্থাৎ সেইসব বাড়ির লোকজন ঘুমের দেশে যাওয়ার জন্য বিছানায় আশ্রয় নিচ্ছে। দূর থেকে কোনও এক বাড়ি থেকে একটা ছেলে গলা চড়িয়ে স্কুলের পড়া করছিল। তারও আর আওয়াজ আসছে না।

রাত প্রায় এগারোটা। দু'একটা কুকুরের ডাক ছাড়া বিশেষ কোনও সাড়া নেই লোকালয়ের। অন্তা কুন্ডুকে বললো, "চল, এবার যাওয়া যাক।" অন্তার ডান দিকে বসা কুন্ডু মাথা ঝাঁকিয়া জানালো, "যাবে," কুন্ডু অন্ধকারের মধ্যে তার ডান পকেটে রাখা বেখৎখানিক লম্বা ছুরি বার করে মুহূর্তের ভগ্নাংশের সময়ে সেটা ঢুকিয়ে দিলো অন্তার গলায়। অন্তা কাটা মুরগীর মতো ছটফট করে গলা দিয়ে "অ-অ" আওয়াজ বার করতে লাগলো। কুন্ডু দাঁড়িয়ে পড়ে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বলতে লাগলো, "শালা বেইমান, সব খবর জেলে মিত্তিরের কাছে পাচার করা।" আর হাত দিয়ে কুন্ডু ছুরিটা অন্তার গলায় অর্ধ বৃত্তাকারে ঘোরাতে লাগলো। অসহ্য যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে অন্তা পুকুরপাড়ে শুয়ে পড়েছে। গলগল করে রক্ত পড়ে ভেসে যাচ্ছে পুকুর পাড়ের মাটি, নিজের বুক, ছুরি ধরা কুন্ডুর ডানহাতের কবজি। জলিল অন্তার পেটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যাতে অন্তার নিশ্বাস নেওয়ার প্রক্রিয়াটা তাড়াতাড়ি অচল হয়ে যায়। কুন্ডু হাঁটু গেঁড়ে নীচু হয়ে বসে একবার ছুরিটা বার করছে, আবার ঢুকিয়ে দিচ্ছে। যোগীন্দার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। কিছু করছে না। কুন্ডু আর জলিল যে অন্তাকে খুন করার জন্য এখানে নিয়ে এসেছে, সে জানতো না। জানলে সে বাধা দিতো। এখন কিছু করার নেই, অন্তা শেষ, তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। অন্তার সঙ্গে তার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। নেশা যা হয়েছিল তা কেটে গেছে। সে দেখলো, অন্তাকে শেষ করে কুন্ডু উঠে দাঁড়ালো। বললো, "শালা চামচামি। নে এবার কর শালা মিত্রিরের দালালী।" জলিল অন্তার পেট থেকে নেমে ছুটে চলে গেল পুকুরপাড়ের একটা ঝোঁপের দিকে। ঝোপের ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে জলিল নিয়ে আসলো একটা কোদাল আর একটা চটের থলি। তারপর সে পুকুরের একেবারে ধার ঘেঁষে মাটি কোপাতে লাগলো। যোগীন্দার জানে জলিল কী জন্য

গর্ত করছে, সেখানে অন্তা চরিদিনের মতো শুয়ে থাকবে। কোদালের আওয়াজ আর ঝুপঝুপ করে আলগা মাটির জলে পড়ার শব্দ হচ্ছে। কুন্ডু জলের ধারে গিয়ে নিজের রক্তমাখা হাতটা ধুয়ে নিচ্ছে। ছুরিটা আগেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে পুকুরের মাঝখানে। জলিল কোদাল চালানো থামিয়ে যোগীন্দারকে বললো, "তুই কিছুটা কর।" যোগীন্দার এখন কুন্ডু আর জলিলের বিরোধিতা করবে না, কারণ ওরা অন্তাকে খুন করে এত নেশাগ্রস্ত হয়ে আছে যে, বিরোধিতা করলে দু'জন মিলে ওকেও খুন করে দিতে পারে। সে তাই জলিলের থেকে কোদাল নিয়ে গর্ত করতে শুরু করলো। অন্ধকারে কোদাল চালিয়ে যাচ্ছে যোগীন্দার। পুকুরের উল্টোদিক থেকে দু'একটা বাড়ি থেকে অল্প আলোর রশ্মি পুকুরের জলে এসে পড়ছে, যা জলের অল্প অল্প ঢেউতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সেখানেই হারিয়ে যাচ্ছে, যেমন হারিয়ে যাচ্ছে যোগীন্দারের কান্না, টুপটুপ করে অন্তার জন্য তৈরী করা কবরে। যোগীন্দার দেখলো, কুন্ডু চটের থলে থেকে একটা মদের পাঁইট বার করে গলাতে ঢালছে। জলিলও একবার কুন্ডুর হাত থেকে নিয়ে ঢাললো। গর্ত খোঁড়া শেষ। যোগীন্দারের মুখের ঘাম মোছার অছিলায় চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ালো। কুন্ডু বললো, "মালটাকে এবার নামিয়ে দে।" জলিল আর যোগীন্দার কুন্ডুর নির্দেশ মতো অন্তার মৃতদেহটা তুলে এনে নামিয়ে দিলো গর্তে। কুন্ডু চটের থলিটা নিয়ে আসলো গর্তের কাছে। তারপর অন্তার পেটের ওপর থেকে রক্তেভেজা জামাটা সরিয়ে দিয়ে পাশে পড়ে থাকা কোদাল তুলে অন্তা পেটে মারলো এক কোপ। কোদালের অর্ধেকটা ঢুকে গেল অন্তার পেটে। কুন্ডু কোদলটা তুলে নিয়ে চটের থলিতে রাখা নুন ঢুকিয়ে দিল অন্তার পেটে। যাতে অন্তার দেহটা তাড়াতাড়ি পচে গলে যায়। নুন ঢোকানো হয়ে গেলে জলিল দ্রুত হাতে কোদাল দিয়ে টেনে টেনে মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিল গর্ত। অন্তা চিরতরের জন্য রথতলার পুকুর পাড়ে হারিয়ে গেল।

রাত বারটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। নিঃশব্দে কোদাল, চটের থলি নিয়ে ওরা ফিরে এলো কণ্ডুর বাড়ি। কুণ্ডু, জলিল যোগীন্দাররা এ ব্যাপারে অভ্যস্ত। এভাবে তারা বহু মানুষকে খুন করে বিভিন্ন জায়গায় পুঁতে দিয়েছে। কিন্তু আজ যোগীন্দারের খারাপ লাগলো, কারণ দলের এক সঙ্গীকে যে কুণ্ডু একইভাবে খুন করবে তা ভাবতে পারেনি। ক'দিন আগে জাহিরাকেও পাটক্ষেতে পুঁতে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। আর সেদিন অন্তাই বহে নিয়ে গিয়েছিল গর্ত খোঁড়ার জন্য কোদালটা। আর আজ সেই কোদালের গর্তেই সে শুয়ে পড়লো। যোগীন্দারের কিছু ভাল লাগছে না তাই কুণ্ডু আর জলিলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের অস্তোনায় চলে গেল। কিন্তু বিছানায় শুয়ে যোগীন্দারের ঘুম হলো না। ঘুম হলো না, সে শুধু অন্তার কথাই ভাবতে লাগলো। ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠে সে সোজা গেল

কুণ্ডুর কাছে, এবং কুণ্ডুকে বললো, "অন্তাকে যা করা হলো ঠিক হ'লো না। আগে জানলে—।" কুণ্ডু রেগে উঠে বললো, "কী করতিস?" যোগিন্দার বললো, "তোদের এই কাজটা করতে দিতাম না। আর অন্তা কি এমন অপরাধ করেছে যে তাকে তোরা খুন করলি। কুণ্ডু যোগীন্দারের রাগত চেহারা দেখে চুপ করে গেল, যোগীন্দারের দশাসই চেহারার সামনে নিজেকে অসহায় মনে হলো! কুণ্ডু জানে যোগীন্দারের সঙ্গে একা একা মোকাবিলা করতে হলে সে ও জলিল দু'জনেই হেরে যাবে। তাই চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যোগীন্দার কুণ্ডুকে গালাগালি দিয়ে চলে গেল। যোগীন্দারের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে কুণ্ডুর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

যোগীন্দারের মন খারাপ। সে পরের দিন রূপছায়া সিনেমায় ম্যাটিনি শো তে সিনেমা দেখতে গেল। খবর গেল কুণ্ডুর কাছে। সে তার বাজারের এক চেলা বাচ্চা ছেলে বাপি 'বি-ক্লাসকে' সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নিয়ে এসে বললো, "তোকে আজ একটা কাজ করতে হবে। এটা পারলে তোকে আমি পুরোপুরি দলে নিয়ে নেব। তখন তোর সব ভাবনা আমার।" বি-ক্লাস কুণ্ডুর কাছে জানতে চাইলো, কি করতে হবে?" কুণ্ডু এরপর বি-ক্লাসকে তার কাজ বুঝিয়ে দিল।

রূপছায়া সিনেমার ম্যাটিনি সো ভাঙ্গলো। হৈ-চৈ করে দর্শকরা হল থেকে বার হচ্ছে। রিক্সাওয়ালা প্যাঁকপ্যাঁক করে হর্ণ দিয়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তাদের গাড়িতে সওয়ারি হওয়ার জন্য। যোগীন্দার সিং একটু পেছনে একা একা হলের গেট পেরিয়ে আস্তে আস্তে রাস্তায় এসে নিজের বাড়ির পথ ধরবার জন্য এগিয়ে চলেছে। সেই রাস্তার উল্টো দিকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে বাবুকুণ্ডু ও জলিল। তাদের থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা সরু গলির মুখে বি-ক্লাস দু-হাতে দু'টো ঠোঙ্গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যোগীন্দারের কোনও দিকে নজর নেই। সে বি-ক্লাসকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সরু গলির থেকে হাত পনেরো এগিয়ে যেতে বি-ক্লাস একবার দূরে কুণ্ডুর দিকে তাকাল, কুণ্ডু হাত তুলে বি-ক্লাসকে ইশারা করতেই বি-ক্লাস ডান হাতের ঠোঙাটা যোগীন্দারের পিঠ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতেই বিশাল আওয়াজ। যোগীন্দার বি-ক্লাসের ছোঁড়া বোমায় মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেল। রাস্তার লোকজন, সিনেমা ফেরৎ ও ইভনিং শো দেখতে আসা দর্শকরা যে যেদিকে পারলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলো। বি-ক্লাস একটু এগিয়ে গিয়ে পড়ে থাকা যোগীন্দারকে লক্ষ্য করে তার হাতের দ্বিতীয় বোমাটাও ছুঁড়ে মারলো এবং আবার বিকট আওয়াজ। আর সেই আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগে বি-ক্লাস ছুটে পালালো।

অন্যদিকে বি-ক্লাসের নিখুত কাজে কুণ্ডু ও জলিল উৎসাহিত হয়ে দু'জনে

হাসতে হাসতে হাত মিলিয়ে স্থান ত্যাগ করলো। যোগীন্দারের পিঠের থেকে শরীরটা দুটো অংশে ভাগ হয়ে রাস্তায় পড়ে রইলো।

বাবু মিত্রের দু'টো খোদ লোককে খুন করে বাবু কুণ্ডু এবার দলের একচ্ছত্রপতি হয়ে বসলো। সে আর বাবু মিত্রের সঙ্গে জেলে গিয়ে দেখাও করে না, কোনও টাকা পয়সাও দেয় না। সে তোলা তোলার অত্যাচার আরও বাড়িয়ে দিল। তাকে কাঁকিনাড়ার কোনও লোক ভয়ে কিছু বলতে পারে না। জানে পরিণতি হবে খুব খারাপ। কোথায় যে কাকে পাঠিয়ে দেবে তা আগে থেকে কেউ টেরই পাবে না। ইতিমধ্যে ব্যাণ্ডেল থেকে সেন ও বাবুল নামে দু'টো ফেরার খুনের আসামী কুণ্ডুর দলে যোগ দিয়েছে।

ব্যাণ্ডেলের ওয়াগন ব্রেকার বেণুকে খুন করে সেন ও বাবুল ফেরার হয়। খুন হওয়ার দু'দিন আগে বেণু দু'টো বিবাহিত মহিলা ও একটা অল্প বয়সী মেয়েকে রেল লাইনের ধারে ধর্ষন করেছিল। অন্নপূর্ণা সিনেমা থেকে ইভনিং শোতে ছবি দেখে তারা তিনজন তাঁদের বাড়ি ফিরছিলেন। বেণু ও তার দলের ছেলেরা তাঁদের ঘিরে ধরে এবং টানতে টানতে নিয়ে যায় রেললাইনের ধারে এবং তিনজনকে পরপর অনেকে মিলে ধর্ষণ করে। ধর্ষন শেষে বেণুরা তাঁদের ফেলে চলে যায়। তাঁরা কোনমতে ফিরে আসেন তাঁদের ঝাঁপ পুকুরের বাড়িতে। এই খবর ঝাঁপপুকুরে আগুনের মতো ছড়িয়ে যায়। দু'দিন পর সেন, বাবুল ও ঝাঁপপুকুরের ছেলেরা বেণুকে রেললাইনের পাশে ধরে এবং ছুরি, ভোজালী দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করে ফেলে যায়।

ওয়াগন-ব্রেকার দুষ্কৃতী বেনু ধর্ষনের প্রতিশোধের জ্বালায় ঝাঁপপুকুর কলোনির ছেলেদের হাতে খুন হলেও পুলিশ বেনুর হত্যাকারিদের খুঁজতে শুরু করল। খুন খুনই। দুষ্কৃতীদের খুন করলে আইনের চোখে খুনিরা ছাড়া পেয়ে যাবে—তা মূর্খরা ভাবতে পারে, আইনরক্ষকরা নয়। আইনের চোখে সব খুনই সমান। আইন কেউ নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না। তাই ব্যান্ডেল পুলিশের তল্লাশির চোটে নিরঞ্জন ও বাবলু ব্যান্ডেল ছেড়ে পালালো। তারা চলে আসলো কলকাতার চেতলা আর এক দুষ্কৃতী ভীমের কাছে। ভীম তাদের দু'জনকে কিছুদিন লুকিয়ে রেখে পাঠিয়ে দিল কাঁকিনাড়ার বাবু কুন্ডুর কাছে। কুন্ডু তখন অন্তা ও যোগীন্দারকে খুন করার ফলে যে দু'টো জায়গা খালি হয়েছিল সেই জায়গায় নিরঞ্জন ও বাবুল কে নিয়ে নিল। এ যেন ট্রেনের রিজার্ভ বগিতে দু'টি জায়গা খালি হয়েছে, সেখানে অপেক্ষারত দু'জনকে টিকিট চেকার্স জায়গা করে দিল। ইতিমধ্যে বাবু কুন্ডু দলে নিয়েছে একসময়কার গাড়ি চোর রূপলাল সাউ ও খড়দার শিবপ্রসাদকে। এরা সব এক হয়ে শুরু করলো একের পর এক ডাকাতি।

পুরনো ও নতুন ছেলে মিলে যে দলটা হল তা সবাই বাবু কুন্ডুর অধীনেই চলতে লাগলো। নতুন ভাবে দল বিন্যাস করে কুন্ডু প্রথমেই ডাকাতি করলো আমডাঙ্গার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে। তারপর একে একে নৈহাটির ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায় এবং শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়ায় ওই একই ব্যাঙ্কের শাখাগুলোতে।

বাবু কুন্ডুকে তখন পায় কে? পকেটে থাকছে সব সময় গাদা গাদা টাকা। কৃষ্ণনগরে বাড়ি উঠছে। সাফারি চড়িয়ে যখন তখন ফূর্তি করতে চলে যাচ্ছে। চলে আসতো চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর রেড লাইট এরিয়ায়। সেখানে সে রমার ঘরে বসতো এবং টাকা পয়সা উড়িয়ে ফূর্তি করে ফিরে যেতো কাঁকিনাড়ায়। বেলঘরিয়া থেকে কাঁকিনাড়া, জগদ্দল ও তার চারপাশের অঞ্চলে দুষ্কৃতীদের কাছে সেই-ই "আদর্শ" হয়ে উঠেছিল। হবে নাই বা কেন? তারা দেখতো মাঝারি উচ্চতার সাধারণ চেহারার একটা ফর্সা ছেলে কোমরে পয়েন্ট ফোর ফাইভ রিভলবার নিয়ে চত্বর চষে বেড়ায়। কেউ কিছু তাকে বলার সাহস পায় না। যখন যাকে ইচ্ছা মারে, তোলা আদায় করে, খুশি মত তার সামান্য বিরোধীকেও পৃথিবী থেকে "হাওয়া" করে দেয়! আবার

অন্যদিকে শাসক পার্টির হয়ে, অন্য পার্টির লোকেদের ওপর হামলা করে, এবং শাসক পার্টির নেতাদের মদতে আরামে অবাধে চলাফেরা করে। অন্য দুষ্কৃতীরাতো তাকে হিংসা করবেই!

রূপলাল কুণ্ডুর দলের সঙ্গে ডাকাতি করতো, কিন্তু সে কাঁকিনাড়ায় না থেকে গোপনে থাকতো লেক টাউনের এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুটি তার মতো ডাকাত নয়, সে ভদ্র জীবন যাপন করতো। সে জানতোও না রূপলাল ডাকাতি করে বেড়ায়। তার স্ত্রী এক কালোয়ার মেয়ে। ছটফটে ও সুন্দরী। রূপলাল বন্ধুর বাড়িতে এসে খুব টাকা ওড়াতো। যাতে বন্ধুর স্ত্রী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কাজের কাজ হয় না। বন্ধুর স্ত্রী তার সঙ্গে সহজভাবে মেশে। একদিন রূপলালের সঙ্গে বাবু কুণ্ডুও এলো লেক টাউনের সেই বাড়িতে। কুণ্ডুর বন্ধুর স্ত্রীকে দু'জনেই ভোগের উপকরণ হিসাবে পেতে পারে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী একদিন বিকেলবেলা রূপলাল তার বন্ধুকে বেড়াতে নিয়ে গেল কাঁকিনাড়া। কুণ্ডু তাকে দেখে একগাল হেসে তার চার্মস সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে আপ্যায়ণ করলো। বন্ধুটিও সিগারেট ধরিয়ে তার আপ্যায়ণ গ্রহণ করলো। তারপর চা, এটা ওটা খাওয়া চলতেই লাগলো। কুণ্ডু ছেলেটির কাছে পাড়লো নতুন ব্যবসা ফাঁদার কথা। তাকে বললো, "যা টাকা লাগে আমি দেবো, তুমি নতুন কিছু ব্যবসার কথা ভাবো। আমি, তুমি, রূপলাল এই তিনজন পার্টনার হবো।" রূপলালের বন্ধুটি কুণ্ডুর ব্যবহারে একদম মোহিত হয়ে গিয়ে বিভিন্ন রকম ব্যবসার সম্ভাবনার কথা বলতে লাগলো। কুণ্ডু ও রূপলাল সেই সম্ভাবনা নিয়ে ওর সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা করতে লাগলো। ব্যবসার কথা আলোচনা করতে করতে সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত আটটা বেজে গেল। হাতের ঘড়ি দেখে ছেলেটি বললো, "আটটা বেজে গেছে, আজ বাড়ি যাই, পরে কথা হবে।" কুণ্ডু মাথা ঝাঁকিয়ে হো হো করে হেসে উঠে বললো, "ধুর, এতো সবে কলির সন্ধ্যে, বসো, মস্তি কর, তারপর বাড়ি যেও, রোজই তো তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও, আজ না হয় একটু দেরি করলে।" কুণ্ডু এরপর বি-ক্লাসকে ডেকে তার হাতে কিছু টাকা দিল, বি-ক্লাস কুণ্ডুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বি-ক্লাস বেরিয়ে যেতে তারা তিনজনে মিলে আবার শুরু করলো ব্যবসার কথা। তাদের আলোচনার মধ্যেই বি-ক্লাস নিয়ে আসলো একটা বড় হুইস্কির বোতল, মাংস ও তড়কা রুটি। রূপলাল হুইস্কির বোতল টেনে নিয়ে তিনটে গ্লাসে ঢালতে লাগলো। বি-ক্লাস খাবারগুলো সাজিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। তিনটে গ্লাসে মদ দেখে ছেলেটি রূপলালকে বললো, "আমি যে এসব খাই না, তুই জানিস না?" কুণ্ডু হেসে বললো, "আরে এ আর কী, রোজ তো আর খাও না, আজ

খাও, আজ আমরা নতুন ব্যবসার কথা ভাবলাম, তিনজনের নতুন কোম্পানীর নামে আমরা আজ খাবো, নাও শুরু করো।"

কুণ্ডুর আন্তরিক অনুরোধে ছেলেটা ঢোঁক গিলতে শুরু করলো। দু পেগ পেটে পড়তেই ছেলেটা চনমন করে উঠে বললো, "না আর খাবো না, এবার আমি যাই।" কুণ্ডু বললো, "কী খালি তখন থেকে যাই-যাই করছো, একটু দেরি হলে তোমার সুন্দরী বৌকে কেউ নিয়ে যাবে না। ঘাবড়িওনা, আমি তোমায় গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো। সে যত রাতই হোক, তোমাকে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার।" ছেলেটি বললো, "বেকার তুমি কষ্ট করতে যাবে কেন? আমি এখন চলে যেতে পারবো।" রূপলাল বললো, "কী তখন থেকে বাড়ি যাবো বলে ফ্যাচফ্যাচ করছিস, গুরু যখন বলেছে বাড়ি দিয়ে আসবে, তখন তোর চিন্তা কি, আমি আর তুই দু'জনেই যাবো।" ছেলেটি আর কথা না বাড়িয়ে হুইস্কির গ্লাস তুলে নিল। সে রূপলাল আর কুন্ডুর আশ্বাস পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো। সে আবার ব্যবসার কথায় মগ্ন হয়ে গেল।

রাত দশটা, হুইস্কির বোতল শেষ। খাবার দাবারের পাত্র শূন্য হয়ে গেছে। ছেলেটির বেশ নেশা ধরেছে, রূপলাল ও কুন্ডু পেশাদার মাতাল। তারা খুব সচেতন। কুন্ডু ছেলেটিকে বললো, "চলো তোমাকে আমার এক ইটভাটার মালিক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। তার কাছ থেকে আমরা অনেক পরামর্শ পেতে পারি।" ছেলেটির নেশা জমে গেছে। সে সেই ঝোঁকে বলে উঠলো, "চলো" তার চোখে নতুন ব্যবসার রঙিন স্বপ্ন, সে তার পার্টনারদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো। পা কিছুটা এলোমেলো। রূপলালের কাঁধে হাত দিয়ে ছেলেটি চলল কুন্ডুর ইটভাটার মালিক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। পুরানো ব্যবসায়ী, সে নিশ্চয়ই ভাল পথ দেখাবে। কুন্ডুর আঙ্গুলের ফাঁকে জ্বলছে সিগারেট, অন্য হাত সাফারির ট্রাউজারে ঢোকানো। কাঁকিনাড়ায় রাতবিরেতে কুন্ডুকে দেখলে কেউ কোন কথা বলে না, ভয় পায়, কখন কোন খবর আবার আসবে!

রূপলালের কাঁধে ভর দিয়ে ছেলেটি চলছে, মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছে এবড়ো খেবড়ো রাস্তায়। হোঁচট খাওয়ার পরই ছেলেটি কুণ্ডুকে জিজ্ঞেস করছে, "আর কতদূর গুরু?" কুণ্ডু সিগারেটে টান দিয়ে উত্তর দিচ্ছে "বেশি দূর নয়।" ছেলেটি এখন আর ঘড়ির দিকে দেখছে না, সেতো জানেই বন্ধুরা তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তাই নিশ্চিন্ত।

রাত এগারোটা। চারদিক শুনশান। ইঁটভাটার কাছাকাছি একটা অঞ্চলে তারা তিনজন। দূরে ইঁটভাটার শ্রমিকবস্তি থেকে একটা কুকুরের ডাকের সঙ্গে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে কোনও এক মাতালের হম্বিতম্বি চিৎকার। কুণ্ডু আর রূপলাল ছেলেটিকে

নিয়ে গেল একটা বেশ বড় পুকুরের কাছে। ছেলেটি কিছুই বলছে না। সে মদের নেশায় পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে বন্ধুদের হাতে। পুকুরপাড়ের ওপর কুণ্ডু রূপলালকে ঠেলে দিল আস্তে। রূপলাল কুণ্ডুর ঠেলা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেলেটির হাত কাঁধ থেকে নামিয়ে মারলো এক ল্যাং, চেলেটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। কোনমতে গোঙাতে গোঙাতে বললো, "কী হলো গুরু?" পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডু পকেট থেকে বার করে নিয়েছে রিভলবার এবং একলাফে ছেলেটির পিঠে দু'হাঁটু দিয়ে চেপে তার মাথায় রিভলবারের নল ঠেকিয়ে টিপে দিল ট্রিগার। রিভলবারের গুলির আওয়াজ শান্ত পরিবেশ হঠাৎ খানখান হয়ে গিয়ে আবার নৈঃশব্দের অন্ধকারে ডুবে গেল। গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির পা দুটো একবার আকাশের দিকে তুলে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

পাকা খুনি কুণ্ডু উঠে দাঁড়ালো। না, রূপলালের বন্ধুটির জন্য আর দ্বিতীয় বুলেট খরচ করতে হবে না। এক বুলেটে তাকে "বাড়ি" পৌঁছে দেওয়া গেছে। একটা বুলেটের অনেক দাম, সেই দামটা ফেরৎ পাওয়া যায় কিনা, তারই খোঁজে কুণ্ডু মৃত ছেলেটার সব পকেট হাতড়াতে লাগলো। হ্যাঁ, পাওয়া গেল একটা মানিব্যাগ। ভেতরটা দেখে মনে হলো দু'তিনশ টাকা আছে কুণ্ডু সেটা পকেটে পুরে ছেলেটির বাঁ হাতের কব্জি থেকে তার ঘড়িটা নিয়ে রূপলালকে বললো, "যা চার পাঁচটা ইঁট নিয়ে আয়।" রূপলাল ইঁটভাটার পেছন দিকে ইঁটের খোঁজে চললো। তার মনে এখন আনন্দের জোয়ার। এতদিন বহু টাকা উড়িয়েও যাকে আয়ত্তে আনতে পারেনি, কুণ্ডু কি সহজ ভাবে তার সমাধা করে দিল। কুণ্ডুর প্রতি তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই! এখন তাকে মাঠে নেমে গোল দিতে হবে।

অন্যদিকে কুণ্ডু মৃতদেহটাকে টানতে টানতে পুকুরের জলের হাত দু'য়েক দূরত্বে নিয়ে রাখলো। রূপলাল প্রচণ্ড উৎসাহে মাথায় চাপিয়ে ছ'টা নতুন ইঁট নিয়ে এসে হাজির। সেগুলো নামিয়ে রাখলো বন্ধুর লাশের পাশে। কুণ্ডু পকেট থেকে বারে করলো নাইলনের দড়ি আর ছুরি। তারপর সেই দড়ি দিয়ে একটা একটা করে ইঁট মৃতদেহের দু'হাতে ও দু'পায়ে বেঁধে রূপলালকে বললো, "যতদূর যায় ছোঁড়।" রূপলাল ধরলো মাথার দিক, কুণ্ডু পায়ের দিকে। দু'জনে লাশটা তুলে দুলিয়ে ছুঁড়ে দিলো পুকুরের জলে। ঝপ করে একটা শব্দ হয়ে ছেলেটির দেহ জলে ডুবে গেল। না, বেশি দূরে ছুঁড়ে ফেলতে পারেনি। যদিও পুকুরটা লোকজন কম ব্যবহার করে, তবু সাবধানের মার নেই বলে কুণ্ডু রূপলালকে বললো, "জলে নেমে টেনে আর একটু দূরে রেখে আয়।" রূপলাল আস্তে আস্তে জলে নেমে যেখানে লাশটা পড়েছে, সেখানে গিয়ে ডুব দিল, হাতে ঠেকলো বন্ধুর দেহ। সে পা ধরে টেনে যতটা পারলো

জলের ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে পাড়ে উঠে আসলে কুণ্ডু বললো, "বাকি ইঁট দুটো ওর বুকের ওপর রেখে আয়, যাতে কিছুতেই না ভেসে উঠতে পারে। রূপলাল কুণ্ডুর আজ্ঞা যথাযথ পালন করে মুক্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পাড়ে উঠে দাঁড়াল। সারা শরীর ভিজে, সেদিকে খেয়াল নেই, সে কুণ্ডুর কাছ ছেকে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। আর জলের তলায় দ্রুত পচে যাওয়ার অপেক্ষায় শুয়ে রইলো বন্ধুটি। কুণ্ডু হাঁটতে হাঁটতে রূপলালকে বললে, "এবার তোর খেল।" রূপলাল অন্ধকারে হেসে শুধু উত্তর দিলো, "হুঁ।"

পরদিন সেজেগুজে রূপলাল সকাল দশটা নাগাদ লেক টাউনে তার বন্ধুর বাড়িতে হাজির। বন্ধু পত্নীতো ভেবে ভেবে অস্থির, তার স্বামী গতরাতে বাড়িই ফেরেনি। সে তো এমন করে না। রূপলালকে বললো, "কি ব্যাপার বলতো কাল রাতে ফেরেনি, কোথায় যেতে পারে?" রূপলালও নকলভাবে চিন্তা শুরু করলো। সে যে আর কোনদিন ফিরবে না তা তো বলতে পারছে না। সে ব্যস্ত হয়ে বন্ধু পত্নীকে বললো, "চল, খুঁজে আসি।" তাকে নিয়ে রূপলাল রাস্তায় নেমে এলো। দিন পনেরো এইভাবে ছোটাছুটি করে রূপলাল বন্ধুপত্নীকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে এলো, এবং একদিন তাকে বিয়ে করে লেকটাউনের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কাঁকিনাড়াতে নিয়ে আসলো। সেখানে পরিকল্পনা অনুযায়ী জুটে গেল বাবু কুণ্ডু। তারপর থেকে রূপলাল দশ পনেরো দিনের জন্য অন্যত্র চলে গেলে কুণ্ডু মেয়েটির ঘরেই রাত কাটাতো। আর কুণ্ডু চলে গেলে রূপলাল থাকতো মেয়েটার কাছে। সে জেনে গেছে রূপলাল ও কুণ্ডুর ডাকাতের পরিচয়। সেও তারপর দু'জনের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে তাঁদের সঙ্গ দিতে শুরু করলো। রূপলাল ও কুণ্ডু দু'জনে ভাগাভাগি করে ওকে ভোগ করতে লাগলো। রূপলাল তাকে একটা রিভলবার দিয়ে দিলো, অহেতুক ঝুটঝামেলায় পড়লে যাতে সে রক্ষা পেতে পারে। কুণ্ডু রিক্সা করে মেয়েটাকে নিয়ে কাঁকিনাড়া চষে বেড়াতো।

এর মধ্যে কুণ্ডু তার দলের শিবপ্রসাদ, বাবলু, নিরঞ্জন, ভোলা, রূপলাল সাউ, বি-ক্লাসকে নিয়ে কলকাতার ভবানীপুর থানা এলাকায় মনোহরপুকুর রোডে একটা সোনার দোকানে ডাকাতি করে চলে গেল। কলকাতা পুলিশ এলাকায় কুণ্ডুর এটাই প্রথম ডাকাতি। সে যা যা অপরাধ করেছে তা সবই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এলাকায়। ডাকাতি করার ক'দিন পর কাঁকিনাড়ায় একদিন সকালবেলায় কুণ্ডু বসে আছে, সেখানে একটা অল্প বয়সের ছেলে একটা ঝকমকে বুলেট মটর সাইকেল নিয়ে এসে হাজির। কুণ্ডুতো তাকে দেখে অবাক, তার সাথে চেতলার ভীমের ডেরায় আলাপ হয়েছিল। কুণ্ডুর মাথা খুব ভাল খেলে, সে ছেলেটিকে প্রশ্ন করলো, "কি ব্যাপার,

কি খবর নিয়ে এসেছো?" ছেলেটি হেসে বললো, "একটা খবরতো নিয়ে এসেছি বাবুদা, কিন্তু—।" কথা থামিয়ে দিয়ে কুণ্ডুর পাশে বসা জলিলের দিকে তাকালো। কুণ্ডু হেসে বললো, "আরে এ জলিল, আমাদের লোক, ওর সামনে সব বলতে পারো।" ছেলেটি জলিলকে আর একবার দেখে নিয়ে বললো, "আজ ভোরেই এই মটর সাইকেলটা আমাদের হাবড়া থেকে উড়িয়েছি। তুমি এটার ব্যবস্থা কর, আমি হাজার পাঁচেক পেলেই খুশি।" কুণ্ডু একবার দাঁড় করানো মটর সাইকেলটা দেখে নিলো, ওর চোখ লোভে চকচক করে উঠলো। তারপর ছেলেটাকে বললো, "এই ব্যাপার? ঠিক আছে হয়ে যাবে, আমি ঠিক একটা 'মুরগি' পাকড়ে নেবো, এতদূর থেকে এসেছো, এখন খাওদাও, আরাম করো।" ছেলেটি কুণ্ডুর আশ্বাস পেয়ে খুশি হয়ে কুণ্ডুর পাশে বসলে কুণ্ডু হাঁক পাড়লো, "এই কে আছিস, ওর জন্য বেশি করে খাবার দাবার নিয়ে আয়।"

কুণ্ডু সারাদিন ছেলেটিকে খুব যত্ন করলো, ভাল ভাল জিনিস খেতে দিল । রাতে মদ ও মাংস খাইয়ে নিজের ঘরে ঘুমোতে দিলো। মটর বাইকটা ওর বাড়ির ভেতর রাখলো। গভীর রাত, ছেলেটি অকাতরে তার "বাবুদার" আশ্রয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। কুণ্ডু কিন্তু ঘুমাচ্ছে না, সে ঘুমের ভান করে শুয়ে আছে।

কুণ্ডু যখন বুঝলো, ছেলেটির এখন আর চট করে ঘুম ভাঙ্গবে না, সে তার বিছানা ছেড়ে উঠে ছেলেটির বিছানায় ঢুকে চট করে দু'হাতে গলা টিপে ধরলো। ঘুমন্ত ছেলেটা ছটফট করে উঠলো একবার, কিন্তু কুণ্ডু তার বুকের ওপর বসে গলাটা এত জোরে টিপে ধরেছে যে সে ছাড়াতে পারলো না। নিস্তেজ হতে হতে চিরঘুমের আলিঙ্গনে ধরা দিলো। তার নাক ডাকা বন্ধ। কুণ্ডু উঠে পড়লো। এবার ছেলেটির লাশটা ঘর থেকে বিদায় দিতে হবে। সে খাটের তলা থেকে একটা বড় বস্তা বার করে, ছেলেটির দেহটাকে বস্তার ভেতর টেনে হিঁচড়ে ঢুকিয়ে, বস্তার মুখ দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলো। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মটর বাইকটাকে ঘরের সামনে নিয়ে এলো। বস্তাটা ঘর থেকে তুলে মটরবাইকের পেছনের সিটে চাপিয়ে বেঁধে দিয়ে একটা কোদাল নিয়ে বাইক চালিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

কুণ্ডু চলে এলো পাটক্ষেতের কাছে। এখন আর পাট ক্ষেতে পাট নেই। চাষীরা অন্য সবজি চাষ করছে। ক্ষেতের পাশে মটরবাইকটা রেখে সে কোদাল নিয়ে নেমে পড়ে। ক্ষেতের পাশে বেশ বড় একটা গর্ত খুঁড়লো তারপর বস্তাটা টানতে টানতে নিয়ে এলো গর্তের পাশে। বস্তার মুখ খুলে দিয়ে ছেলেটার মৃতদেহটা বার করে ফেললো। এবং ছেলেটিকে গর্তের ভেতর ফেলে দিয়ে কোদাল দিয়ে টেনে টেনে মাটি চাপিয়ে গর্ত বুজিয়ে দিল। ছেলেটা পাঁচ হাজার টাকার স্বপ্ন দেখতে দেখতে

মাটির তলায় শুয়ে রইলো। কুণ্ডু গর্তটার ওপর এমন কায়দায় মাটি আলগা করে রাখলো যে মনে হবে চাষ করার জন্যই ওই জায়গাটা কেউ চষেছে। কাজ যখন শেষ হল কুণ্ডু দেখলো ভোর হতে তখনও অনেক দেরি। সে বস্তা ও কোদাল কুড়িয়ে মটর বাইক চালিয়ে বাড়ি চলে গেল। তার পরদিন থেকে কাঁকিনাড়ার সব লোকজন দেখতে লাগলো বাবু কুণ্ডু একটা ঝকঝকে মটরবাইক চড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা ভাবলো, বাবু বোধহয় কোন ভাল ডাকাতি করেছে!

কুণ্ডুর তখন ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। কলকাতায় রমার কাছে যায়, রূপলালের সঙ্গে ভাগাভাগিতে রূপলালের বন্ধুর স্ত্রী ছাড়াও সপ্তাহে দু'দিন আসে নৈহাটির কাঠ্‌পোলের বাসিন্দা মীনা নামে এক গেরস্থ পতিতার কাছে। সে এখন কুণ্ডুর কাছে বাঁধা, অন্য কারও কাছে যায় না। কুণ্ডুই তাকে টাকা পয়সা দেয়। কুণ্ডু তাকে এবং অন্য দুই মহিলাকেও মনোহরপুকুরে সোনার দোকান থেকে লুঠ করা গহনা একটা একটা করে দিয়েছে।

জলিল ছিল কুণ্ডুর সবচেয়ে আপনজন। দলের মধ্যে খুন করতে এত বেশি দক্ষ আর কেউ ছিল না। জলিলের বাড়ি ছিল কৃষ্ণনগরে। সেখানে সে ডাকাতির টাকা দিয়ে জমিও কিনেছিল। এই জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তার একজনের সঙ্গে বিরোধ হল। কিন্তু ধূর্ত জলিল সেই লোকটাকে তার মনের কথা বুঝতে দিলো না। তার সঙ্গে পরম বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে লাগলো। তারপর একদিন টাকার লোভ দেখিয়ে ভোরের ট্রেনে তাকে কাঁকিনাড়া নিয়ে আসলো। সারাদিন জলিল ও কুণ্ডু লোকটিকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া করলো। সন্ধ্যেবেলায় কুণ্ডু রঞ্জনকে পাঠিয়ে দিল ইঁটভাটার কাছে এক নির্জন মাঠে। সেখানে রঞ্জন একটা গর্ত খুঁড়ে চলে আসলো।

পরিচিত ছক মাফিক তার কৃষ্ণনগরের শত্রুকে নিয়ে বসে গেল মদ খেতে। কুণ্ডু, রঞ্জন, বাদল মিলে চললো মদ খাওয়া। রাত দশটা নাগাদ কৃষ্ণনগরের লোকটিকে নিয়ে চললো বেড়াতে ইঁটভাটার দিকে। সেখানে রঞ্জন যে তার জন্য গর্তের বিছানা করে রেখেছে তা তো সে জানে না। সে জলিলের সঙ্গে মনের আনন্দে চলেছে। ইঁটভাটার কাছে এলে রঞ্জন ও বাদল তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলো। জলিল ও কুণ্ডুর হাতে তখন খোলা ভোজালী। জলিল তার ঘাড়ে মারলো ভোজালী দিয়ে এক কোপ। দ্বিতীয় কোপটা কুণ্ডুর, ব্যাস শেষ। পাশেই তৈরী গর্ত। চারজনে তুলে লোকটিকে নামিয়ে দিল গর্তে। রঞ্জন ভোজালী দিয়ে পেট ফাঁসিয়ে দিলে বাদল এক প্যাকেট নুন ঢুকিয়ে দিলো ফাঁসানো পেটে। গর্ত বুজিয়ে দিয়ে কাজ সম্পুর্ণ করে কুণ্ডুরা ফিরে আসলো নিজেদের আস্তানায়। জলিলের জমির বিরোধ ভোজালীর কোপে শেষ করে কাঁকিনাড়ার ইঁটভাটার গর্তে সমাপ্ত।

কুণ্ডুর কাছে খবর এলো, এক চিংড়ি মাছের ভেড়ির মালিক মালঞ্চের কাছে এক ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে কলকাতায় তার বাড়িতে যাবে। ডাকাতির পাকা ওস্তাদ রূপলাল ভেড়ির মালিককে চিনে আসলো।

তারপর নির্ধারিত দিনে ভেড়ির মালিক ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে জিপে করে চলেছে। পেছনে একটা গাড়িতে কুণ্ডু, নিরঞ্জন, বাবলু, রূপলাল, জলিল, রঞ্জন। তারা জিপের পেছন পেছন ছুটে জিপটাকে ধাওয়া করে। বেনিয়াপুকুরের মোড়ে জিপটাকে ওভারটেক করে। তাদের অ্যামবাসাডার গাড়িটা জিপের মুখে দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডুরা ঝটপট গাড়ির দরজা খুলে ভেড়ির মালিককে আক্রমণ করে তার টাকা ভর্তি ব্রিফকেসটা নিয়ে তাদের গাড়িতে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

হঠাৎ বেশি টাকা হাতে আসলেই কুণ্ডুর মনে ফূর্তির একেবারে জোয়ার এসে যায়। আর সেই জোয়ারটা এসে থামে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুয়র রেড লাইট এরিয়ায় রমার ঘরে।

বেনিয়াপুকুরের ডাকাতির দু'দিন পর কুণ্ডু রমার ঘরে সকালবেলাই হাজির। ওদিকে কাঁকিনাড়ায় দুপুরবেলায় ভোলার রেল কোয়ার্টারের ঘরে কুণ্ডুর জন্য নৈহাটি থেকে উপস্থিত হয়েছে মীনা। ভোলার বাবা রেলওয়ে কর্মচারী ছিল, সেই সূত্রেই ভোলা রেল কেয়ার্টারে থাকতো। ভোলার ঘরেই কুণ্ডু মীনার সঙ্গে প্রেমলীলায় মত্ত হতো।

মীনা ভোলার ঘরে আসতেই ভোলা কুণ্ডুকে খুঁজতে গেলে বাদলের সঙ্গে দেখা হতে বাদল বিশ্বাস ভোলাকে বললো, "কুণ্ডুতো সোনাগাছি গেছে।" ভোলা বললো, "আর ওদিকে আমার ঘরে বসে আছে মীনা।" বাদল বললো, "তাতে কি, আমরা তো আছি, চল মীনাকে দেখি।" ভোলাও বাদলের কথায় রাজি হতে তারা ভোলার বাড়ির দিকে ফিরে আসতে শুরু করলো। রাস্তায় দেখা হলো জলিলের সঙ্গে, তাকেও তারা মীনার আগমনের কথা জানিয়ে তাকেও তাদের সঙ্গী করে ভোলার বাড়ির দিকে চললো। মীনা ভোলার ঘরে কুণ্ডুর জন্য অপেক্ষা করছে। ঘরে ঢুকলো তার বদলে ভোলা, বাদল ও জলিল। বাদল মীনাকে বললো "মীনা, বাবু সোনাগাছিতে গেছে রমার কাছে, আজ আমাদের সঙ্গেই কাটাও।" মীনা একটা খাটের ওপর বসেছিল। সে বাদলের প্রস্তাব শুনেই "না-না" বলে উঠে খাট থেকে নেমে পড়লো। কিন্তু কোথায় যাবে? বাদল ও ভোলা মীনাকে টেনে খাটের ওপর নিয়ে গেল এবং মীনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাদল, ভোলা ও জলিল তাকে ধর্ষণ করলো। মীনা এ ব্যাপারে আগে অভ্যস্ত ছিল কিন্তু কুণ্ডুর কাছে আসতে পুরানো অভ্যাস ত্যাগ করে একমাত্র

কুণ্ডুর সঙ্গেই সহবাস করতো। ঘন্টা দু'য়েক পর বাদলরা মীনাকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে ছেড়ে দিলে মীনা নৈহাটি চলে গেল। এবং পরদিন সে কাঁকিনাড়া এসে কুণ্ডুকে আগের দিনের সমস্ত ঘটনা জানালে কুণ্ডু ভীষণ রেগে গেল। সে ভাবলো, "তার চেলারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তার মেয়েমানুষকেই ধর্ষণ করলো।"

দিন দুই পরে কুণ্ডু, বাদল, জলিল, রঞ্জন, রূপলাল, শিবপ্রসাদ ও কলকাতার গোলপার্কের বুড়োকে নিয়ে নৈহাটির কাঠপোলে নিয়ে গেল। সেখানে মীনার ঘরে বসে ডাকাতির পরিকল্পনা করলো এবং রাতে ভাল করে খাওয়া দাওয়া করে কাঁকিনাড়া ফিরে যাওয়ার জন্য পাশের আমবাগানে একটা খাটিয়াতে বসে মদ খেতে শুরু করলো। ওদিকে মীনার ঘরে মাংস ভাত রান্না হচ্ছে। রান্না শেষ হলে মীনা তাদের ডেকে নিয়ে যাবে। রাত ন'টা নাগাদ কুণ্ডু, জলিল, রঞ্জন, বাদলকে খাটিয়াতে জোর করে শুইয়ে দিল। তারপর রূপলাল গলায় জড়িয়ে দিলো একটা গামছা, সেই গামছার দু'প্রান্ত ধরে কুণ্ডু ও জলিল টানতে লাগলো। খাটিয়ায় শুয়ে আঠাশ বছরের বাদল ছটফট করতে করতে মারা গেল। আমবাগানের লাগোয়া ছিল একটা আলুর ক্ষেত, সেখানে রঞ্জন ও বুড়ো মিলে খুঁড়ে ফেললো একটা গর্ত। বাদলকে গর্তে শুইয়ে দিয়ে চাপা দিলো মাটি। তারপর সবাই হাত পা ধুয়ে মীনার বাড়িতে মাংস ভাত খেয়ে ফিরে এল কাঁকিনাড়া। বাদলই যে ধর্ষণ করার উদ্যোগের নাটের গুরু তা মীনার মুখে শুনেছে। মীনার ওপর অত্যাচারের জন্য নয়, কুণ্ডু প্রতিশোধ নিলো তাকে অপমান করেছে ভেবে।

বাদল বিশ্বাস খুন হওয়ার পর ক'দিনের মধ্যে বালির কুখ্যাত গুণ্ডা বাবু ভট্টাচার্য্য খুন হয়ে গেল। দক্ষিণেশ্বর, বালি থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত বাবু ভট্টাচার্য্যর দুষ্কর্মের এলাকা ছিল। খুন, জখম, ওয়াগন ব্রেকার, হাইওয়ে ছিনতাই সবই তার কাজকর্মের মধ্যে পড়তো। তার "এলাকার" ভেতর যত রকমের "ছোট, বড়" সমাজবিরোধীরা ছিল প্রত্যেকেই বাবু ভট্টাচার্য্যকে "গুরু" হিসাবে মানতে বাধ্য হতো। কোন্নগরের দুষ্কৃতী টারজান, গোরারা বাবু ভট্টাচার্য্যের অনুগত ছিল। বাবু মিত্র, বাবু কুণ্ডুর সঙ্গে বাবু ভট্টাচার্য্যের সজীব যোগাযোগ ছিল। যাদের যখন দরকার পড়তো তারাই অন্য দলকে সাহায্য করতো, অস্ত্রশস্ত্র, গোপন আস্তানা, খবরাখবর আদান-প্রদান করে দুই "প্রতিবেশী রাষ্ট্র" সুন্দর সহাবস্থানের মধ্যে ছিল। কিন্তু হঠাৎই এক রাষ্ট্রপ্রধান বাবু ভট্টাচার্য্য খুন হয়ে গেল।

কেমন খুনি ছিল বাবু ভট্টাচার্য্য? সি পি আই (এম) পার্টির হাওড়া জেলার বালি উত্তরপাড়ার এক নেতাকে রাতের পর রাত এক ছাইগাদার পাশে জেগে খুন করলো। সে তার দল নিয়ে প্রতি রাতে সেই জায়গায় লুকিয়ে অপেক্ষা করতো সেই নেতাটির

বাড়ি ফেরার সময় আক্রমণ করে খুন করার অভিপ্রায়ে। একদিন তার দলের এক শিষ্য ছাইগাদায় শুয়ে তাকে বললো, "রোজ রাতে এখানে শুয়ে থেকে কোনও লাভ হচ্ছে না, ওকে পাওয়া যাবে না।" বাবু ভট্টাচার্য্য হেসে শিষ্যের কানের কাছে মুখটা নিয়ে বললো, "লোকে ভগবানকে ডাকতে ডাকতে পেয়ে যায়, আর শত্রু পাবো না?" হ্যাঁ, বাবু ভট্টাচার্য্য তার ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল এবং শত্রুকে এক রাতে পেয়ে তাকে খুন করেছিল। সেই বাবু ভট্টাচার্য্য নিজের বাড়ির কাছে খুন হয়ে যাওয়াতে বাবু কুণ্ডু প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। খুন হওয়ারও ক'দিন আগে, তার এক বন্ধুকে খুন করেছিল। কী অপরাধ ছিল সেই বন্ধুটির? অপরাধ ছিল বন্ধুটি তার স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। সেটা শুনেই বাবু ভট্টাচার্য্য প্রচণ্ড অপমান বোধ করে। সে ভেবেই পায়না, তার স্ত্রীকে কোন সাহসে সে সিনেমা দেখতে নিয়ে গিয়েছিল। সে এই বেয়াদপির উত্তর পরের দিনই দিল। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় রঘু, রামুয়াকে সঙ্গে নিয়ে বাবু ভট্টাচার্য্য বন্ধুকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেল শ্রীরামপুর ছাড়িয়ে বাঘখালের গঙ্গার ধারে তার এক "দোস্তের ঠেকে।" দোস্ত বাবু ভট্টাচার্য্যর ইচ্ছা অনুযায়ী গঙ্গার ধারে খোলা হাওয়ায় খাটিয়ার ওপর মাদুর পেতে দিলো। মদ, মাংসের ব্যবস্থা করে দিলো। বাবু ভট্টাচার্যেরা চারজনে মদ, মাংস খেতে লাগলো ও জমিয়ে গল্পগুজব করতে লাগলো। রাত বাড়তে লাগলো। ভট্টাচার্য্য বললো, "চল বাড়ি যাই।" তার নির্দেশ মতো সবাই খাটিয়া থেকে নামতেই ভট্টাচার্য্য লুকিয়ে রাখা একটা ভোজালি কোমর থেকে বার করে বন্ধুটির গলায় প্রচণ্ড জোরে চালিয়ে দিতেই বন্ধুটি "আঃ" চিৎকার করে গঙ্গার পারে পড়ে গেলো। রঘু, রামুয়ারা পকেট থেকে ততক্ষণে ছুরি বার করে পরপর চালিয়ে দিয়েছে তার বুকে, পেটে। তার শেষ নিঃশ্বাস গঙ্গার হাওয়ার সঙ্গে মিলে উধাও হয়ে গেছে। বাবু ভট্টাচার্য্য খাটিয়া থেকে মাদুরটা নিয়ে এলো। রঘু ও রামুয়া মিলে মাদুরেতে শুইয়ে দিলো বন্ধুটির মৃতদেহ। বাবু ভট্টাচার্য কুড়িয়ে আনলো ৬-৭টা ইঁট, চাপিয়ে দিলে বন্ধুটির বুকে। তারপর মাদুর জড়িয়ে পুরো লাশটা ইঁট সমেত বেঁধে ফেললো বাবু ভট্টাচার্য্যেরা এবং বাঘখালের পাশে গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। গঙ্গা বুক পেতে নিঃশব্দে ডুবিয়ে নিলো মৃতদেহটি। বাবু ভট্টাচার্যরা ভোজালি, ছুরিগুলোও ছুঁড়ে দিলো গঙ্গার জলে। উদার গঙ্গা সবকিছুই নিয়ে নেয়। সেগুলোও নিয়ে যেমন বইছিল তেমনই বইতে লাগলো। বাবু ভট্টাচার্য তার স্ত্রীকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাওয়ার শাস্তি দিয়ে ফিরে এলো বাড়ি।

এই খুনের ক'দিন পর বাবু ভট্টাচার্যও খুন হয়ে গেল। কীভাবে হলো? তার একটা তেলের ট্যাঙ্কার ছিল। সেদিন ভোরবেলায় ট্যাঙ্কার এসে দাঁড়িয়েছে রাজচন্দ্রপুরের

দিল্লী রোডের ওপর। একজন লোক বাবু ভট্টাচার্য্যকে রাজচন্দ্রপুরের বাড়িতে খবর দিলো, তার গাড়ি খারাপ হয়ে দিল্লী রোডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভার এক্ষুণি যেতে বলেছে। বাবু ভট্টাচার্য্য তার বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে দিল্লী রোডের দিকে চললো। রাস্তায় উঠে সে তার ট্যাঙ্কারের দিকে এগিয়ে গেল। তার আততায়ীরা সব তার অপেক্ষায় আশেপাশেই লুকিয়ে ছিল। বাবু ভট্টাচার্য্য ভাবতেও পারছে না, তাকে কেউ তারই এলাকায় আক্রমণ করতে পারে। তার দাপটে সবাই কাঁপে, আর তাকে কে মারার সাহস পাবে যে বীরদর্পে সে চলাফেরা করে। সেদিন ভোরবেলাতেও সে লুঙ্গি ও গেঞ্জি গায়ে বীরদর্পে হাঁটতে হাঁটতে ট্যাঙ্কারের কাছে এগিয়ে কোল থেকে ছেলেকে নামিয়ে পাশে দাঁড় করিয়ে ট্যাঙ্কারের ইঞ্জিনে ঝুঁকে দেখতেই আততায়ীরা গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে তাকে আক্রমণ করে, এবং রিভলবারের গুলিতে তাকে ঝাঁঝরা করে চপার দিয়ে কুপিয়ে রাস্তার ওপরই ফেলে পালায়।

চারদিন পর বাবু ভট্টাচার্য্যের শ্রাদ্ধবাসরে ব্যাণ্ডেল থেকে বেলঘরিয়া, হাওড়া, কলকাতা থেকে কাঁকিনাড়া, জগদ্দলের সব সমাজবিরোধীরা নিমন্ত্রিত হয়ে একে একে হাজির। প্রত্যেকে তাদের পরম বন্ধুর ছবিতে মালা দিয়ে কান্নাকাটি করছে। বাবু ভট্টার্যের স্ত্রী তাদের কাছে এসে ঘোষণা করলো, "তোমরা কেউ কান্নাকাটি করো না, চোখ মুছে ফেলো, আমি তোমাদের দাদার হত্যার বদলা নেবই নেব।" নিরঞ্জন, বাবলু, বাবু কুণ্ডুরা চোখ মুছে নিল।

হ্যাঁ, এর অল্প কয়েকদিন পরই, সূর্য মুখার্জীর ডাকাত দলের সদস্য রাজচন্দ্রপুরেরই সদ্য জেল ফেরৎ ডাকাত তপন গায়েন বাবু কুণ্ডুদের হাতে রাজচন্দ্রপুরে খুন হয়ে গেল। বাবু ভট্টার্য্যের স্ত্রীকে সাহায্য করে বাবু কুণ্ডু প্রিয় বন্ধুর খুনের বদলা নিল।

একটার পর একটা খুন করে বাবু কুণ্ডু খুনের খেলায় একেবারে ওস্তাদ হয়ে গিয়েছিল। দুষ্কৃতির ভেতরে নিজেদের রেষারেষিতে কাউকে খুন করতে হলেই খুনের ওস্তাদ বাবু কুণ্ডুর তলব হতো এবং টাকা দিয়ে তারা দায়িত্ব বাবু কুণ্ডুর হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতো। চেতলা ভীমের সঙ্গে কালীঘাটের পূর্ণ সাউয়ের একটা চুরির মাল ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে বাধলো বিরোধ। পূর্ণ সাউয়ের সঙ্গে বাবু মিত্র ও পরে বাবু কুণ্ডুর খুব ভালো যোগাযোগ ছিল। প্রয়োজন মতো পূর্ণ সাউ বাবু কুণ্ডুদের মাঝে মাঝে লুকিয়ে থাকার জন্য আস্তানা দিতো। ভীম তাই বাবু কুণ্ডুকেই নিয়োগ করলো, যাতে পূর্ণর ডেরায় গিয়ে পূর্ণকে খুন করতে পারে। কুণ্ডু ভীমের কাজ হাতে নিয়ে কালীঘাটের যতীন ও কল্যানকে দিয়ে পূর্ণকে নিমন্ত্রিত করলো। মদ ও মাংস খুব খাওয়া দাওয়া হলো, তারপর রাত এগারোটা নাগাদ পূর্ণ সাউকে এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য রাসবিহারী এভিনিয়্যুর শীতলা মন্দিরের কাছে এলে ওরা পরিকল্পনা

অনুযায়ী পূর্ণ সাউকে পরপর দু'টো গুলি করলো ও ভোজালী দিয়ে খুন করলো। সমস্ত পরিকল্পনামাফিক কাজ করে কুণ্ডু কাঁকিনাড়া ফিরে গেল।

বেলঘরিয়ার সমীর, কুণ্ডুর দলের হয়ে কাজ করতো। ডাকাতির খবরাখবর দিয়ে টাকা নিতো। একটা খবরের বিনিময়ে সমীর কুণ্ডুর কাছে টাকা চাইলে কুণ্ডু কাঁকিনাড়া আসতে বললো। কুণ্ডু তার দলের অন্যদের জানিয়ে রাখলো, "আজ পুলিশের একটা ইনফরমারকে হাবিস করতে হবে।" সমীর কাঁকিনাড়া গেল এবং কুণ্ডু তার পরীক্ষিত একই কায়দায় তাকে মদ খাইয়ে, ভোজালী দিয়ে গলা কেটে, মাটিতে পুঁতে দিল।

নিরঞ্জন ও বাবলু তাদের গোপন বাড়ি থেকে কুণ্ডুর কাছে গেল ভাগের টাকা আনতে। কুণ্ডু, রূপলাল রঞ্জনকে নিয়ে বসেছিল। কুণ্ডু তাদের দু'জনকে বললো, "কাল আসিস, দেবো।" তারপর তাদের সাবধান করে বললো আজ ভাটপাড়া ব্রীজের ওপর দিয়ে না গিয়ে নীচ দিয়ে যাস। ব্রীজের ওপর পুলিশের লোকেরা রয়েছে।" বাবলুরা কুণ্ডুর কথা শুনে ফিরে আসার সময়ই কুণ্ডুরই দলের একজন তাদের ইশারা করে জানিয়ে দিলো, ব্রীজের নীচ দিয়ে নয় ওপর দিয়েই যেতে। বাবলুরা ব্রীজের কাছে এসে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলো। মসজিদের পাশে কুণ্ডু বি-ক্লাস ও অন্য ক'জন ছেলে বোমা নিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তারা দু'জন সেখান দিয়ে গেলে তাদের বোমা মেয়ে উড়িয়ে দেবে। সেটা দেখে, নিরঞ্জন ও বাবলু ব্রীজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় কুণ্ডুর ছেলেরা দেখে নিল, তারা সেখান থেকেই তাদের লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লো। তারা ছুটে পালালো। এবং একটা চলন্ত বাসে উঠে কুণ্ডুর হাত থেকে বেঁচে গেল।

এইভাবে বাবু কুন্ডু যে কত মানুষ খুন করেছে তার কোন হিসাব নেই। সেটা দেড়শোও হতে পারে দু'শো আড়াইশোও হতে পারে। যে তার বিরোধিতা করতো বা যাকে তার অপচ্ছন্দ হতো তাকেই সে খুন করে পুঁতে দিতো। আর জলিল ছিল তার ডানহাত। সেই জলিল কে আমাদের পুলিশের একটা দল উল্টোডাঙ্গায় ধরতে গেলে সে গুলি চালিয়ে পালাতে যায়, আমাদের দলের পাল্টাগুলিতে সে মারা যায়।

আশির দশকের শেষ থেকে নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিককার কয়েক বছর বাবু কুন্ডু কাকিনাড়া জগদ্দল অঞ্চলে একেবারে তান্ডব লাগিয়ে দিয়েছিল। শাসক সি.পি.আই (এম) পার্টির ছত্রছায়ায় ছিল বলে অঞ্চলের লোকেরা ও পুলিশ থেকেও সে কোন রকম বাধা পায়নি।

সেই প্রতাপশালী খুনি বাবু কুন্ডুও খুন হয়ে গেল। সে কৃষ্ণনগরে তার বাড়ি গিয়েছিল। বাড়িতে একদিন থেকে পরের দিনই কৃষ্ণনগর রেল স্টেশনে সকালবেলা ট্রেন ধরতে প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালো। যাবে কাঁকিনাড়া। সাফারি পরে হাতে জ্বলন্ত

সিগারেট নিয়ে বাবু কুন্ডু জমিদারি ঢঙ্গে হাঁটছে। প্লাটফর্মের চারিদিকে অনেক লোক। হঠাৎ বাবু কুন্ডুর পিঠে এসে পড়লো একটা বোমা। বিকট আওয়াজে স্টেশন চত্বরের সব যাত্রী, হকার যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। ফাঁকা হওয়ার আগেই আরও একটা বোমা এসে পড়লো বাবু কুন্ডুর পড়ে থাকা শরীরের ওপর। প্রথম বোমার আঘাতেই সে কিছুটা ছোটার চেষ্টা করেই মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বোমাতে তার আর নড়ার ক্ষমতা রইলো না। পরপর আরও কয়েকটা বোমা ফাটলো। বোমা ফাটিয়ে বাবু কুন্ডুর শত্রুর দল পালালো। রেল পুলিশ যখন ছিন্নভিন্ন বাবু কুন্ডুকে এসে দেখলো, তার অনেক আগেই সে মারা গেছে। স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলায় এক চরম ঘৃনিত দুষ্কৃতি মারা যেতে সেদিন জানি না কারও চোখে এক বিন্দু অশ্রু ঝরেছিল কিনা। তবে খুশিতে অনেকেই উদ্বেল হয়েছিলেন তা জানি। কাঁকিনাড়া, জগদ্দল অঞ্চলের মানুষরা কুন্ডুর মৃত্যুর খবরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। কিন্তু কতদিন এই হাঁফ ছেড়ে বেঁচে থাকা? কারন এক দৃষ্কৃতীর মৃত্যু হলে অন্য এক দৃষ্কৃতী সেই ফাঁকা জায়গা ভরাট করতে এগিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়া কতদিন চলবে? কতদিন? কতদিন একের পর এক বাবু কুন্ডু, হামজা, পান্না মিত্র, ক্ষুর গোপাল, ঔরঙ্গজেবেরা আমাদের ঘুম কেড়ে নেবে?

———

ওরা আমাদের ঘুম কাড়ার আগেই কী আমরা ওদের ঘুম কেড়ে নিতে পারি না? পারি, অবশ্যই পারি। আজ আর পরিষ্কারভাবে বলতে কোনও বাধা নেই, যে যাট সত্তর দশকের কসবা-বালিগঞ্জ-হালতু অঞ্চলের ত্রাস কানাই কুমীরকে আমরাই প্রায় ইচ্ছা করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছি। ও কী না করেছে? অসংখ্য ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনাতাই, খুন, ধর্ষণ, তোলাবাজি থেকে শুরু করে অপরাধ জগতের যত রকম ধারা মানুষের আজ পর্যন্ত জানা আছে তার প্রতিটাই ও সম্পন্ন করেছে। ওর বিরুদ্ধে জীবিত বা মৃত গ্রেফতারী পরোয়ানাও ছিল অনেকগুলি। ওর জন্য ওই অঞ্চলের মানুষ স্বভাবতই ছিল অসম্ভব ভীত। যদিও ও বেশিরভাগ অপরাধগুলি করেছে কলকাতা পুলিশের গণ্ডীর বাইরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অঞ্চলে। তবু তখনকার আমাদের গোয়েন্দা দফতরের ডি. সি. সুফি সাহেব আমাদের বললেন, যেভাবেই হোক ওর কার্যকলাপ যেন আমরা বন্ধ করি। ওকে জীবিত গ্রেফতার না করতে পারলেও মৃত ওকে যেন আমরা নিয়ে আসি। আমরা আগের থেকেই খানিকটা প্রস্তুতিও নিচ্ছিলাম। ওর গতিবিধি জানার জন্য ওর দল থেকেই আমরা আমাদের গুপ্তচর নিয়োগ করলাম।

কানাই কুমীর ছিল অসম্ভব ধূর্ত, তীক্ষ্ণ। কখনও এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতো না। কখন কোথায় যাবে তা কাউকে বলতো না। এমনকী নিজের দলের কোনও সদস্যও জানতো না কুমীর কোন নদীতে কখন ডুব দেবে। সেজন্য আমাদেরও ওকে গ্রেফতার করা একটা কঠিনতর কাজের মধ্যে পড়ে গেল।

অবশেষে খবর এল। একেবারে পাকা, দুপুর সবে বিকালের কোলে নিঃশব্দে ঢুকছে ; আমাদের দল ছুটলো, কসবার একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে। ওকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। কানাই ফাঁদে পড়তেই ওই-ই প্রথম গুলি ছুঁড়লো। ভালই হলো। আমাদের দলের ঝাঁক ঝাঁক গুলি ওর দিকে ছুটে গেল। হ্যাঁ, লাগল, কানাই কুমীরের শরীরে। তাকে আমরা গাড়িতে তুলে নিয়ে ছুটলাম কলকাতার দিকে। ভুল বললাম। ছুটলাম না চলতে শুরু করালম। ও তখনও বেঁচে ছিল। আমরা যদি খুব দ্রুত ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারতাম, তাহলে হয়তোবা ও বেঁচে যেত। চিকিৎসা যাতে দেরিতে হয় তাই আমরা না ছুটে গাড়ি আস্তে চালাতে শুরু করলাম। ফলে ও আমাদের গাড়িতেই শেষ প্রশ্বাস ছাড়ল। বেঁচে গেলে ও আবার সমাজে ফিরে এলে কী করতো? ও কী বাল্মিকী হয়ে রামায়ণ লিখতো? লিখতো না। তাই তাকে আমাদের বিদায় দিতেই হলো। আমরা কী অপরাধ করলাম? বোধ হয় না। সমাজকে, সমাজের

মানুষকে বাঁচাতে এই ধরণের অপরাধ যদি আমরা করে থাকি, তবে সমাজের সাধারণ মানুষ কী আমাদের অপরাধী বলে গণ্য করবে না? আমরা জানি করবে না। তাহলে এই সমাজের মানুষ 'রামকে' ভগবান হিসাবে পুজো করতো না।

সমাজ যে কাকে কোন আসনে বসাবে তা সমাজের মানুষই জানে, আমাদের দেশের ঘোষিত অপরাধীকেও তাঁরা মন্ত্রী বানিয়ে দেয়। কীভাবে এবং কেন তারা তা আমরা জানি না। আমারা যারা অপরাধীকে দমন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলাম, তারা জানে কোন অপরাধীর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে। আমরা সব অপরাধীকেই যদি সমানভাবে ব্যবহার করতাম, তবে তো সবারই অবস্থা কানাই কুমীরের মতো হতো। তা তো হয়নি। হয়নি তার কারণ আমরা অপরাধীদের বিভিন্ন স্তর অণুযায়ী বিভিন্ন রকম ব্যবহার করেছি।

হ্যাঁ, দায়িত্ব নিলে সেটা পালন করতে হয়। সেটা সেনাবাহিনী ও পুলিশের ক্ষেত্রে আরও বলিষ্ঠভাবে প্রযোজ্য। এই বাহিনীর সদস্যগুলিও মানুষ। তারা সমাজকে যারা ধর্ষণ করছে, সেই ধর্ষণকারীকে নির্মূল করতেই আমরা খড়্গহস্ত। আমরা মানুষ হয়ে মানুষকে বাঁচানোর দায়িত্বই নিয়েছিলাম। যারা এই ব্যাপারে সত্যিকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাঁদের আরও বেশি বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। তাতে যদি দুর্নাম হয় হোক। দুর্ণামের ভয়ে সমাজকে অপরাধীদের হাতে ছাড়লে চলবে না। দুর্ণামের যাদের ভয় আছে, তারা পুলিশবাহিনীতে যোগ না দিয়ে কোনও মন্দিরে পুরোহিত হয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন। অসুবিধা তো কিছু নেই।

হ্যাঁ, আর একটা কথাও সত্যি। বর্তমান সঙ্কাপূর্ণ অর্থনৈতিক যুগে যুব সমাজ কাজ না পেয়ে অপরাধ জগতে ঢুকে যাচ্ছে। সেটা দেখা যাদের কর্তব্য সেই দয়িত্বশীল ব্যক্তিগণ সমাজকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে? দোষ কী শুধু তথাকথিত অপরাধীদের আর আমার মতো পুলিশকর্মীর, যারা অপরাধীদের দমন করার জন্য গদা ধরে কর্মকাণ্ড করেছি? বোধ হয় না, দোষ তাঁদেরই যারা আজ আমাদের সমাজকে নিজেদের স্বার্থের জন্য, ভোটের জন্য, ক্ষমতার জন্য, অর্থের জন্য দুষ্কৃতীতে ভরিয়ে দিয়েছে।

আজকের সমাজ কি তাঁদের চিহ্নিত করবে? হ্যাঁ, একদিন না একদিন করবেই। সেদিন হয়তো আমি থাকবো না। থাকবে আমার ভবিষ্যৎ উত্তরসূরী, অসংখ্য ভারতবাসী। যাদের ওপর আমার গভীর আস্থা! এটাই বুকে বেঁধে রাখবো আজীবন!

সমাপ্ত